দেবেশ রায়

মফস্বলি বৃত্তান্ত

১৯৭৪-এর মে-জুনে উপন্যাসটি সম্পূর্ণ লেখা হওয়ার পর গত ছ-বছরে শারদীয় কালান্তর, দেশ সাপ্তাহিক ও অনুক্ত-ত্রিমাসিকে বেরিয়েছে। উপন্যাসটির পঞ্চম পরিচ্ছেদের আরো দুটি খণ্ডাও গল্প-বড়গল্পের আকারে, প্রায় এই নামেই, কাগজে ছাপা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'-এর চেহারা দাঁড়াল এই।

অক্টোবর, ১৯৮০

দে'জ পাবলিশিং-এর আতিথেয়তায় আট-নয় বছর পরের এই দ্বিতীয় সংস্করণে সপ্তম পরিচ্ছেদটি নতুন গ্রথিত হল ও পঞ্চম পরিচ্ছেদটি বেড়ে গেল। এই নতুন অংশগুলিও তখনকারই লেখা—এতদিনে উপন্যাসটিতে বিন্যস্ত হতে পারল। বোধ হয়, এটিই এ-বৃত্তান্তের পরিণততম চেহারা।

এপ্রিল ১৯৮৯ দে. রা

এই শেষ রাতটাতে সারারাতের হিমের ভারে গোয়ালের চালের তিন সনের পুরনো খড়েরও রঙ বদলায়। তখন, বিছানা থেকে না-ওঠার সারারাতব্যাপী নানা চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত সারা গায়ে জড়ানো ধুতির খুঁটটা থেকে মাথাটা বের করে, উঠে, মাচানের একপাশে বসে চ্যারকেটুকে মাটির মেঝেতে ঝরঝর শব্দ তুলে, তলপেটটা খালাশ করতে হয়। গরুর পেচ্ছাবে এমন শব্দ রাতভর অনেকবার হয়েছে, কিন্তু গরুর পেট বড়, পেচ্ছাবও বেশি, পড়েও অনেকগুলো মোটা ধারায়—একটি মানুষের পেচ্ছাবে আর অত আওয়াজ তোলার জোর আসবে কোত্থেকে।

মোর পেচ্ছাবখানের আওয়াজটা স্যালায় হিম ঝরিকার নাখান আর গরুর পেচ্ছাবখানের আওয়াজটা স্যালায় বিষ্টি পড়িবার নাখান—পেচ্ছাবের জন্য চ্যারকেটুকে এতটাই সময় দিতে হয় যে চ্যারকেটু ভেবে ফেলে। আর সেই সময়ের ফাঁকে তলপেটে আরামের একটা শিরশিরানি বোঝা যায়, যেন আরামটা সারা শরীরে দেয়া যায়—এতক্ষণ আটকে থাকার পর শরীরের নিয়মে শরীরের জিনিশ বেরিয়ে যাওয়ার আরাম। অ্যালায় গাইটা মুতিবার ধরিলে দুই মুতে মিলি বেশ একখান জোর আওয়াজ হবা পারে—পেচ্ছাবটা হতেই থাকে বলে চ্যারকেটুকে এটাও ভাবতে হয়। পেচ্ছাব করতে-করতেই পিচ কেটে থুতু ফেলে। তারপর একসময় পেচ্ছাব শেষ হয়ে গেলেও বসেই থাকে—এতটা পেচ্ছাবের পর তার যেন কোনো বোধ নেই বেরিয়ে যাবার মত আরো জল তার তলপেটের ভেতর থেকে যায় কিনা। পেচ্ছাব করার জন্য প্রয়োজনীয় পেশির শিরা-উপশিরাগুলি থিতিয়ে নেতিয়ে এলে চ্যারকেটু বুঝে যায় পেচ্ছাব শেষ হয়ে গেছে। তলপেটটা কেমন আলগা ঠেকে। আবার সেই শিরশির আরামটা তলপেটের দুপাশে কুঁচকি পর্যন্ত আসে, যেন উরু বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে পারে না, যেন হাত-পা ছড়িয়ে দিলে আরামটা সারা শরীরে ছড়াতে পারে। সুতরাং আর-একবার পিচ কেটে থুতু ফেলে, মাচানের ওপর থেকে

BanglaBook.org

চ্যারকেটুকে মাটিতে নামতে হয়—পেট খালি করার আরামটা সারা শরীরে চারিয়ে দিতে।

শুলেই তার হাত-পা গুটিয়ে আসে, হাত-পা গুটিয়ে কোলের ভেতর ঘাড় গুঁজে ঘুমোতে হয়, কারণ, মাচানটায় লম্বালম্বি তার শরীর আঁটে না, কারণ এখন কার্ত্তিকমাস, চ্যারকেটুর গায়ে কোঁচার খুঁট। এরপর পৌষমাস। তাহলে আর শুয়ে-শুয়ে চ্যারকেটু হাত-পা টান টান করে কেমন করে। হাত-পা টানটান করতে চ্যারকেটুকে দাঁড়াতেই হয়। আর যদি এই শেষরাতে মাচান থেকে নেমে হাত-পা টান করে চ্যারকেটু দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে, তিনবছরের পুরনো ঝুরঝুর খড়ের চালে তার আর চলে না—তাহলে পুরুষানুক্রমিক আকাশটিকে মাথার ওপর দরকার হয়। তা সে কার্ত্তিকই হোক আর পৌষই হোক।

চ্যারকেটুর মাচানটা পশ্চিম আর উত্তরের বেড়ার গা থেকে বেরিয়েছে—ঐ দুদিকের খুঁটির খরচ বাঁচিয়ে দক্ষিণ আর পুবে খুঁটি দিয়ে তার ওপর টানা বাঁশ বেঁধে মাচানটা রাখা! দক্ষিণের ফাঁকটা দিয়েই চ্যারকেটুকে পেচ্ছাব করতে হয়—পুবে তো গোয়ালঘরের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা একটা গাই আর একটা বাছুর—আগে আরো একটা বাছুর থাকত। তখন বাছুর দুটি আর গাইটা ধাক্কাধাক্কি করতে-করতে রাত্রিবেলা অনেকসময় চ্যারকেটুর মাচানে এসে পড়ত। তারপর নিজেদের দড়িদড়ায় প্যাঁচ লাগিয়ে দাপাদাপি শুরু করত। একটা বাছুর বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর এখন আর তেমন হয় না। মাচান-বাদে বাকি হাত-চারেক জায়গায় গাইটা বাছুর নিয়ে থেকে যেতে পারে। আরামেই। বছর তিনেক আগে খরবরু মাস্টার এই পুরনো ঘরের চালটা বেচেছিল। সেবার পাটার দাম ভাল পাওয়া গিয়েছিল, তাই খরবরু মাস্টার গোহালি ঘরে নতুন চাল লাগায় আর খেতখেতু-চ্যারকেটু তার পুরনো এই চালটা কিনে নিয়ে এসে লাগায়। খরবরুর চালটাই ছিল প্রায় বছর-তিনেক পুরনো আর তারপর আরো বছর-তিনেক কেটেছে। এখন খড়গুলো পচে ঝুরঝুর। বাঁশের বেড়ার চাপে, নারকেল দড়ির গিঁঠে, আর জল-ধুলোবালিতে সেই ঝুরঝুর খড়গুলো খানিকটা চাপ বেঁধে আছে। কিন্তু সেই দড়ি আর বাতাগুলোও ত শুকিয়ে ভিজে পচে শুকিয়ে পচে খড়খড়িয়ে গেছে। নারকেল দড়ির ওপর হাত দিলেই দড়িটা খসে যায় অথচ গিঁঠটা দেখলেই মনে হয় গিঁঠই। চাপ বেঁধে আছে বলেই ঘরের কাঠামোটা দাঁড়িয়ে। এই শীতে যদি খড় বদলানো না যায় তাহলে ফাল্গুন-চৈতের হাওয়ায়-হাওয়ায় চালার খড়কুটো বাতাসের সঙ্গে মিশে

ফুরফুরিয়ে উড়ে যেতে থাকবে। কেউ টেরটিও পাবে না। চাঁদনি, অন্ধকার আর রোদ আর-একটু স্পষ্ট হবে।

এখন, এই চালার ভেতর থেকে বাইরের জ্যোৎস্নাটা দেখাচ্ছে, যেন পাটখেতের ভেতর থেকে দেখা রাস্তার লোকজন, সাইকেল, গাড়ি। অঞ্চল অফিস থেকে চ্যারকেটু গেল বছর কয়েকটা পোস্টার এনেছিল। কয়েকটাতে একটা বেটাছেলে, একটা মাইয়াছোয়া, একটা বেটাছোয়া আর-একটা বিটিছোয়ার ছবি। বাচ্চাকাচ্চা কম বানাইবার পোস্টার—মোর তো বিয়া বসাই হয় নাই। একটা পোস্টারে একটা বাচ্চার বড় মুখ—তাতে মা-শীতলার দয়া। কয়েকটাতে ধানখেত আর পাম্প। কয়েকটাতে ধানখেত আর দুদিকে দুই বস্তাভর্তি সার। তিন-চার বছর ধরে নানারকম ভোটের পোস্টারও চ্যারকেটু জোগাড় করেছিল। জোড়া বলদের দুটো পোস্টার এখনো গরুর খুঁটির একেবারে মাথার দিকে—কিন্তু বলদদুটোকে এখন আর চেনা যায় না—স্যালায় ক্যানং বিশালিয়া কাঁধখান আর শিং দুইটা আছিল, ছবিত থাকিয়াই গোহালটাক্ ভরি রাখিত আর অ্যালায় রঙটঙ উঠি গিয়া বলদ দুইটাক্ আর চেনা না যায়—দেখাছে য্যানং চ্যারকেটুর বেচা-বাছুরের খুঁটার নাখান। গাই-বাছুরের বেশ কয়েকটা পোস্টার আছে—বড়, ছোট নানা রঙে ছাপা। ইন্দিরা গান্ধীর বড়-বড় ছবি আছে—দুটো। দুটো কাঁচিদাও-ধানের শিষ আর একটা কাঁচিদাও-হাতুড়ি তারা। ছোট-ছোট হ্যাণ্ডবিলও অনেকগুলি ঘরের ভেতর লাগানো ছিল। সেগুলোর ছাপা উঠে গেছে। এখন আর আলাদা-আলাদা চেনা যায় না। এই সব পোস্টার জোগাড় করে চ্যারকেটু গোয়ালঘরটার বেড়ায় আর চালে লাগিয়েছে।

কোথায়-কোথায় লাগাব সেটা তাকে বেশ খুঁজে-খুঁজে বের করতে হয়েছে, ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হয়েছে। প্রথমে লাগিয়েছে দক্ষিণদিকের বেড়ার মাঝখান দিয়ে—বৃষ্টির ছাঁটে যাতে দেয়াল না ভেজে। তারপর দুটো লাগিয়েছে পুবের বেড়াটার মাঝ-বরাবর—ওদিকের বাছুরটার গায়ে বৃষ্টির ছাঁট লাগত। বাছুরটা বিক্রি করে দেয়ার পর ঐ পোস্টারদুটো যেন আর-কোনো কাজে লাগছে না। চ্যারকেটুর শোয়ার মাচানের মাথার দিকে একটা পোস্টার জুটেছে। সেখানে আর-একটা পোস্টার দিলে বৃষ্টির ছাঁট আর হিম খানিকটা আটকাত। কিন্তু মাথার দিকে একটা পোস্টার কম পড়ে যায় আর পাশের দিকে তিনটি পোস্টারের জায়গায় দুটি পোস্টার আছে। বাছুরটা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর চ্যারকেটু চেষ্টা করেছিল পুবের বেড়ার পোস্টারদুটো খুলে যদি তার

মাচানের মাথা আর পাশে লাগানো যায়। কিন্তু পোস্টারটায় হাত দিতেই গাই-বাছুরের বাছুরের পেছনের পা-টা পাঁপড় ভাজার মতো ভেঙে-ভেঙে যায়। চ্যারকেটু আর হাত দেয় নি। কিন্তু ওদিকে তাকালেই, বিশেষত রাত্রিতে এখন তার কেমন খালি-খালি লাগে। বাছুরটা নেই আর বাছুরটাকে বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচাবার জন্য পোস্টার তিনটি দিব্বি আছে। এমনি তাকালে মনে হয় দিব্বি আছে, কিন্তু হাত দিলেই পাঁপড় ভাজার মত ভেঙে যায়। বাতাসে-বৃষ্টিতে নানা জায়গা ফেটে গেছে, পোস্টারের রঙটা ময়লা লালচে। দুটো-একটা টুকরো খসেও পড়েছে—কিন্তু বেড়াটার সঙ্গে লেগে আছে ঠিকই, লেগে থাকবেও যেন ঠিকই। আর পোস্টার তিনটে ঐখানে রেখে দেওয়া ছাড়া কিছু করারও নেই, হাত দিলেই পাঁপড় ভাজা। শুধু পোস্টারদুটো লাগানো হয়েছিল যে-কারণে, সেই বাছুরটা বিক্রি হয়ে গেছে। ফলে পোস্টারদুটো জোগাড় করার জন্য যত মেহনত চ্যারকেটুর হয়েছে, সবই 'জাই' (নষ্ট) গেছে।

অঞ্চল অফিসে এক কোনায়, সেক্রেটারির চেয়ারের পেছনে পোস্টারগুলো বোন্দা বাঁধা পড়ে ছিল। বস্তাটা ওপর থেকে কেউ ছিঁড়ে দিয়ে থাকবে। সেক্রেটারির চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে চ্যারকেটু বস্তার ছেঁড়া দিয়ে ভেতরের ঝকঝকে তেলতেলে নীল-সবুজ-হলুদ রঙ দেখে ফেলে। ঐ ভাঙাচোরা অঞ্চল অফিস, কাঠের চেয়ার-টেবিলের পেছনে ময়লা মেঝের এক কোনায় ছেঁড়া চটের থলির ফাঁক দিয়ে চটের ভেতরের সেই চকচকে তেলতেলে নীল-সবুজ-হলুদের একটুখানি আভাস, একেবারে চ্যারকেটুর চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। সেই গোপন রঙের টানেই যেন চ্যারকেটু মাথা নোয়ায়, আবার এতটাও নয় যাতে সেক্রেটারি বাবুর মনে হতে পারে সে পোস্টারটা নিতে চায়। তাই সেক্রেটারি যখন জিজ্ঞাসা করে, 'তুই তো গেল সনত্ পাটার লোনের দরখাস্ত কইচ্ছিস' তখন চ্যারকেটু 'না-হয়'-টা এমনভাবে বলে যেন অমন জলজ্যান্ত ঝকঝকে পোস্টারের কাছে পাটার লোনের দরখাস্ত অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কথাটা বলে ফেলার পর পোস্টারের ছবিগুলো আর-একটু ভালভাবে দেখার জন্য বস্তার ছেঁড়াটা ফাঁক করতে হাত বাড়ায় চ্যারকেটু, শেষ পর্যন্ত বস্তাটা ছুঁতেও পারে আর ছেঁড়াটা সরাতেও। আর সেক্রেটারিবাবুর চেয়ারের পেছনের সেই অন্ধকার কোনায় বস্তার আরো অন্ধকারের ফাঁক দিয়ে দু-দুটো 'ছোয়ার' মুখ আর-একটা 'মাইয়াছোয়ার' শাড়ির সব উজ্জ্বলতা, হাসি, লাল, সবুজ, শাদা বেরিয়ে এসে চ্যারকেটুর চোখ ধাঁধিয়ে দেয় কিন্তু তার পরেও সেক্রেটারিবাবুর গলায় প্রত্যাশিত 'হে-ই, সরি আয় এইঠে' ধমক শোনা যায় না। সেক্রেটারির প্রশ্নের

জবাবে যে-'না-হয়' চ্যারকেটু বলেছে তার অর্থ চকিতে, সেই ছবিগুলোর রঙের মতই, তার নিজের কাছে ধরা পড়ে যায়। গেল সনে পাটের লোনের দরখাস্ত করেছিল কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে চ্যারকেটু এমন স্তিমিত 'না-হয়' বলেছে যে—সেক্রেটারিবাবুর এতক্ষণের নীরবতায় সে বুঝে ফেলে—সেক্রেটারিবাবু নিশ্চয়ই লিখে দিয়েছে মাত্র গেল সনেই সে পাটের লোন পেয়েছে। পোস্টারের ছবিতে আর রঙে চ্যারকেটুর চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার ফলেই যখন তার মাথাও গোলমেলে হয়ে উঠেছে তখন পোস্টারের ছবিটা চ্যারকেটুকে ছুঁতে দিতে সেক্রেটারিবাবুর আর আপত্তি কী।

'হেই বাবু, হামরালা গেল সনত্ পাটার লোনের দরখাস্ত না কইচ্ছু—' টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে কথাটা বলে ফেলার আগে চ্যারকেটুও মনে-মনে একটা হিশেব কষে নেয়—আগে একটা পোস্টার চেয়ে নিয়ে কথাটা বললে হয়। যদি সেক্রেটারিবাবু সত্যি-সত্যি কথাটা মিথ্যে করে লিখে থাকে তাহলে একটা পোস্টার দিতে তার আপত্তি হবে না। 'হে বাবু, মোক্ দুইটা পোস্টার দাও কেনে'।

'যা, যা, এই পোস্টার নিয়া তুই কী করবু?' সেক্রেটারি লিখতে-লিখতে জবাব দেয়।

'হ-অ-য়। নিয়া যাম। টাঙাম ঘরঠে', চ্যারকেটু ধীর স্বরে বলে।

'তর দারিঘরত ত রোজই পঞ্চায়েত বসিবার ধরিছে, না? তর ঘরত্ ত তুই আর গরুখান দেখিবি, আর কায় দেখিবে?

'বাহারঠে টাঙাম। সগায় দেখিবে।'

'যা যা, নে কেনে একটা, একোটার বেশি না নিস', সেক্রেটারি মুখ না-তুলে আদেশ দেয়।

ছেঁড়া চট আর আজেবাজে কাগজ সরিয়ে পোস্টারটাতে হাত দিতে যে-শব্দ হয় আর সময় লাগে সেই শব্দের আড়ালে আর সময়ের সুযোগে চ্যারকেটু এক সঙ্গে তিনটি পোস্টার তুলে ফেলে আর তুলেই ভাঁজ করে ফেলে যাতে বাইরে থেকে দেখে বোঝা না যায় কটা পোস্টার। এত নানা রঙের ও রকমের ছবির মধ্যে বাছাই দূরে থাক, চ্যারকেটু দেখেও নিতে পারে না কী কী ছবির পোস্টার সে নিল। পোস্টারগুলো ভাঁজ করে ফেলার পর চ্যারকেটুর একটু ভাবনা আসে, এখন সেক্রেটারিকে বলে কী করে যে গেল সনে পাটার লোনের দরখাস্ত সে করে নি। বলা মাত্র ত সেক্রেটারিবাবু ধমকে উঠে পোস্টারটা রেখে দিতে বলবে। পোস্টারটা নেয়ার আগে কথাটা যে-ভাবে বলা যেত, নেয়ার পর ত

boiRboi.net

আর সে-ভাবে বলা যায় না। অথচ পোস্টারটা পাওয়ার পর এখন আর চ্যারকেটুর কোনো সন্দেহই নেই যে তার ফর্মটাতে সেক্রেটারি মিছা কথা লিখেছে। এক উপায় আছে এখন চলে গিয়ে পোস্টারটা রেখে, পরে আসা। গেল বছর পাটের লোন পায়নি। এ-বছরও পাবে কিনা ঠিক নেই। কারণ, লোন পেতে হলে নাকি সেক্রেটারির সঙ্গে বখরা ঠিক করতে হয়। কিন্তু তাকে সেক্রেটারি কোন বখরার কথা বলে নি। তার মানেই সে লোন পাচ্ছে না। অনিশ্চিত পাটালোনের চাইতে হাতের মুঠোর নিশ্চিত পোস্টারের প্রতি চ্যারকেটু অনেক বেশি টান বোধ করে। তখনই সেক্রেটারি ফর্মটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'সই কর্ কেনে', তারপর জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বলে, 'এইঠে—'

চ্যারকেটু একবার পেছন ফিরে দেখে নেয় পোস্টারটা পাচার করার মত কেউ আছে কিনা। কেউ থাকতেই পারে না—কারণ চ্যারকেটু পোস্টার দিয়ে কাউকেই বিশ্বাস করবে না—তাও ছোট কাগজের ছবিছাড়া হ্যাণ্ডবিল হলেও না হয় কথা ছিল! টেবিল থেকে ডট্-পেন্সিল তুলে ফর্মটা টেনে নিতে-নিতে চ্যারকেটু বলে, 'বাবু, হামরালা ত গেল সনত্ পাটার লোনের দরখাস্ত করি নাই।'

'কইচছিস কি না কইচছিস তরঠে মুই ভাল জানো, নে সই কর্ এই ঠে।'

'বাবু, মুই ত গেলসনত্ পাটার লোন পাই নাই।'

'পাছিস কি না পাছিস, তরঠে মুই ভালো জানো, নে সই কর, এই ঠে।'

চ্যারকেটুর বাঁ হাতে ভাঁজ করা পোস্টার। সেটা টেবিলের ওপর রেখে সই করার কথাই ওঠে না, হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। আর সেটা বাঁ হাতে ধরে রেখে ডান হাতে একটা সই মেরে দেয়ার মত সই করা তার পক্ষে সম্ভবই নয়। ফলে সই করার প্রস্তুতিতে তাকে খানিকটা সময় নিতে হয় যার ফাঁকে সে বলে দিতে পারে, 'পড়ি দাও কেনে কী লিখিছেন গেল সনের বাদে।' কথাটা খুব হিশেব কষে তার মুখ দিয়ে বেরয় নি, এক ধাক্কায় বেরিয়ে গেছে। আর বেরিয়ে যাওয়ার পর চ্যারকেটু মনে-মনে তৈরি হয় পোস্টারটা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এইবার। অভিজ্ঞতায় চ্যারকেটু জানে যে যদিও সেক্রেটারি লিখবার সময় বানিয়ে-বানিয়ে মিথ্যা কথা লিখতে পারে—যাতে চ্যারকেটু লোনটা না পায়, কিন্তু কখনোই বানিয়ে-বানিয়ে পড়বে না। আরো দশজন আছে। তারাও তাহলে শুনে রাখবে কী লেখা হয়েছে। সেক্রেটারি ফর্মটা টেনে নিয়ে বলে, 'গেলসনত্ পাটার লোন না পাছিস—এইটা লিখিছি।'

'না, লেখ কেনে, দরখাস্ত করি নাই।'

boiRboi.net

'ও লিখিবার না-লাগে। করিস না-করিস—পাস্ ত নাই।'

'আরে লিখি দাও কেনে দরখাস্ত করি নাই।'

চ্যারকেটুর সামনেই সেক্রেটারিকে একটা লাইন কেটে আর-একটা নতুন লাইন লিখতে হয়। কায় জানে আগত কী লিখিছে আর অ্যালায় কী লিখিবার ধইচছেন—ভেবে চ্যারকেটু ফর্মটা নিয়ে সই করার জন্য তৈরি হয়। ফর্মটা টেবিলের ওপর এগিয়ে এনে তলায় ভাঁজকরা পোস্টারটা গুঁজে দেয়। তারপর, টেবিলের ওপর দুই কনুইয়ের ভর দিয়ে, কোমর ভেঙে, পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। চ্যারকেটুর শরীরের ভারে টেবিলটা কাঁপে।

চ্যারকেটু সই করতে পারে কিন্তু কী সই করে তা জানে না, কোন্ অক্ষর লেখে তাও জানে না। যুক্তফ্রন্টের সময় বহু ধরে-ধরে এবাদুলের কাছে সই করাটা শিখে নিয়েছে—টিপসই দিতে লজ্জা করে। কিন্তু, দুই কনুইয়ের ওপর শরীরের সব ভর দিয়ে কাগজটার উপর উবুড় হয়ে দুই হাতের তলায় কাগজটাকে চেপে ধরে তার সে-সইটা আঁকতে পারে। আঙুল একটু নাড়িয়ে-চাড়িয়ে অক্ষর ফোটাতে চ্যারকেটু পারে না, তাকে সমস্ত কব্জিটাই নাড়াতে হয়, ফলে সইয়ের টানগুলো হয়ে ওঠে লম্বা অথচ অক্ষরগুলোর অন্তর্বর্তী ফাঁকটুকু একটু বেশি রাখতে পারে না, একটা অক্ষর আর-একটা অক্ষরের গায়ে এসে পড়ে।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর সই করতে চ্যারকেটুর খুব অসুবিধে হয়। এবাদুলের কাছে শিখবার পর সে সেই অভ্যাস করেছিল মাটির ওপর বসে-বসে লাঠি দিয়ে এঁকে-একে। আর, সেই অভ্যাসের সময় চ্যারকেটু মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত, পা-দুটো মুড়ে যেত পেছনে আর বাঁ কনুইয়ের ওপর শরীরের ভর দিয়ে ডান হাতের কব্জিটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে লাঠি দিয়ে মাটির ওপর সই ফোটাত। যতক্ষণ সম্ভব ততক্ষণ একই জায়গায় শুধু ঘুরে-ঘুরে মাটিতে সই ফোটাত, তারপর হেঁচড়ে একটু সরে গিয়ে আবার অভ্যাস শুরু করত। লাঠি, মাটি, সমস্ত কব্জি নাড়িয়ে সই ফোটানো—এই তিনটি কারণে চ্যারকেটুর সই করার ভেতরে, বা হয়ত সই-এর ভেতরেই, একটা খোদাই করার ধরন এসে যায়—পাটার লোনের জন্য সেক্রেটারির তৈরি করা বিবরণের নির্দিষ্ট জায়গায় সে সেই সই খুদে যায়, টেবিলটা ঠকঠক করে কাঁপে, মনে হয় ভেঙে যেতে পারে আর পেন্সিল চালানোর চাপে চ্যারকেটুর কব্জি, পুরোবাহু আর বাহুর পেশিগুলোও বেশ দৃশ্য হয়।

ফর্মটা ফেরত নিতে-নিতে সেক্রেটারি বলে, 'এরপরঠে সই করিবার তানে

boiRboi.net

একটা কোদাল নিয়া আসিস রে চ্যারকেটু।'

অক্ষর ফোটাবার উত্তেজনায়, শ্রমে আর একাগ্রতায় চ্যারকেটু সোজা হয়ে দাঁড়ায়, যেন কপালের ঘাম মুছবে। তার পোস্টারের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল, ফেলেই যেত, যদি সেক্রেটারি ফর্মটা টেনে নিলে ভাঁজ করা পোস্টারটা চ্যারকেটু দেখতে না-পেত। চ্যারকেটুর হাতের চাপে পোস্টারটায় একটা উল্টো ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল। এই গেল, এক পোস্টার পাওয়ার গল্প।

আর-একবার। হাটে বি-ডি-ও সাহেবের গাড়িতে পেছনে বস্তাবাঁধা পোস্টার নিয়ে একটা খুব শাদা-মত বাবু চুপচাপ বসে ছিল। চ্যারকেটু হাত বাড়ালে তিনি দুটো পোস্টার দিয়েছিলেন। চ্যারকেটুকে কিছু বলতে হয় নি। বাবু চুপচাপ বসেছিলেন। আর গাড়ির পেছনে গণ্ডা-গণ্ডা ছাওয়াছোটর ভিড়। সেই অত বাচ্চার ভিড়ে চ্যারকেটু গিয়ে দাঁড়ায়, যেমন অনেকে দাঁড়াচ্ছিল, তারপর চলে যাচ্ছিল। কিন্তু চ্যারকেটু দাঁড়িয়েই পোস্টারগুলো দেখতে পায়। সামনে বাচ্চারা এত গোলমাল আর চেঁচামেচি করছিল যে চ্যারকেটুর গলা বাবুর কানে পৌঁছত না। চ্যারকেটু তাই পেছন থেকে, ঐ অতগুলো কচি মাথার ওপর দিয়ে, তার বয়স্ক, রগ ওঠা, কর্কশ, হেজেযাওয়া হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। চ্যারকেটুকে কিছু বলতে হয় নি। অতগুলো বাচ্চা-মাথার ওপর দিয়ে একটা লোভী বয়স্ক হাত মেলে ধরেছিল, সেই শাদাবাবুও যেন জানত, পোস্টারের ভেতরের ছবি আর রঙে চ্যারকেটুর কোনো আকর্ষণ নেই, সে শুধু একটা বড় মোটা কাগজ চায়, যাতে তার গোয়ালের কোনো-কোনো জায়গা সে ঢাকতে পারে, যাতে প্রথমত তার বাছুরের গায়ে, দ্বিতীয়ত গাই-বাছুরের পোয়ালে আর তৃতীয়ত তার নিজের গায়ে, বৃষ্টির ছাঁট বা রাতের হিম না লাগে। পোস্টারটা পাওয়ার পরও, পোস্টারটা দিয়ে পুবের ফাঁকাটা বন্ধ করার পরও, বাছুরটা বিক্রি হয়ে যায়। চ্যারকেটু অবশ্য এখনো আছে।

অঞ্চল অফিস আর বি-ডি-ও-র গাড়ি—এর কোনো জায়গা থেকেই পোস্টার জোগাড় করতে চ্যারকেটুকে খুব একটা হাঙ্গামা করতে হয় নি, চাওয়ামাত্রই পেয়েছে। কিন্তু অঞ্চল অফিসে পোস্টারটা চাওয়ার আগে নানারকম ভাবা, চাওয়ার আর তিনটি পোস্টার নিয়ে এক জায়গায় ভাঁজ করে ফেলা, তারপর পাটার লোনের দরখাস্তের সঙ্গে পোস্টার নেয়ার সম্বন্ধ কী তাই নিয়ে নানা সন্দেহ করা, তারপর সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা আর সর্বশেষে সই করা—এই সব মানসিক প্রক্রিয়ার জটিলতায় অনভ্যস্ত চ্যারকেটুকে মানসিক দিক থেকে ব্যস্ত করে ফেলেছিল। আর বি-ডি-ও-র গাড়ির শাদাবাবুকে সে যে কোনো কথা

boiRboi.net

বলতে পারে নি, শুধু তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল আর বাবু তাকে পোস্টার দিয়ে দিয়েছিলেন—এর ফলে, সারা রাস্তা, কুচকুচে গায়ে কুটকুটে কালো একটা কানিমাত্র পরনে চ্যারকেটু যে মোড়ানো পোস্টারের ধবধবে শাদাটুকুকে নিজের শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে হাট থেকে বাড়ি এসেছিল, তাতে একদিকে যেমন পোস্টারটা পেয়ে যাওয়ার আনন্দ ছিল, তেমনি এমন একটা সন্দেহও হয়েছিল বাবু তাকে কি চ্যাঙা ন্যাংটো একটা ভিখিরি ভেবে নিলেন ? তখনো, বা এখনো, চ্যারকেটু ভিখিরি হয় নি।

ভোটের পোস্টারগুলো জোগাড়ে ধান্দা করতে হয়েছে কিন্তু ভাবনাচিন্তার ভেতর যেতে হয় নি। ভোটের সময় বাবুরা মিটিং করতে আসে, বেশির ভাগই, হ'টে। তাতে মিটিঙের লোক-জমানোর জন্য কাউকে খাটতে হয় না। অবিশ্যি, মন্ত্রীরা বা কলকাতা থেকে বড় নেতার ঘর এলে, হাটবার ছাড়া অন্যদিনও, মিটিং হয়। তবে সে-মিটিং ত আর গ্রামে হয় না, শহরে হয়, ট্রাকে করে নিয়ে যায়। হাটের দিন 'বাবুর ঘর' মাইক নিয়ে আসে, খুব একটা উঁচু বাঁশের মাথায় মাইকের চোঙ বাঁধা হয়। মিটিং শুরু হওয়ার আগে ও মিটিং শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে শ্লোগান চলে। আসলে শহরের 'বাবুর ঘর' একজন বা দুইজন শ্লোগান 'ধরি দেয়,' দুইখ-চারবার দিতেই সবাই শিখে যায়। তাছাড়া, সবার ত মোটামুটি জানাই থাকে কোন্ পার্টির কোন চিহ্ন। আর চিহ্ন জানলেই জানা থাকে শ্লোগানটা কী হবে। আর শ্লোগানের সময় মাইকে এত গোলমাল হয় দু-একটা ভুল হলেও কেউ বুঝতে পারে না। তাছাড়াও মাইকের সামনের মুখটা ত শহরের 'বাবুর ঘরেরই'। তাই, যে-পার্টিরই হোক না কেন, হাটে ভোটের মিটিঙের শুরুতে মাইক বাঁধার পর শ্লোগান শুরু হলেই চ্যারকেটু আস্তে-আস্তে গিয়ে সেই শ্লোগানের দলের পেছনে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে গলা মেলায়। মিটিং শুরু হওয়ার আগে এ-রকম বেশ বারকয়েক শ্লোগান দিতে হয়। তারপর বক্তৃতা শুরু হলেই চ্যারকেটু ঐ শ্লোগানের দলের নেতাবাবুকে বলে, 'বাবু, মুই একটু ঘুরি আসিছু।' বেশির ভাগ সময়ই বাবু বলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঘুরে এসো' আর চ্যারকেটুদের ভাষা যদি বাবুর একটু-আধটু জানা থাকে তাহলে বাবু বলেন, 'চট করি ঘুরি আয় কেনে।' যতক্ষণ বক্তৃতা চলে চ্যারকেটু হাটে বেড়ায়। বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র আবার ছুটে এসে মাইকের পেছনে দাঁড়ায়। এ-রকম করতে-করতে চ্যারকেটুর এমন অভ্যেস হয়ে গেছে, সে ঠিক বুঝতে পারে শেষ বক্তৃতা কোনটা, আর কখন শ্লোগান হবে। সেই শেষ শ্লোগানের আগে পৌঁছে চ্যারকেটু আবার সেই বাবুর সঙ্গে দেখা করে বলে,

boiRboi.net

'বাবু আসি গেইছি।' বাবু অনেক সময় চিনতে পারেন না কিন্তু চেনার ভান করেন। তখন চ্যারকেটু কোনো লজ্জা না-করেই পরিচয় দেয়, 'মুই শ্লোগান দিয়া গেইছু যে।' বাবুকে তখন 'হ্যাঁ হ্যাঁ' বলে চিনতেই হয়। বিপদ বাধে সঙ্গে যদি গাঁয়ের কোনো মুখিয়া থাকে। আগে অবিশ্যি কংগ্রেস ছাড়া আর-কোনো দলের মিটিঙে কোনো মুখিয়া থাকত না। কিন্তু সেই যুক্তফ্রন্টের পর থেকে সব দলেরই দু-চারটে মুখিয়া জুটে যায়। মিটিঙের শেষে যখন পোস্টার-হ্যাণ্ডবিল বিলি হয়, তখন চ্যারকেটু হাত বাড়ালেই দু-একটা পোস্টার পেয়ে যায়। আগে যখন এক জোড়া-বলদ পার্টি ছিল, তখন পোস্টার পাওয়া যেত না,—'সগায় এক পার্টি' আর পোস্টার-টোস্টার সব ত গাঁয়ের মুখিয়া-মাতব্বররাই নিয়ে নিত। কাঁচিদাও-ধানেরশিষ ভেঙে হল আবার হাতুড়ি-তারা। এখন ত গাই-বাছুরও হয়েছে। দল যত বাড়ে পোস্টার পাওয়ার তত সুবিধে। সব পার্টির মিটিঙেই শ্লোগান দেয় বলে হয়ত গ্রামের 'মুখিয়া'দের কেউ-কেউ চ্যারকেটুকে দু-একবার ধমকায়। কিন্তু আসলে চ্যারকেটু এমন না-খাওয়াইয়া, আর এক আধিয়ারের ভাই-ব্যাটা যে সে কী করল, না-করল, তাতে কারও কিছু যায় আসে না। তাই পোস্টারটা সে পেয়েই যেত, বেশির ভাগ। ধানের শিষ থেকে হাতুড়ি হল, বলদ থেকে গাই হল, চ্যারকেটুর পোস্টারও বাড়ল। তাছাড়া ক-বছর বেশ বছর-বছর ভোট হচ্ছিল—ফলে বছর-বছর পোস্টারও পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু বছর-কয় হল ভোটাভুটি বন্ধ হয়ে গেছে।

পোস্টার পাওয়ার পর চ্যারকেটুর প্রধান সমস্যা হত পোস্টার লাগানো। সারা জীবনে একটা-কি-দুটো পোস্টার লাগাতে হলে, তাও আবার ছবির জন্য, পাটকাঠি দিয়ে বেড়ায় গায়ে গুঁজে দেয়া যায়। পাটকাঠি দিয়ে গোঁজা পোস্টার দিব্বি থাকে, যতদিন থাকার। কিন্তু বৃষ্টির ছাঁট বা রোদ বা হিম ঠেকানোর জন্য বাঁশের বা ভামনির বেড়ার বদলে যে-পোস্টার লাগাতে হয়, সেটা ত যেখানে-সেখানে লাগানো চলে না, তার নির্দিষ্ট জায়গা আছে, নির্দিষ্ট ফাঁক আছে, মেপে-মুপে দেখতে হয় বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাছুরের গাটা বা নিজের মাথাটা সত্যি বাঁচবে কিনা। এত বেশি নির্দিষ্ট জায়গাতে কাঠি পুঁতে কাজ সারা যায় না। অথচ সেই পাটকাঠিতেই প্রথম দিকে চ্যারকেটুকে কাজ সারতে হয়েছে। তারপর অবশ্য বেশ-কটা পোস্টার পাওয়ার পর গাবগাছের গা কেটে আঠা নিয়ে এসেছে ঠিকই, কিন্তু গাবের আঠাতেও ত এতবড় কাগজ ঠিকভাবে লাগানো যায় না—যদিও সমস্ত কাগজটাতে আঠা লাগিয়ে সেঁটে দেয়ার মত বেড়ার আস্ত অংশ চ্যারকেটুর এই ঘরে নেই। আর আঠা দিয়ে লাগাতে হলেও তাকে শুধু

boiRboi.net

ওপরে-নীচে টানা আঠা দিয়ে, সেটা ওপরে নীচে দুটো বাতার সঙ্গে লাগিয়ে দিতে হয় মাত্র। আর তেমন ক্ষেত্রে প্রায়ই ওপর-নীচের বাতার দূরত্বটা কাগজের মাপ মত হয় না, ফলে মাঝখানের ফাঁক দিয়ে বাতাস এত ফরফর করে যে পোস্টারটাই ছিঁড়ে যেতে পারে। এইটুকু কাজের জন্য গাবের আঠা আনতে-আনতে শুকিয়ে যায়। জল দিয়ে গুলিয়ে নেয়ার বুদ্ধিতে একবার এতটাই গুলিয়ে ফেলে যে আঠার আর-কিছু ছিল না। এত ঘনঘন ত আর পোস্টার মেলে না চ্যারকেটুর যে পোস্টার লাগাতে-লাগাতেই সে আঠা আর জলের অনুপাতটা শিখে ফেলবে। তাও আবার সবগুলো পোস্টার একবারে লাগানো গেলে হত! তা না, পাঁচ বছর ধরে একটা-দুটো করে গুটি কয় পোস্টার এইটুকু একটা ঘরে জায়গা বুঝে-বুঝে লাগাতে হলে—একটা নতুন পোস্টার লাগাতে-লাগাতে একটা পুরনো পোস্টারের খসে পড়ার টাইম এসে যায়। ভোটের পোস্টারগুলোর বেলায় অবিশ্যি অনেক পার্টি সঙ্গে ময়দার আঠাও শহর থেকে নিয়ে আসে, তেমন-তেমন ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধেই হয় নি।

এই ঝুরঝুরে ঘরে নানা রঙের নানা রকমের পোস্টার। পরিবার পরিকল্পনা, বসন্তরোগ নির্মূলকরণ, সার, পাম্প, অধিক ফলনশীল ধান, জোড়া বলদ, কাঁচিদাও ধানের শিষ, ইন্দিরা গান্ধী, হাতুড়ি তারা, গাই-বাছুর। নানা রঙ, নানা ছবি। যে-পোস্টার যত পুরনো, তার কাগজের রঙ তত লালচে, ছবির রঙ অস্পষ্ট, লেখাগুলো ধুয়ে-যাওয়া। যে-পোস্টার যত নতুন তার ছবির আর লেখার রঙ তত চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এই ঘরে সবগুলো পোস্টার যদি একসঙ্গে লাগাতে পারত চ্যারকেটু, তাহলে এত জলজল করত ঘরটা, কেউ বুঝতেই পারত না যে বৃষ্টির ছাঁট ঠেকাবার জন্য এত ছবি টাঙানো হয়েছে—সবাই ভাবত ঘরটাকে সাজানো হয়েছে। কিন্তু যেমন-যেমন ফাঁক তেমন-তেমন পোস্টার ত আর জোগাড় হয় না। যেমন-যেমন পোস্টার পুরনো হয়, তেমন-তেমন নতুন পোস্টার ত আর জোগাড় হয় না। তাই এই ঘরের ভামনি, বেড়া, বাতার মত পোস্টারগুলোও ঝুরঝুরে হয়ে যায়। তখন বৃষ্টির ছাঁট বাছুরের গায়ে যাতে না-লাগে সেই উদ্দেশ্যে টাঙানো পোস্টারটা, বাছুরটা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরও খুলতে গেলে, ঝরঝর করে ঝরে যায়।

হাত দিতে গেলে অবিশ্যি এই ঘরের যে-কোনো জায়গাই ঝরে যাবে, ঝরঝর করে ঝরে যেতে পারে সমস্ত ঘরটাই। কিন্তু এত যে বাতাস আর বৃষ্টি এতেও ঘরটা ধ্বসে যায় না। বেড়ায় ভামনি বলতে হয়ত কিছুই নেই, এমন-কি ভামনি বাঁধা থাকে যে-বাতায়, সেই বাতাগুলিও নেই। খুঁটি হয়ত

boiRboi.net

গুটিকয় আছে—কিন্তু সে-থাকার ভেতর কোনো নিয়ম নেই। বৃষ্টিতে ভিজে, পচে, রোদে শুকিয়ে, হাওয়ায় ঝরে, মাকড়সার জালের মত একটা খুব পাতলা আস্তরন ঘরময় লেগে আছে। হাওয়ায়-হাওয়ায় এই ঝরঝরে ভামনি উড়ে যায়, আমের মুকুল বা ঝরাপাতার মত। হয়ত ঘরের বেড়ার ও চালের ফাঁক দিয়ে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে যেতে পারে তাই বাতাসের ধাক্কা লাগে না। কিন্তু ঘরটা শুধু বাতাসে মিশে যাচ্ছে বছরের পর বছর জুড়ে। এই রকম সম্পূর্ণ মিশে যেতে কিছুটা সময় লাগে বই-কি। ঝরতে-থাকা ভামনির ওপর আবার এত ভোটের পোস্টারের আর পরিবার পরিকল্পনা, সমবায় সপ্তাহ আর বসন্তরোগ নির্মূলকরণ ইত্যাদি পোস্টারের আস্তরন দেয়া হয় যখন, সময়টা তখন হয়ত আরো একটু বেশি লাগে। বছরের পর বছর দেখায় যেন এই গরুবাঁধা খোঁটা আর এই চ্যারকেটুর মাচানসহ গোয়ালঘরটা থেকেই যাচ্ছে, একটা মানুষের মত। বাইরে থেকে দেখে ত আর বোঝা যায় না যে পোস্টারগুলো লাগানো হয় বৃষ্টির ছাঁট কিংবা রোদ কিংবা হিম আটকাতে। ফলে নানা রঙিন রেখায় লেখায় বেশ সাজানোই মনে হতে পারে ঘরটাকে, যে-ঘরটা ঝরে-ঝরে উড়ে উড়ে যাচ্ছে, এমন-কি তার খুঁটো আর ভিটে সমেত—পড়ো ভিটে আর খুঁটোর তাবৎ সাবেকি অনুষঙ্গ অস্বীকার করে।

এখন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারপাশে একবার ঘুমকাতুরে চোখ বোলাতে চ্যারকেটুর বেশ ভালই লাগে—চোখ বোলাতে আর গা চুলকোতে আর এক পায়ে ভর দিয়ে কোমর বেঁকিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকতে, যেন কেউ জোর করে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বেড়া আর চাল দিয়ে আকাশের আর বাইরের মাঠের আলো দেখা যায়—যেন হিমে-ভেজা আলো সর্বত্র ছড়ানো। গরুটার গায়ে চ্যারকেটু হাত দেয়, খুব আস্তে লেজটা তুলে গরুটা সেই লেজ দিয়ে চ্যারকেটুর হাতটা ছুঁয়ে থাকে। গরুটির পেছনের পা বেয়ে শিহরণ বয়ে এসে চ্যারকেটুর হাতে লাগে, তার হাতে বেয়ে পা বেয়ে আবার মাটিতে চলে যায়—আবার গরুটার পা বেয়ে পিঠে ওঠে।

ঝাঁপটা ঠেলে চ্যারকেটুর বাইরে বেরয়।

সারারাত হিম পড়েছে, ফলে উঠোনটা ভিজে, পায়ের তলে ভেজা। জ্যোৎস্নায় আবিশ্যি মনে হতে পারে জ্যোৎস্না মাটিতে মিশে আছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে চ্যারকেটুকে সামনে-পিছনে ধানখেত, দুই ভিটের দুই ঘর, নীল জলজলে প্রায় তারাহীন আকাশ, পশ্চিমের আকাশের চাঁদ এই সবের

boiRboi.net

তদারকি করে দুই হাত ওপরে তুলে একটা সশব্দ হাই তুলতে হয়। একটিমাত্র নেংটিতে চ্যারকেটুর প্রায়ন্যাংটো তরুণ শরীরের সেই হাই-তোলা ভঙ্গিমার ভেতর চাঁদ-চাঁদনি-আকাশ-ধানখেত ইত্যাদির সঙ্গে একটা পারিবারিকতা প্রকাশ পায়। যেন ঘরের ভেতরে মাচানের ওপর শোয়া, আর এই উঠোনে দাঁড়িয়ে-থাকা, বা উত্তরের ঘরের সিঁড়ির গাছের গুঁড়িটাতে একটু বসা. বা আকাশে চাঁদ থাকা—এ-সবের ভেতর এমন কোনো পার্থক্য নেই।

এখন, কার্ত্তিকের এই জ্যোৎস্নাময় ঘরটার দিকে তাকালে, চ্যারকেটুর বেশ ভালই লাগে। রাতভর হিমে চালের ভামনি ভেজা। চাঁদ পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণের আকাশ দিয়ে এখন পশ্চিমে, এই ঘরটারই মাথার ওপর, ওদিকে একটু গড়ানো। ফলে চালের ছায়া পড়েছে উঠোনের দিকের বেড়ার মাথার একটা ছোট লাইনে। ঘরের ছায়া পড়েছে ভিটের কাছে একটুখানি। এই ছায়াগুলোর রঙ আর হিমে-ভেজা ভামনির রঙ এতই এক যে চ্যারকেটুর ঘুম-কাতুরে চোখে মনে হয় বুঝি চাঁদনিতেই চালাটা ভেজা।

এখন, সম্পূর্ণ আকাশে টুকটুকে নীলে একটিমাত্র সম্পূর্ণ চাঁদ, আর হিমে ভেজা উঠোন জ্যোৎস্নায় ভিজে, আর উত্তরের ঘরের সিঁড়ির গাছের গুঁড়ির ওপর নগ্ন চ্যারকেটুর বুক থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সেই জ্যোৎস্নায়, শুধু যেন মাথাটুকু জ্যোৎস্নার ওপর ভাসিয়ে-রাখা, এই ঘরটার চালা একেবারে ডোয়াঢাকা, ফলে চাঁদে চালের ছায়া চ্যারেকেটুর গলা পর্যন্ত পড়েছে, যেন চরাচরে চাঁদ-চাঁদনি-আকাশ-প্রান্তর-চ্যারকেটু ছাড়া আর-কেউ নেই, নির্জনতা যখন এমন, তখন গোয়ালের মেঝেতে গরু পা ঠোকে, একবার নয়, পরপর, তখন গরুর পিঠে লেজের ঝাপট, এই বানবাসি জ্যোৎস্নার নদীতে গভীরতার মাছের ঘাই যেন। জ্যোৎস্না থেকে ভাসিয়ে রাখা, চালার ছায়ায় ঢাকা তার মুখটায় চ্যারকেটু গলায় একটা টানা শব্দের সঙ্গে হাই তোলে, গভীর, টানা, জ্যোৎস্নায় বনে, রাতে, গভীরতার পাখির কুক্ যেন—রাত পুইয়ে যায় যে! গরুটা লেজের ঝাপটা থামায়, পা-ঠোকা থামায়, চাঁদ দেখে চ্যারকেটু টের পেয়ে যায় আরো-এক ঘুম ঘুমোবার সময় আছে, চাঁদ না-থাকলে তারা দেখে ঠিক করত। চ্যারকেটুর নিজস্ব তারা আছে।

হাই তুলতে গিয়েই চ্যারকেটুর মুখের ভেতরটা আঠা-আঠা লাগে। পিচ কেটে থুতু ফেলে, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়। জল খেতে যেতে হয়, এখন। গেল হাটের আগের হাটের দিন পর্যন্ত জল খেতে হলে কলসীর মত গলার বড় ভারী ঘটিটা তুলতেই হত—এত ভারী, খালি থাকলেও মনে হত জল

boiRboi.net

আছে। এখন প্রতি হাটেই বাসনের পাইকার ঘটিবাটি কিনতে খালি বোরা নিয়ে রিক্সায় আসে, তারপর বোরা ভরে নিয়ে সারা রাস্তা বোরার ভেতরের বাসনের আওয়াজ ঢং ঢং বাজাতে বাজাতে শহরে ফেরে। গেল হাটের আগের হাটের ঘটিবেচা টাকায় কেনা চালে চ্যারকেটুর, তার কাকা-কাকির, তিন বাচ্চার, শেষবারের মত ভাত জুটেছে পরশু রাত্রিতে—তার ফেন কাল বিকেল পর্যন্ত নুন গুলে খাওয়া হয়েছে।

চ্যারকেটু উঠোনের শেষে এসে দাঁড়ায়। যদ্দুর চোখ যায় নোয়ানো ধানখেত। ধানের ভারে গাছগুলো এখন এমনিতেই নুয়ে পড়েছে, তার ওপর সারারাতের হিম। এখন যেন মাটির ওপর শুয়ে পড়েছে—যেন কাটার আগে ধানের গোছা শোয়ানো হয়েছে আর ইচ্ছে করলেই চ্যারকেটু এখন কাঁচি নিয়ে কাটা শুরু করতে পারে। কিন্তু শুরু করা যায় না। ধান পেকে উঠতে এখনো তিন সপ্তাহ। আগুরি পাকা পাকতেও পাঁচ-সাত দিন। এদিকের জমিতে আগুরি পাক কেউ বোনে নি।

চ্যারকেটু অবলীলায় একটা জায়গায় পা গলিয়ে আলের ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু করে। ধানখেতের ভেতর খানিকটা দূরে একটা পর্দার মত—জ্যোৎস্নায় আর হিমে। দৃষ্টি তার বেশি যায় না—সেখান থেকে ধানখেত, জ্যোৎস্না, আকাশ মিশে গিয়ে পরিস্থিতিটা হারিয়ে গেছে। ফলে জ্যোৎস্নায় ধান্য-প্রান্তরের কোনো দিগন্ত থাকে না। সেই জ্যোৎস্নার আঁধিতেও আলেরই ওপর পা দেয় চ্যারকেটু। পা ফেলার জন্য বড় আলই পেয়ে যায় চ্যারকেটুর পা—সাঁড়াশির মত বাঁকা নখ, উদ্ভিদের মত লম্বা, লোহার মত শক্ত চ্যারকেটুর থ্যাবড়ানো পা। জলে যেমন ছিপ নৌকা তেমনি ছিপছিপিয়ে চ্যারকেটু হেঁটে যায়, ধানখেতের ভেতর দিয়ে নয়, জ্যোৎস্নায়, জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া পুরাকালীন নায়কের মায়া এনে। ঘুম ভেঙে রাবণের পেচ্ছাব হয়ে যাওয়ার পর নেহাত শারীরিক প্রতিক্রিয়াতেই চ্যারকেটু জানতে পেরেছিল নাকি যে তাকে আবার জল খেতে যেতে হবে, জ্যোৎস্নায়। খালি পেটে জল কলকলায়, পেটের জল ফুরিয়ে গেলে আবার জল ভরতে ধানখেতের ভেতর দিয়ে ছুটতে হয়। মাত্র সাত দিনেই কি অভ্যেস হয়ে যায় ঘটি থেকে জল না-খাওয়া—যেমন মাত্র দেড়-দুদিনেই অভ্যেস হয়ে যায় শুধু জল খাওয়া আর পেটের ভেতর জলের কলকলানি শোনা। যেমন, এখন এই অভ্যাস হয়ে যেতে থাকে, মাঝরাতে পিপাসায় জল পেতে জ্যোৎস্নায় মাখা ধান, ধানখেত আলপথ ভেঙে ছোটা। শিষভর্তি গাছগুলো পায়ের ওপর পড়ে, চ্যারকেটুর পায়ে পায়ে ঠেকে

boiRboi.net

যায় আর শিষের খোঁচায় বা পাতার ধারে চ্যারকেটুর পায়ের পাতার ওপরের দিকটা কেটে-কেটে যায় বুঝি—রক্তের রেখাও দেখা দিয়ে থাকতে পারে।

চ্যারকেটুর সমস্ত শরীরে হিল্লোল আসে—শরীরের হিল্লোল। কোমরের দড়ির সঙ্গে একটা ত্যানা ঝুলিয়ে সামনে থেকে পায়ের ফাঁক দিয়ে পেছনে নিয়ে আবার সামনে টেনে ঝুলিয়ে দেয়া। পাছার দিকে নেংটি ফাঁকের মধ্যেই ঢোকানো। ফলে, জ্যোৎস্নায় পাকা ধানখেতের ওপরে হাঁটু থেকে সিধে উঠে যাওয়া পেশল উরুর পেশিগুলো চমকে-চমকে ওঠে আর মিলিয়ে যায়। হাঁটুর ওপরে উরুর ভেতরের দিকের পেশি দড়ির মত পাকিয়ে উঠে চলকে আসে সামনে—পেশির সমস্ত গতি আর দৃঢ়তা মিলিয়ে যায় উরুর ওপরে কুঁচকিতে। চ্যারকেটুর পাছার ছোট-ছোট গোলে চাঁদের আলো বর্তুল পিছলে যায় মধ্যবর্তী খাতে, সেই খাতে পড়ে চাঁদের আলো উছলে আসে কিছুটা ভেতর থেকে বাইরে আর কিছুটা শুষে নেয় ভেতরের ত্যানার ফালি। পাছার পেশির চলকানি কোমরের মাংসে এসে লেগে দুদিকে যায়। আর নেংটি না-থাকলে কি দেখা যেত, এমন গলিত জ্যোৎস্নায়, চ্যারকেটুর বুক-পেট-পিঠ-কাঁধ-মাথাজোড়া ঊর্ধ্বাংশ যে-সংস্থানে কোমরের ওপর বসানো, তাতে হাড়ের খাঁচায় হাড়ের নড়াচড়া পেশিগুলোতে কী কোমল, সূক্ষ্ম, সংক্ষিপ্ত, নিয়ত ভঙ্গুর কম্পন তোলে? নেংটির বাড়তি অংশ সামনের দুই পায়ের ফাঁকে দোলে, গাছের পাতার মত। ফলে, দুই হাতের চাপে লাঙল গেড়ে, কোমর থেকে মাথা শাণিত নুইয়ে রোয়া গেড়ে, দুই পায়ের পাতার ওপর ভর রেখে সারাদিন গুটিগুটি এগিয়ে কাঁচি চালিয়ে, মাথায় ধানের বোঝা বয়ে, আর গোছাগোছা ধান মাথার ওপর ঘুরিয়ে এনে ঝেড়ে—চ্যারকেটুর শরীরে যে-পেশিগুলো তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিরপেক্ষভাবে তৈরি হয়ে গেছে সেই সমস্ত পেশিই এখন কাঁপছে, চলকে-চলকে উঠছে। অনাহারেও পেশি-শিরা-স্নায়ু কাজ করে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। অনাহারেও পেশি-শিরা-স্নায়ু মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে নিজেদেরই কুরে কুরে খায়। মসৃণ, উজ্জ্বল চিক্কণ, প্রাচীন পাথরের চাঙড়ের মত তার দুই বুকের পেশিপুঞ্জে অবিরল চন্দ্রপাত ঘটে যায়, দুই বুকের অন্তর্বর্তী খাত দিয়ে বয়ে তার রোমহীন পেটের মাঝখানের নালী বেয়ে নাভিতে পৌঁছয়। নাভি থেকে পাকস্থলীতে পৌঁছবার কোনো পথ নেই বলে সেই জ্যোৎস্না তলপেটে চমকে-চমকে উরু বেয়ে নেমে যায়। উঠে-আসা আর নেমে-যাওয়া জ্যোৎস্নায়-জ্যোৎস্নায় চ্যারকেটুর শূন্য তলপেটের চামড়ার ওপরে এখন জ্যোৎস্নার ঘূর্ণি। নদীর জলে যেমন নিকট দূরে এক-এক জায়গা জুড়ে চাঁদ চলকায়, তেমনি চ্যারকেটুর পিঠের ওপরের দিকের দুটি তিনকোনা

হাড়ে চাঁদ চলকে যায়। এই এতখানি ধানখেতের ওপর দিয়ে জলপানে আসা, এই এত গভীর রাত্রি, এই এত মুক্ত চাঁদ, এই এত মুক্ত নগ্নতা, এই এত দিগন্ত-হীনতা—চ্যারকেটুকে যেন শস্যের দেবতা করে তোলে। পরিণতফলভারে খেতময় অবনত এই প্রবীণ শস্যের এই নবীন দেবতা শূন্য পেট নিয়ে জল খেতে ছোটে।

ধানখেত থেকে চ্যারকেটু পিচরাস্তায় উঠে যায়। পিচরাস্তায় উঠে গিয়ে আবার ধানখেতের ওপর দিয়ে তাকায়। তার ঘরটা দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু আভাসমাত্র। মাঝখানে হিমের পর্দা। চ্যারকেটু পিচরাস্তার দুদিকেই তাকায়—রাস্তা নদীর মত দুদিকে বয়ে গেছে। দিনের বেলাতেও এ-রাস্তা প্রায় এমনি নির্জন। কিন্তু সূর্যের আলোতে মনে হয় লোকজন আছে। আর মাসখানেক পর ধানসেদ্ধ করে বেটিছোয়ারা এই রাস্তায় শুকোতে দেবে। পিচের ওপর ধান তাড়াতাড়ি শুকোয়। এ-তল্লাটে এই রাস্তা ছাড়া কোনো পাকা জায়গা নেই। তখন রাস্তা ফাঁকা হলেও নির্জন মনে হবে না। ধান দেখলেই মানুষের কথা মনে আসে।

যে-আল দিয়ে চ্যারকেটু এসেছিল সেটা চ্যারকেটুদের হালে নয়—আলিমুদ্দিন চাচার আধি। চ্যারকেটুদের আধির জমি শুরু হয়েছে আর-একটু দক্ষিণ থেকে। গিয়ে মিলেছে চ্যারকেটুর গোয়ালঘরের পিছনে। আবার কাকার ঘরের পেছন থেকে খানিকটা। আলিমুদ্দিন চাচা আর চ্যারকেটুর আধির জমি মিলে একহাল মত হতে পারে। এই একহাল জমির তিন গিরি। চ্যারকেটুদের এক গিরি আর আলিমুদ্দিন চাচার দুই গিরি। আলিমুদ্দিন চাচাদের টাড়িটা আরো খানিক উত্তরে দেখা যায়। বাড়ির জমিও গিরির।

চ্যারকেটু আবার সেই আবাদে নেমে যায়। অ্যালায় চাঁদের আলোয় ত বোঝা না যায় কুঠে কুন জমিন্ কার, কুঠে কুন জমিন কার না হয়। জোছ্‌নার আইল নাই রো। আর বানার আইল নাই। এ্যালায় জোছ্‌নায় তামান্ ভুবনটা, এ্যানং কি আকাশঠে মাটিতে তামান এ্যালায় একটো গিরির হবা পারে এ্যানং ভাব ধরিছে। সেই আকাশভুবনব্যাপী জমির দৈব মালিক বনে চ্যারকেটু যেন তার রাজ্য পরিক্রমা করতে বেরয় এখন এই রাতে, গোপনে, অজ্ঞাতসারে। পাঁচ বিঘা জমিত্ চাষ দিবার তানে আর রোয়া গাড়িবার তানে আর ধান কাটিবার তানে একখানা পুরা মানষি না লাগে, একখান পুরা মানষির ছ-আনি ঐ কাম করিবা পারে। অ্যালায় হামরালার

পাঁচবিঘা আধিত্ কাকার আর মোর বত্রিশ আনি খাটনির ছাব্বিশ আনিই জাই যাছে। পাঁচ বিঘা জমিত ফসল হবা পারে, খুব ভাল বছর, পঁচিশ-তিরিশ মণ। বিশ মণ যাছে গিরির ঘরত্—হালবলদবিছনের একভাগা আর গিরির এক ভাগা। বাকি পাঁচদশ মণ ধানে চাল হবা পারে চার-আট মণ। তিন বিঘা জমিত্ আছে ভাদই। ধর কেনে এই মোট পনের-বিশ মণ ধানত তিনখানা পুরাপ্যাট আর তিনখানা আধাপ্যাট কি তামান্ বছর চলিবার পারে? প্যাটত্ দুইদিন ভাত না পড়িলেই ভাতটার কথা আর মনত্ আইসে না। এই জোছ্নার আলোর নাথান্ ভাতথান্ এ্যানং কিছু হবা পারে, যেইলা, এ্যানং মাঝরাতত পিথিমিলা আর আকাশলায় ভাসি, বেড়ায়, শুধু সেই মানষি দেখিবার পায় যে মানষি এ্যানং গম্ভীর আতিত্ উঠিবার পারে, জাগিবার পারে, ধানখ্যাতত খাড়িবার পারে। ভাত আর চাঁদ একো জিনিশ, আকাশত্ থাকে মাঝরাতত্।

চ্যারকেটু সেই ধানখেতের ভেতর দাঁড়িয়ে ভাত দেখার জন্য আকাশের দিকে তাকায়। কোমরে হাত, তাই কোমরে ভাঁজ। কোমরে ভাঁজ, তাই পিঠেরও ঠাম বদলে যায়। শরীরের ভরটা পায়ের ওপর—বাঁ পা ঋজু, পেশিগুলো শক্ত, ডান পা হাঁটুতে ভাঙা, বাঁকা পেশিহীন, কোমল, বর্তুল। বাঁ কোমরের ওপর থেকে পিঠের পেশিগুলোর ঢাল ডান দিকে। চ্যারকেটুর মাথার অনেকটা ওপরে চাঁদের ও রাতের আকাশ। চ্যারকেটু ডান হাতটা মাথার ওপর তোলে সেই আকাশটাকে ধারণ করতে বা শূন্যতা মাপতে। তাতে গিরিগোবর্ধনতুল্য কোনো মায়া আসে না। কব্জির সঙ্গে হাতের তালুর সমকোণ, কাঁধের ওপর ঢেউয়ের চূড়ার মত পেশির উত্থান, বাঁ কাঁধ আর বাহু দিয়ে ঢেউ-ভাঙা বর্তুলতার স্রোত, পায়ের বাটির লোহার মত শক্ত পেশি, ডান পায়ের নম্র রমণীয়তা—এই সমস্তই সেই ধানখেতের ভেতরে, মধ্য রাত্রিতেও ধ্বংসস্তূপের ভেতরে কিন্নর বা দ্বারপালের ভগ্নমূর্তির শায়িত অপ্রাসঙ্গিকতার মত অসার্থক।

চাঁদনিতে নিজের সমস্ত বঙ্কিমতা হুড়মুড় করে ভেঙে ফেলে চ্যারকেটু আলের ওপর বসে পড়ে উবু হয়ে। সে যখন নিচু হয়ে ঘাড় ভেঙে খেতের নুইয়ে-পড়া ধানের গোছায় হাত দেয়, ধানের শিষ তার হাতে বেঁধে, কড়াপড়া আঙুলের চাপে পাকার আর-কতদিন দেরি বুঝে নিতে চায়—তখন তার হাঁটু দুটো চিবুক ছোঁয়, চিবুক প্রায় গলা ছোঁয়, পিঠের পেশি গোল হয়ে দুদিকে ছাড়িয়ে যায়, ধানগাছের ছায়া আলের ওপর পড়ে, সেই ছায়ায় চ্যারকেটু ঢেকে যায়। চ্যারকেটুর হাতের তেলোটা চাঁদের আলোয় চকচকে একটা

boiRboi.net

পাথরের মত—বুড়ো আঙুল বাদে সব কটি আঙুলের গোড়ায় আর তালুর মাথায় পোড়া তামাটে গোল কড়া, বুড়ো আঙুলের কড়াটা তলা থেকে ওপরে দ্বিতীয় করের ওপর। তিনটি ছাড়া কোনো কররেখাই নেই। এই তিনটি রেখার শুরু আর শেষের শিষ মুছে যাওয়ার মত—প্রতিদিন ব্যবহার-করা কাঁসার থালার ফুলকারি বর্ডার যেন। দু-চারটে ধান ছিঁড়ে চ্যারকেটু মুখে দেয়। মুখটা মিষ্টি তুষে আর কষে ভরে যায়। আরো শুকবে. আরো শুকবে। একটু নরম ভাঙরি দেখা দিলেও এই ধান সেদ্ধ করে ভাঙলে সেদ্ধ করার মত একমুঠো চাল পাওয়া যেত—কিন্তু তারও দেরি আছে।

ধানের গোছা ছেড়ে দিয়ে চ্যারকেটু দাঁড়ায়। এই ধানত্ চাইল নাই। এই জ্যোছ্নাত আইল নাই। এই প্যাটত ভাত নাই। চ্যারকেটু যেন সাধা রাজ্যপাট প্রত্যাখ্যান করে পিচের রাস্তায় উঠে আসে। আর তখনই সেই জ্যোৎস্না জুড়ে একটা হা—স্বা ডাক ওঠে। চ্যারকেটুর গরুটা টের পেয়ে গেছে চ্যারকেটু উঠোনেও নেই। এখন একটা ডাক ছেড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। চ্যারকেটু কতদূর থেকে এই ডাক শুনবে, এই ডাক শুনে গোয়ালে ফিরে যেতে তার কতটা সময় লাগবে এই সব হিশেব কষে গরুটা অপেক্ষা করবে। চ্যারকেটু তাড়াতাড়ি টিউবওয়েলের দিকে হাঁটা শুরু করে।

খানিকটা হেঁটে চ্যারকেটু টিউবওয়েলের কাছে পৌছয়। টিউবওয়েলটার হ্যাণ্ডেলে হাত দেয়, ঠাণ্ডা। তারপর হ্যাণ্ডেল ওঠানো-নামানো শুরু করে। ভেতরে কোনো যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে থাকবে—শুকনো ঢকাং-ঢক্, ঢকাং-ঢক শব্দে সারাটা রাত ভরে যায়। যেন, লোহার শিকভর্তি ট্রাক যাচ্ছে এই রাস্তা দিয়ে, বর্ডার আউটপোস্টে। দুই-একবার হ্যাণ্ডেল চালাতেই ঝরঝর জল পড়তে শুরু করে। তলার সিমেণ্ট-বাঁধানো জায়গায়, যেখানে জল পড়ে, সিমেণ্ট উঠে গিয়ে একটা গর্ত-মত হয়েছে। সেখানে সব সময়ই জল জমে থাকে। হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে চ্যারকেটু দুই আঁজলা ভরে জল নেয়। মুখে চোখে ঘাড়ে জল দেয়। তারপর পাশে উবু হয়ে বসে বাঁ হাতে হ্যাণ্ডেলটা ওঠায় নামায় আর ডান আঁজলা টিউবওয়েলের মুখে ধরে জল খায়। ঐ রকম বসে জল খেতে-খেতে হ্যাণ্ডেল খুব জোরে চালাতে পারে না বলে জলের ধারা খুব সরু হয়ে পড়ে। আঁজলা দিয়ে সেই জল গলায় নিয়ে ফেলতে চ্যারকেটুর গলায় আর ঠোঁটে চুকচুক চকচক শব্দ হয়। তখন হ্যাণ্ডেলের শব্দটা কম, চ্যারকেটুর ঠোঁটের আর গলার শব্দটাই বেশি। চ্যারকেটু উঠে ঘটাং-ঘট ঘটাং-ঘট আওয়াজ তুলে আবার হ্যাণ্ডেলটা চালায়। আর ডান

boiRboi.net

হাতের আঁজলা টিউবওয়েলের মুখে ধরে জল খায়। ঝরঝর জল পড়তে থাকে। সেই জলজ ও ধাতব আওয়াজে চারদিকের নৈঃশব্দ্য যেন আরো প্রখর হয়। তারপর হঠাৎ হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে চ্যারকেটু দুই আঁজলা পেতে ঘনঘন ঢোক গিলে জল খেতে থাকে। তখনও জলের শব্দই প্রবলতর। ধীরে-ধীরে জলের শব্দ কমে আসে আর সেই কমে আসার সঙ্গতি রেখে চ্যারকেটুর ঠোঁটের চুকচুক আর গলার চকচক শব্দটিই বড় হতে থাকে। জলের প্রবাহ একেবারে কমে এলে চ্যারকেটুর নিজেরই কানে তার জলপানের ধ্বনি আসে, যেন কোনো কুকুর জল খাচ্ছে বা বাছুর। সে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডেলটা চালিয়ে সেই ধাতব শব্দটা আবার তুলে কল থেকে মুখ সরায়। চ্যারকেটু সোজা দাঁড়ায়। টিউবওয়েলের মাথায় একটা হাত রাখতেই একটা ঢেকুর ওঠে। জল খেয়ে পেট ভরালেও প্রথমে সত্যি মনে হয় পেট ভরেছে। ভরা পেটে চ্যারকেটু এদিক-ওদিক চায়। এবার তাকে ফিরতে হবে। নইলে গরুটা আবার ডেকে উঠবে।

চ্যারকেটু আলে নেমে হাঁটা শুরু করে। আর ক-দিন পরই রাত-বিরেতে এ-রকম হাঁটলে এ-খেত ও-খেত থেকে আওয়াজ আসবে, 'কায় রে' 'কায় যায় রে।' কাতার ধান কাটার সময় এল। চ্যারকেটু বলে দিতে পারে, এখান থেকে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে, পাকা রাস্তা দিয়ে গৌরীহাট পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে, কোন খেতের কী অবস্থা। কিন্তু চ্যারকেটু দক্ষিণের জমিগুলির কোনো খবর রাখে না। জানেও না। চ্যারকেটুর যা দৈনিক কাজ তাতে তাকে ত আর দক্ষিণে যেতে হয় না। উত্তরের পাকে সবার আগত্ ধান পাকিবার পারে আশিন্দিরের খ্যাতত, কিন্তু আসিন্দির ধান খ্যাতত্ রাখিবে অঘান পর্যন্ত। স্যালায় গোলান্দিপাড়া ছাড়ি যেইলা যতীনের ঘর, উমরার উত্তরের জমির ধানটায় অং ধরিছে। আগত্ জমিটা খতখতি জোতদারদের আছিল্। এ্যালায় শহরের কুন্ অফিসের বাবু কেনা ধইচ্ছে। হবা পারে। কাতার আর-করিবার ধইচ্ছে প্রধান পাড়াত্ কয়েক বিঘা, উমরার ধানটাও আগত পাকিবে।—এতেই চ্যারকেটুর হিশেব শেষ হয়ে যায়। চ্যারকেটু থমকে দাঁড়ায় একবার, তারপর দক্ষিণ দিকে তাকায়, চাঁদেহিমে কিছু বোঝা যায় না বটে, সর্বত্রই পাকা ধানের খেত মনে হয় বটে, যে-কোনো সময় কাটা যায় এমন পাকা ধানের খেত, পাকা কাতার ধান, তবু আসলে সে দক্ষিণের কারো খেত চেনেই না। জানে না দক্ষিণের কারো খেতে কাতার ধান রোয়া হয়েছে কিনা। চ্যারকেটুর রোজকার যাতায়াত আর সংসার—মাত্র দুটো আল আর একটা টিউবওয়েল আর দুটো পিচ রাস্তা

boiRboi.net

আর একটা হাটে শেষ। চ্যারকেটুর মনে পড়ে যায় যে তার গরু আবার ডেকে উঠবে। তার আগেই গোয়ালে পৌছনোর জন্য গরু-হারানো রাখালের উদ্বেগ নিয়ে চ্যারকেটু এই চাঁদনিভরা খেত মাড়িয়ে, হিমভরা বাতাস সরিয়ে—যেন এ-সব আর-কারো গিরির, তার নয়—ছুট লাগায় তারই গোয়ালে—সেখানেও অবিশ্যি ইতিমধ্যেই একটা খুঁটি দড়িছাড়া।

চ্যারকেটুর সেই গোয়াল, পোস্টার আর ভামনির গোয়াল। ঝাঁপটা খুব আস্তে ঠেলে ভেতরের আবছায়ায় ঢোকে চ্যারকেটু। গরুটা লেজ তুলেই ছিল, চ্যারকেটু গায়ে হাত দিতেই ওর চামড়াটা শিউরে ওঠে, ও মুখটা ধীরে-ধীরে পাশে ফেরায়, আর লেজটার ডাগর পুচ্ছটুকু চ্যারকেটুর হাতে বুলিয়ে দেয়।

ঝাঁপটা ঠেলে ঢোকা, বন্ধ করা গরুটার পেছনে হাত রাখা, গরুর গা শিউরনো, লেজ বোলানো, চ্যারকেটুর মাচানে-ওঠা আর শুয়ে-পড়া সংক্ষিপ্ততম সময়ে ঘটে যায়—সত্য যেমন সহজ ও সংক্ষিপ্ত। ঘুমিয়ে পড়তে চ্যারকেটুকে মাত্র শুয়ে পড়তেই হয়। পেটভর্তি জল নিয়ে চ্যারকেটু যখন ঘুমে হাঁ করে পেটভর্তি বাতাস নিচ্ছিল, গরুটা পোয়াল-ভর্তি মুখটা মাচানের ওপর এমন বাড়ায় যে তার মুখ থেকে পোয়ালগুলো চ্যারকেটুর মুখের ওপর পড়ে যায়। মুখটা সরাবার সময় গরুটা ফোঁস করে এমন একটি দীর্ঘশ্বাসও ফেলে যে তাতে চ্যারকেটুর মুখের ওপর থেকে পোয়ালগুলো সরে যায়। কিছু লেগেও থাকে—যেন ঝুরঝুরে বেড়ার ফাঁক দিয়ে চ্যারকেটুর মুখে জ্যোৎস্নার আঁকিবুঁকি।

গোয়ালের বেড়ার প্রায় সম্পূর্ণ আকাশ জুড়েই অবশ্য আলহীন জ্যোৎস্নায় ধানখেত পাকবার অপেক্ষায় মালিকানাহীন পড়ে ছিল, অলৌকিক-ই।

boiRboi.net

২

ভাত খাওয়ার পরের দ্বিতীয় রাত পুইয়ে, কার্তিকের হিমে ভেজা আদিগন্ত নুইয়ে-পড়া পাকা ধানখেতের ওপর দ্বিতীয়বার সূর্য ওঠে। দিগন্ত, আকাশ, টলটলে নীল আকাশ, ধানখেত, টসটসে পাকা ধানখেত, আর একটু ওম-ধরানো কার্তিকের কুয়াশাভেদী সূর্য—এ-সবই পুরনো।

ধানগুলো পেকে এমন টসটসে যে-কোনো মুহূর্তে কাটা শুরু হতে পারে। কখনো-সখনো এক-আধ পেট ভাত খেয়ে না-খেয়ে, ভাতের ফেন জমিয়ে রেখে সারাদিন ধরে খেয়ে, বা মাঠঘাট থেকে কচু তুলে এনে-এনে সিদ্ধ করে খেয়ে, গেল-বছরের ধানের পুরনো খিদেটাকে সামলে সুমলে এখন নতুন বছরের নতুন ধানকাটার সেই মুহূর্তটি গোনা হচ্ছে।

খেতখেতুর আধির খেতে ধানের শিষ দেখা গেছে—শেষবার ভাত খাওয়ার আগের দিন, শনিবার। আজ এখন মঙ্গলবার সকাল। আজ রাত পোহালে, যদি পোহায়, চার রাত যাবে। আরো অন্তত চার-পাঁচ রাত। ধানে দুধ আসার পর চার-পাঁচ দিন অন্তত টলটলে জলের মত থাকে। পরের পাঁচ দিন ধরে শক্ত হয়ে চাল হয়। তার পরের দশ দিনের ভেতর ঝাড়াই-মাড়াই করে ফেলতে হয়। 'শিষ দেখিলে বিশ দিন, কাটে মারে দশ দিন।' শিষ দেখার পর বিশ দিন দূরের কথা, কোনো-রকমে আট-দশ দিন কাটলে সামনের সোম-মঙ্গলবার নাগাদ হয়ত খেতখেতু এক মুঠো ধান কেটে আনতে পারবে। তারপর সামগাইনে ভেঙে ভেজা-ভেজা নরম নতুন চাল গরম জলে ফেলে ভাতের কাই বা ফেন রাঁধা যাবে।

এখন, খেতখেতু দাওয়ার ওপর বসে। তার পেছনে ঘরের ঝাঁপের পাশে আট বছরের বৈশাখু, ছয় বছরের বেঙ্গু আর চার বছরের খেতেশ্বরী। ওদের গায়ের ন্যাংটো চামড়ায়, চোখমুখে, সূর্যের আলো আর ঘরের ভেতরের অন্ধকার মিলেমিশে যাওয়ায়, উজ্জ্বলতা বা আচ্ছন্নতার নানারকম টুকরোটাকরা তৈরি হয়। খেতখেতুর ভাতিজা ভরজোয়ান চ্যারকেটু গরুটা আর বাছুরটা গোহালিয়া থেকে বের করে পেছনে নিয়ে বেঁধে, টোপায় কিছু খড় ফেলে দিয়ে এসে, কোণটায়

BanglaBook.net

গোহালিয়ার চাল ধরে দাঁড়ায়। একটুমাত্র নেংটি-পরা তার প্রমাণ-সাইজের জোয়ান শরীরে এখন আর-কোনো ব্যস্ততা নেই। একটা ময়লা শাড়ি দুই ভাঁজে লুঙির মত করে বুকের ওপর থেকে পায়ের বাটি পর্যন্ত পরা 'ফোতা'য় খেতখেতুর বউ টুলটুলির উঠোনটা ঝাড় দেয়ার একটা কাজ জোটে, শক্ত উঠোনে ঝাঁটার খড়খড় শব্দ ওঠে। টুলটুলি উঠোনে জলের ছিটেও দেয়। সেই রোদে কার্তিক মাসের শক্ত মাটির খটখটে উঠোন তকতক করতে থাকে। সারা উঠোনে জলের ছিটেতে মনে হয় ব্রতের আলপনা আঁকা বা এখুনি ধান শুকোতে দেয়া হবে।

এই দিগন্ত, আকাশ, টলটলে নীল আকাশ, একটু ওম-ধরানো কার্তিকের কুয়াশাভেদী সূর্য, আর খেতখেতু-টুলটুলি-চ্যারকেটু আর তিনটি ছাওয়া-ছোটর পেটের তিনদিনের বাসি খিদে আর আগামী দিন-সাতেকের আগুরি খিদেটা পুরনো। যতদূর চোখ যায় ততদূর, হিমের ভারে নুইয়ে পড়া টসটসে পাকা ধানটা নতুন। এই নতুন বছরের নতুন ধানের আদিগন্ত বিস্তারে এরা এদের বাসি পুরনো খিদে নিয়ে বসে থাকে।

টুলটুলি ঘরের ভেতর গিয়ে তোবড়ানো একটা এ্যালুমিনিয়ামের গেলাশ বৈশাখুর মুখে ধরে। বৈশাখু গেলাশটা কাড়তে চায়। কিন্তু টুলটুলি বাঁ হাতে বৈশাখুর মাথাটা ধরে রাখে আর ডান হাতে গেলাশটা বৈশাখুর ঠোঁটে চেপে ধরে। তারপরও অবশ্যি ছোট্ট হাত দুটিতে চেপে ধরার মত জায়গা গেলাসের গায়ে থাকে, শুধু এইটুকুটুকু আঙুলের ডগা উবচে এসে পড়ে তার মায়ের হাতের ওপর। কুটকুটে ময়লা, তোবড়ানো এ্যালুমিনিয়ামের কাল গেলাশ আর শির-ওঠা কোঁচকানো চামড়ার একটা মরা হাতের সঙ্গে, বাচ্চার দুটো পাঞ্জার ময়লা মসৃণতা মিশে যায় না—একটা তুলনা এসে যায়। বৈশাখু ঠোঁটটা দিয়ে খুব চেপে গেলাশটা ধরে, এক-একটা ঢোকের সঙ্গে তার মাথাটা পেছনে হেলে, বৈশাখুর গলায় ঢকঢক শব্দ হয়। টুলটুলির যেন মাপা আছে তিন বাচ্চার প্রত্যেকের জন্য কয় ঢোক করে গেলাশটাতে আছে। বৈশাখুর ঠোঁট থেকে টুলটুলি গেলাশটা নামাতে গেলে বৈশাখু ঠোঁটটা আরো ভেতরে ঢুকিয়ে দু-হাত দিয়ে গেলাশটাতে টান দিলে টুলটুলি বৈশাখুর মাথাটা টেনে সরিয়ে গেলাশটা নামিয়ে নেয়। বৈশাখু ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে ফেলে। টুলটুলিও হেসে, বেঙ্গুর মাথায় হাত দিয়ে, গেলাশটা তার ঠোঁটে চেপে ধরে। ঝাঁপের আড়ালের অস্পষ্টতা থেকে উদ্ভাসিত মুখে বৈশাখু উঠোনের রোদ্দুরে নেমে আসে, তার ওপরের ঠোঁটের ওপরে সূক্ষ্ম রেখায়

boiRboi.me

ফেনের দাগ, যেমন দুধের। বেঙ্গুও লাফ দিয়ে মাটিতে নামে। একমাত্র খেতেশ্বরীই সুযোগ পায় ঝাঁপের ফাঁকটুকু ভরে দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর অতটা অবকাশ রেখে, শুধুমাত্র নিজের দুই হাতে পুরো গেলাশটা ধরে, ধীরে-ধীরে চুকচুক করে খাওয়ার। গেলাশটায় তার মুখ সম্পূর্ণ ঢেকে যায়, শুধু দু চোখের কোনাটুকু বেরিয়ে থাকে। চোখের মণি সেই কোনায় নেই। চোখের সবটুকু দিয়ে খেতেশ্বরী গেলাশটার গভীরতার অতলতা মাপে—গেলাশটার কত গভীরে ভাতের ফেন। সোনারঙা ধানখেতের হলুদ, নির্মল জলজলে হলুদ, আর কার্তিকের হিমেধোয়া নীল আকাশ, এই সংসারকে ঘিরে তৃপ্তিময় অবকাশের পরিপ্রেক্ষিতে যেন রচনা করে দেয়। বিশেষত, প্রাকৃতিক নীল-হলুদে, শিশু আর পুরুষের নগ্নতায়, একটিমাত্র রমণীর নগ্নতা ঢাকার সরলতম ভঙ্গিতে প্রকৃতি আর মানুষে এক সমন্বয়ই যেন ঘটে যায়।

টুলটুলির গোহাল ঘরের পাশ থেকে একটা চুবড়ি তুলে কাঁখে নিয়ে, চুবড়িটাকে বেড় দিয়ে ধরে গোহাল ঘরের পাশ দিয়ে ধানখেতের ভেতর টুক করে নেমে পড়ে, ধানখেতে তার মাথাটা দু-একবার ভাসে, তার পর ডুবে যায়। বৈশাখু আর বেঙ্গু দুই হাত তুলে দৌড়ে-দৌড়ে টুলটুলির পেছনে-পেছনে ছোটে। গেলাশটা মুখে রেখেই খেতেশ্বরী চোখটা ঘুরিয়ে একবার দেখে, তারপর চোখদুটো আবার গেলাশের ভেতর নিয়ে যায়। দুই বা তিন ঢোক খেলে যে-ফেন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, চুকচুক করে সেই ফেন খেতেশ্বরী দীর্ঘতম সময় জুড়ে শেষ করে। তারপর গেলাশের গায়ে লেগে-থাকা ফেন আর জল চেটে-চেটে খায়। একসময় জলও আর লেগে থাকে না, খেতেশ্বরীর জিভের জলে গেলাশের ভেতরটা জলজলে হয়ে থাকে। সেটাই খেতেশ্বরী চেটে যাবে, গেলাশটা নামালেই খাওয়া শেষ হয়ে যাবে—এই ভয়ে। গেলাশটা ঠোঁঠে নিয়ে, কাত করে, গেলাসের কানাটা নাকের ডগায় লাগিয়ে গেলাশের ভেতরের আধো অন্ধকারে চোখদুটো ফেলে, খেতেশ্বরী ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। যতক্ষণ-না সে খাচ্ছে, খেয়েই যাচ্ছে, এই ঘটনাটা থেকেও প্রবলতর হয়ে ওঠে তার খিদে। তার চোয়ালের হাড় সামান্য নড়ে, চোখের পাশের শিরাটা দবদব করে, যত বেলা যায় তত বেশি দবদব করে, কপালে বিনবিন ঘাম জমে, টলটল করে, ভেঙে গড়িয়ে যায়, ঐটুকু ছোট্ট কপাল জুড়ে ঘামের রেখায়-রেখায় কত রকমের নকশা তৈরি হয়, ভেঙে যায়। কান পাতলে গেলাশের সঙ্গে দাঁতের ঘষার কুরকুর আর জিভের চুকচুক শব্দ শোনা যায়, গভীর রাতে শেয়ালের হাড় চিবুনোর শব্দের মত।

boiRboi.net

চ্যারকেটু গোহালের কোণ ছেড়ে ভেতর ঢোকে। কুটকুটে ময়লা একটা গামছা-মত কোমরের নেংটি ঘিরে বাঁধতে বাঁধতে, কাঁচিদাওটা পেটের গিঁঠের ভেতর ঢুকিয়ে, কোদালটা পিঠের ওপর ঝুলিয়ে, বেরিয়ে যেতে-যেতে চ্যারকেটু বলে, 'মুই যাছ।' খেতখেতুর ঘরের পাশ দিয়ে চ্যারকেটু ধানখেতে নেমে যায়, যাওয়ার সময় তার পায়ের হাড় ফোটে। দাওয়াটা পেরিয়ে ঘরটার পেছনে ধানখেতের ভেতরে ঢুকে যায়। শহরের আগে কোথাও কাজ জোটার আশা নেই আর শহরে সকাল-সকাল পৌঁছতে না-পারলে কাজ মিলবে না। খেতখেতু হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, তারপর ঘরটার বেড়া ধরে সন্তোষ ঘোষের খেত বরাবর চ্যারকেটুকে দেখে। চিৎকার করে চ্যারকেটুকে ডাকতে গিয়ে খেতখেতু বোঝে তার ঠোঁটের নীচে থুতু জমে আছে। খানিকটা থুতু ফেলে আর খানিকটা গিলে 'হে-এ-এ-এ, চ্যা-র-কে-টু' বলে একটা ডাক দিতে খেতখেতু হাঁপিয়ে ওঠে। কিন্তু আরো একটা ডাক তাকে দিতেই হয়, হাঁপানো লম্বা আরো একটা ডাক যেটা একমাত্র এই কারণেই চ্যারকেটুকে শুনতে হয় যে তৃতীয় একটা ডাক ডাকবার ক্ষমতা খেতখেতুর নেই। ধানখেত থেকে চ্যারকেটু ফেরা শুরু করে অথচ খেতখেতু ফিরে আর তার পুরনো জায়গায় আসে না, বেড়া ধরে দাঁড়িয়েই থাকে। চ্যারকেটু এলে বলে, 'তুই গরুটা নিয়া যা কেনে।' দাঁড়িয়ে শুনে চ্যারকেটু গোহাল ঘরের পেছন দিকে পা চালায়। সে আড়াল হয়ে যাবার আগে খেতখেতু বলে, 'সদরত্ কায়ও কিনিবার চাহে, ত, বেচি দিস।' চ্যারকেটু গোহাল ঘরের আড়ালে চলে গেলে ফাঁকা উঠোনে খেতখেতু বলে, 'আড়াইশ চাবু।' খোঁটা থেকে দড়িটা খুলে টান দিলেও টোপার ভেতর গরুটা মুখ ঢুকিয়ে দেয়। চ্যারকেটু একটা হ্যাঁচকা টান দিলে গরুটা পেছন-পেছন আসে আর হঠাৎ গলাটা বাড়িয়ে পেছনে চ্যারকেটুর কোমরের ওপর এমন একটা জোরে নিশ্বাস ফেলে যে শিরশির করে। 'কাকার গরু কাকা বেচাসে। তিনমাস চারিমাস পর ত চাষ দিবার নাগিবে, সেলায় গরু কুন্ঠে মিলিবে'—গরুটা নিয়ে চ্যারকেটু উঠোনে আসে। দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গোহাল ঘরের পেছন থেকে লাঙলটা কাঁধে তুলে নিয়ে আসে। গরু নিয়েই যখন যাচ্ছে, লাঙলটাও কাঁধে থাক, 'এ্যালায় ত বাবুর ঘর তরকারির বাগান করিবার ধরে, কায়ও চাষ দিবার কহিবার পারে।' লাঙল কাঁধে উঠোনে এসে চ্যারকেটু আবার গরুর দড়ি ধরে। 'সদরত বেচাবার না পারিস তো, গৌরীহাটত্ বেচাবু, আজি মঙ্গলবার।' খেতখেতুর কথা শুনতে-শুনতে চ্যারকেটু গরুটাকে পিঠে চড় মেরে এগিয়ে দেয়, আর তাতে গরুটার পাছার দুদিকের পেশি চিড়িক-

boiRboi.net

চিড়িক করে, খুব দ্রুত চিড়িক-চিড়িক। 'আড়াইশ চাবু'—শুনে গরুটাকে আর একটা ধাক্কা দিয়ে চ্যারকেটু বলে, 'আড়াই না দিবা চাহিলে? গরুটা দাঁড়িয়ে পড়ে। এখন বেড়ার গায় হাতের ভর রেখে খেতখেতু। ডানপাশে গরুটা। ওপাশে চ্যারকেটু। গরুটা খেতখেতুর বিপরীত দিকে ঘাড়টা ঘুরিয়ে রাখে, ওদিকে শুধুই ধানখেত, কাঁচা রাস্তা, আবার ধানখেত, পাকা রাস্তা। বটতলি। 'বেচাবু না। ঘুরত্ আনিবি।' মুহূর্ত-কয়েকের জন্য তিনদিনের বাসি খিদেটাও মিথ্যা ঠেকে। চ্যারকেটু গরুটার পিঠে হাত রাখে। ধাক্কা না-দিতেই গলাটা সোজা করে পায়ে-পায়ে এগিয়ে যায়। উঠোনটা পেরিয়ে ধানখেতে ঢুকতেই খেতখেতু বলে, 'সোয়া দুইশ-র কমে বেচাবু না।' কথাটা শেষ শোনার জন্য চ্যারকেটু আর গরুটা দাঁড়ায়, ঘাড় ঘোরায়। খেতখেতুর কথাটা শেষ হলে গরুটাই আগে ঘাড়টা সোজা করে। তারপর ঠিক বোঝা যায় না, কে আগে পা ফেলে—গরুটা না চ্যারকেটু। ঘরের বেড়া ধরে দাঁড়িয়ে খেতখেতুকে দেখতে হয়, আগে-আগে গরুটা পেছনে-পেছনে চ্যারকেটু যাচ্ছে। তারপর বলে, ওরা বেশি দূর যায় নি, তাই চেঁচাতে হয় না, কথা বললেই চলে, 'হে-এ চ্যারকেটু, আতিত্ (রাতে) ফিরিবার তানে চাউল আনবু, চা-উ-ল।' ধানখেতগুলোর ওপর দিয়ে 'চাউল' 'চাউল' শব্দটা খুব সঙ্গত ঠেকে। ধানগাছগুলো পাকা হলদেটে বলে, পাতলা ফুরফুরে বলে, বাতাসে দোলে বলে খুব প্রাসঙ্গিকও ঠেকে। বাপের গলায় 'চাউল' 'চাউল' শুনে খেতেশ্বরী মুখ থেকে গেলাশটা নামিয়ে ফেলে সহসা, আর সারা মুখ মেলে গরুসহ চ্যারকেটুকে যেতে দেখে। 'এত বড়-বড় পাকা ধানের খেতের ভিতর ভিতর চ্যারকেটু দাদা হামার যাছে চাইল আনিবার তানে।' গরুটা সহ চ্যারকেটু খেতের আলে-আলে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ হয়ে না-গেলে চাল নিয়ে তার ফিরে আসাটা যেন সত্যি হয়ে উঠবে না। তাই যখন ধানখেতের ভেতর গরু নিয়ে চ্যারকেটুকে আর দেখা যায় না, তখন, একমাত্র তখনই, সেই বাধাহীন ধানখেতের ভেতর দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় চাল নিয়ে চ্যারকেটুর ফেরাটা খুব বাস্তব হয়ে উঠতে পারে খেতেশ্বরীর কাছে। খেতেশ্বরী গেলাশটা মুখে দেয়, দুই হাতে গেলাশটা ধরে থাকে, জিভ দিয়ে গেলাশটার ভেতর চাটতে থাকে, তারপর মাটির ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়ে।

খেতখেতুও তাকিয়ে ছিল। ধানখেতের আড়ালে-আড়ালে গরুটা নিয়ে চ্যারকেটু চলে গেলে যখন আর তাদের দেখা যায় না তখনও ঐ ধানখেতের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে খেতখেতুর চোখে ভিরমি লাগে। ধানখেত এমন অপরিবর্তিত থেকে যায় যেন গরু আর চ্যারকেটু এই ধানখেতের ভেতর দিয়ে

boiRboi.net

কোনোদিনই যায় নি, রোদ বা নদীর জলের মত মানুষনিরপেক্ষ এই ধানখেত, যেন, মানুষ ডুবে গেলে বা না-খেয়ে থাকলেও, রয়ে যায়, বয়ে যায়। 'শালা দিন নাই, আতি (রাত) নাই, অষ্ট প্রহর অষ্ট দিকত এই এক ঝিকিমিকি ধান আর ধান। আগুন দিবার নাগে শালা সারা খেততে, আগুন দিবার নাগে।' —রাগের মাথায় খেতখেতু ঘরের বেড়াটা ধরেই ফিরবার জন্য ঘুরে যায়। আর তখন চোখে পড়ে গেলাশের ভেতর খেতেশ্বরীর মুখ। খেতখেতুর ইচ্ছে হয় এক লাথি মেরে মেয়েটার পেটের থলি ফাটিয়ে দেয়, 'শালা দিনরাত এক গেলাশ চুষিবার ধরোছে।' পর-পর দুইবার রেগে উঠতে পেরে খেতখেতু বেশ খুশিই হয়। তাহলে এখনো 'ভোক্‌টা (খিদে) তার শরীলের তামান আগ (রাগ)-তাপ শুখাই দিবার পারে নাই।' দুর্বল শরীরে টলেটলে হেঁটে সে গোহাল ঘরটার কাছে চলে যায়। আর ফেরে না। 'বৈশাখু আর বেঙ্গুক নিগাছে টুলটুলি কোন্ পাকে কায় জানে। গরুটাক নিয়া চ্যারকেটু চলি গেইল সদরত্। এ্যালায় মুই যাম অঞ্চল অফিসত্ একটা ফিরি এশনের (ফ্রি-রেশনের) তানে। সারাদিন এইঠে বসি না থাকি, অঞ্চল অফিসত্ বসি থাকিবু। বসি থাকিবু আর সেক্রেটারি বাবুক কহিম, হে-এ বাবু, হামারালা তিন দিন কিছু খাও নাই। হে-এ বাবু, হামার ভোকের বয়স হইল তিন দিন। আজি থিকা সাতদিন-দশদিনের বাদ আগুরি-পাক কাতার কাটিবার পারিম। ভোখটা ঐ টাইমত মিটিবার পারে। সেলায় ভোকের বয়স হইবে, ধর কেনে, বারো কি চোদ্দ দিন। এ্যালায় হামাক একটা ফিরি এশন (ফ্রি-রেশন) দাও বাবু।' গোহাল ঘরের পাশ দিয়ে টলেটলে খেতখেতু ধানখেতে ঢুকে যায়। কয়েক পা যেতেই চিহ্নহীন তার ওপর দিয়ে ধানখেত তরঙ্গহীন বয়ে যায়।

গেলাশের ভেতর মুখ রেখেই খেতেশ্বরী কিছু অনুমান করে। হয়ত তার পায়ের তলায় কার্তিকের শুকনো খটখটা উঠোনে কোথাও আর-কারো পদকম্পনের সাড়া আসে না। হয়ত ঝিরঝিরে বাতাস বা ঝিকমিক রোদের তাপে সে বোঝে, সে একা। গেলাশের ভেতর মুখটা রেখে চোখটা সে কোনায় আনে— 'বাবা দাওয়ায় নাই রো।' নিজের ডানপাশে তাকায়, গেলাশটা মুখে নিয়েই— 'বাবা নাই রো।' গোহাল ঘর খোলা। খেতেশ্বরী মুখে গেলাশটা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়, উঠোনের মাঝখানে আসে। শোয়ার ঘরের ঝাঁপ খোলা। 'বাড়িটা ডং ডং হয়া আছে। ঘরলা ভকর-ভাউন।' গেলাশটায় তখনো চুকচুক শব্দ হতে থাকে। মাথাটা আর-একবার চারপাশে ঘোরাতে গিয়ে গেলাশের কানা থেকে তার ঠোঁটটা পিছলে যায়, আর সে খানিকটা বাতাস খায়। পরক্ষণে

গেলাশটা আবার ঠোঁটে চেপে ধরে। দুধ খাওয়ার সময়ের অস্থির ছাগশিশুর ফুৎকার উঠে। গেলাশটা ঠোঁটে নিয়ে খেতেশ্বরী হেঁটে উঠোনের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ায়, তারপর দিগন্তের দিকে তাকায়। এই ঘরের কোনো পড়শি নেই। কার্তিক মাসের পাকাধানের খেতে কোনো মানুষ নেই। দিগন্ত পর্যন্ত পাকাধানের খেত, স্থির, প্রায় অনড়, যেন কঠিনই, মাঝেমাঝে লাঠির আগায় হাঁড়িকালো নজরকাঁটা। দিগন্তের বাতাস এই বাড়ির ওপর দিয়ে আর-এক দিগন্তে চলে গেলে আদিগন্ত ধানখেত হিল্লোলিত হয়, খেতেশ্বরীর পনে-দুই হাতি ন্যাংটো শরীরটা চারপাশে দিগন্ত আর ধানখেতের পরিপ্রেক্ষিত পেয়ে গেলে, ধানবন্দী খেতেশ্বরীর হাত থেকে গেলাসটা মাটিতে পড়ে। খেতেশ্বরীর মগ্ন মুখটা কান্নায় ভেঙে-ভেঙে যায়। কেঁদে, পাখির মত স্বরে খেতেশ্বরী ডেকে ওঠে—'বাপা হে।'

কার্তিক-মাসে পাখিরা পাকা ধান খেতে এসে নানা ডাক ডাকে।

boiRboi.net

৩

পাকাধানে কার্তিকের মাঠ এত জনহীন আর সারারাতের হিমের ভারে ধানগাছের সারি এত নোয়ানো আর রোদ যেন খানিকটা মিয়নো—সকাল বয়ে গেলেও মনে হয় না সকাল হয়েছে। এরই মধ্যে বাতাস বয় বলে ধানখেতব্যাপী দিগন্ত থেকে দিগন্ত হিল্লোলিত হয়ে যেতে থাকে—নইলে এত নির্জনতাকে প্রাণহীন মনে হত। হিল্লোলিত নির্জনতা এই সকালে অবশ্য আধিভৌতিক হয়ে যায়, এত দিগ্‌দিগব্যাপী ধানখেত কিন্তু কোনো জনমনিষ্যি নেই, এমন-কি আকাশে যেন পাখিও নেই।

আসলে কার্তিকের আকাশ এত ছড়িয়ে এত ওপরে উঠে যায় যে পাখপাখালি সেটা ভরিয়ে তুলতে পারে না। আকাশের একেবারে ভেতরে, মাঝখানে এরোপ্লেনের মত, চিল খুব ধীরে পাক দিয়ে-দিয়ে ঘোরে, আর ধানখেতের ঠিক ওপরের আকাশটুকুতে ছোট-ছোট পাখির একটু-আধটু ওড়াউড়ি, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে বসতে—যেন মনে হয়, সে পাখিগুলো আকাশে উড়ছে না, দিক থেকে দিগন্তে এই পাকা ধানের বহ্‌তা স্রোত থেকে উছলে উঠছে। আসলে, কার্তিকের এই পাকাধানের আকাশে পাখি থাকে না, পাখি এখন ধানখেতের ভেতরে চলে যায়, সেখানে শিষ থেকে ঝরা ধান মাঠ থেকে খুঁটে-খুঁটে খায়। আবার কখনও-কখনও পাকা ধানের গোছার ভারে নুয়ে পড়া শিষ থেকে ধান ঝরিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। তাই কার্তিকের আকাশ যেমন হালকা রোদে ভেসে-ভেসে ক্রমেই ওপরে উঠে যায়, তেমনি আবার পাকাধানি আদিগন্ত থইথই স্রোতের টানে টুপটাপ তলিয়ে যায়। কখনও এমনও ঠেকে যেন বহু ওপরের আকাশ আর ধানখেতের মাটি এই সব মিলিয়ে খুব গভীর কোনো স্রোতের আবর্তন চলছে—বিশেষত ধানখেতের একদিক থেকে বওয়া বাতাস, আকাশ যেখানে ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে সেখানে গিয়ে ঠেকার আগে যখন থামতে পারে না। কিন্তু অতদূর ত আর চোখ যায় না, তার আগেই চোখের দৃষ্টি পাকা ধানখেতের হিল্লোল আর আকাশ আর পাতলা রোদের ভেতর হারিয়ে যায়, মনে হয় সেখানেই বুঝি আকাশ এসে মাটিতে

boiRboi.net

ঠেকেছে। এখন কার্তিকে, এই পাকা ধানের খেতের ওপর দিয়ে তাকালেই চোখের সামনে আকাশ নেমে আসে।

আবার, মাটির দিকে চোখ নামিয়ে, কোনো দিকে না-তাকিয়ে চললেও ধীরে ধীরে কানে এসে বাজতে থাকে ধানখেতের ভেতরের পাখপাখালি পোকা মাকড়ের ধ্বনি। কোনো পোকা ধানখেতের গভীর দিয়ে শব্দহীন উড়ে গেলে তার পাখার ফরফর ধ্বনি ওঠে। কোনো পোকা ধানখেতের গা বেয়ে ওপরে উঠলে সেই পোকার ভারে শিষ নুয়ে আর-একটা শিষের গায়ে সরসর শব্দ তোলে। খেতের ভেতরে পড়ে যায়। ধান খুঁটবার খুটখুট ধ্বনি অবিরল উঠে আসে। গর্তের ভেতর থেকে ক্ষীণ ধারায় জল বেরিয়ে আসার ধ্বনি নিরন্তর বয়ে যায়—মনে হয়, ধানগাছের মতই এ-শব্দ যেন বেড়ে উঠেছে, কখনোই থামবে না। খুব কাছে, পায়ের তলায়, প্রায় চাপা ধমকের গুপ্ গুপ্ স্বর ওঠে। ভেতরে-ফেতরে ধানখেতের একটা অংশে আলোড়ন এনে অকস্মাৎ হুটোপুটি খেয়ে যায় এক ঝাঁক পাখি। থুপ থুপ থুপ শব্দে মাটি খোঁড়া হয়ে যেতে থাকে। সম্পূর্ণ উদাসীন দীর্ঘতর একটি শিষ গমক তুলে শেষ হয়েই আবার গভীর খাদ থেকে দীর্ঘতর উঠে আসতে থাকে, সরল—কোথা থেকে যে সুরটা উঠছে চিহ্নিত করা যায় না, সুরের দীর্ঘতার এমনই খরগতি। আকাশের নীল উৎখাত করে সবুজ শরীরে ঝেঁপে আসে একঝাঁক টিয়ে—ক্ষুধার্ত টি-টি-টি রিনরিন করে বাতাস কাঁপিয়ে আকাশ থেকে ধানখেতের ভেতরে বয়ে যায়। চিলের আওয়াজ চি-র-রো-অ আকাশ থেকে সোজা সেঁদিয়ে যায় ধানখেতের ভেতরে—ধানখেতের গভীরতা মাপতে। এই সব তরল, তীক্ষ্ণ বা হ্রস্ব শব্দের সঙ্গে কোনক্রমেই মেলে না—কোথাও কাঠঠোকরার মত স্পন্দনহীন কঠিন শব্দ, অথচ ধানখেতটা যেন গাছহীন-ই। কোনো দিকে না-তাকিয়ে শুধু শব্দগুলো শুনে গেলে প্রথমে এই বিচ্ছিন্ন শব্দগুলো আলাদা-আলাদা শোনা যায়, তারপর ধীরে-ধীরে আরো অনেক সূক্ষ্ম শব্দ শোনা যায়, তারপর কোথায় কোন শব্দের শুরু আর কোথায় শেষ তা ধীরে-ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে, তারপর এক সময় এই অসংলগ্ন ধ্বনি একটা প্রবাহের চেহারা নেয়। অথচ ধ্বনিগুলোর ভেতর স্বরের, স্তরের বা প্রক্ষেপের কোনো সাম্য নেই। তারপর সেই বিচ্ছিন্ন ধ্বনিগুলো একটা প্রবল কোলাহল হয়ে ওঠে, এত প্রবল আর এত কোলাহল যে মনে হয় অজ্ঞাতে কোনো পাতালে নেমে যাওয়া হচ্ছে—তখন চমকে চোখ তুলে আকাশ দিগন্ত আর ধানখেতের দিকে চাওয়ামাত্র সমস্ত শব্দহীন হয়ে যায়—স্বপ্ন ভেঙে গেলে যেমন মধ্যরাত্রির স্তব্ধ নির্জনতা। এখন কার্তিকে, এই পাকা ধানের

boiRboi.net

খেতের ভেতর কান পাতলে, অধস্তন কোলাহল থেকে উপরিতন স্তব্ধতায় বারবার জাগরণ ঘটে যায়।

ওপরের আকাশ আর মাটির ভেতরের এই কোলাহলের ওতপ্রোত বাতাস নিরন্তর বয়ে যায়। কখনও শব্দ সরসর ওঠে কি ওঠে না, কখনও ঝরঝর ঝরে যেতে থাকে, কখনও দূরের খেতের কোথাও শব্দহীন আলোড়ন ওঠে—আর বাতাস অলৌকিক বয়ে যায়। সকালের বাতাস গায়ে লাগে কি না-লাগে, ফুরফুর ফুরফুর করে আকাশ দিয়ে বয়ে যায়, এত হালকা যেন মাটিতে নামতে পারে না। কখনও-কখনও মুখে চোখে লাগে, তখন শরীরে রোমাঞ্চ হয়, নাকে পূজার ভোগের সুগন্ধ আসে। এ-বাতাস দেবতার অঙ্গের বাতাস। 'দেও-বাও'। রাত শেষ হওয়ার সময় কার্তিকের এই পাকা ধানের মাঠে পরীরা নেমে আসে। আকাশ থেকে পরী নেমে এলে, সেই নামার বেগে তাদের শরীরের দুপাশ দিয়ে বাতাস উঠে যায়। সেই বাতাস আবার ফিরে আসে। পাকা ধানের খেতময় পরীরা নেচে বেড়ায়, তাদের পা মাটিতে পড়ে না, পাকা ধানের গোছায় গোছায় পা ফেলে খেতময় দিকময় নেচে ফেরে। কার্তিকের পাকা ধানের খেতে এমনিই ত যেখানে-সেখানে আকাশ নেমে আসে। তার ওপর শেষ রাতের হিমে কুয়াশায়-আকাশ-মাটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাই শেষ রাতের আচ্ছন্নতা ছাড়া পরী নামে না। সকালে ধানখেতের ভেতরে গেলে দেখা যায় পরীর পায়ের দোলায় মাটির ওপরে ধান ঝরে আছে—ভাল করে দেখলে সেই ঝরা ধানে পরীর পায়ের ছাপ-ও যেন দেখা যায়। পরীরা প্রথমেই খেতে নামে না। এই আকাশজোড়া ধানখেতের পাশে-পাশে কোথাও-কোথাও ছড়ানো-ছিটানো যে-সব গাছ আছে, বেশির ভাগই জমির সীমানা দেগে গাড়া, সেই গাছগুলোতে এসে দাঁড়ায়, তারপর সেই গাছ থেকে খেতে নামে নাচতে-নাচতে, নেমে নেচে যায়, বাতাসের মত। তাই শেষ রাতে কখনও জমিতে যেতে নেই। আর খুব সকালে সূর্য ওঠার ঠিক আগে-আগে খেতে গেলে পরীদের গায়ের গন্ধ বাতাসে পাওয়া যায়। যে-বাতাসের ভেতর প্রজাপতির মত পরীরা উড়ে বেড়িয়েছে, সূর্যের আলোতে আকাশ লাল হয়ে ওঠার আগেই, পরীরা মিলিয়ে যায়, কিন্তু সেই বাতাসটা থেকে যায়। পরীর গায়ের সঙ্গে লেগে ছিল যে-বাতাস, পরী চলে যাবার পর সে-বাতাস কেমন বিধবার মত উদাসীন হয়ে পড়ে—একবার নদীর পাড়ের বালুবাড়িতে ঘুরে আসে খানিকটা বালু চমকে উঠে আবার পড়ে যায়। বাতাস আবার নদীর বুকের ভেতর পাক দিয়ে আসে, নদীর মাঝখানের ঐটুকু জল হঠাৎ চমকে উঠে আবার পড়ে যায়। তারপর

বাতাস আবার ঘুম-পায়ে খেতের ভেতর নেমে যায়। আল থেকে আলে ঘুরে ঘুরে সাঁতারের ভঙ্গিতে হঠাৎ ভেসে যায়। পরীহীন বাতাস পরীছাড়া হয়ে দিক ফেরে। মানুষের শরীরে এসে লাগে, মুখে লাগে, চোখে লাগে, সুগন্ধ আসে, মুখ হাঁ করে বাতাস নিলে জিভে সুস্বাদ লাগে। এই গন্ধে বোঝা যায় ধান পেকেছে, আজ কি কাল, কি দিন পাঁচ-সাত, তারপরই ধানকাটা শুরু হবে। এখন, কার্তিকে, এই পাকা ধানের খেতে, পরী-বওয়া 'দেও-বাও' ছম-ছম, বয়ে যায়, পাকা ধানের আদিগন্ত নির্জনতা বায়ুময় ভরে যায়।

বৈশাখু আর বেঙ্গু—দুই ভাই, এ-হেন কার্তিকে, এ-হেন পাকা ধানের খেতের ভেতর দিয়ে, এ-হেন আকাশ-মাটি ও বাতাস দেখে-দেখে মেখে-মেখে, আলপথে-পথে হাঁটছিল, ছুটছিল। একটু আগে তাদের মা ঝুড়ি-কাঁখে এই আলপথ দিয়ে এই ধানখেতের ভেতর দিয়ে কোথাও চলে গেছে, কচু, কন্দ বা অন্য কিছু খুঁড়ে আনতে। মা-র পিছু পিছু তারা বেরিয়ে এসেছে। এই কার্তিকে, এই পাকা ধানের খেতে, এই আকাশ-মাটি বাতাস দেখলে ও মাখলে, শিশুর অন্তত, কিছুক্ষণের জন্য, ক্ষুধা মনে থাকে না। বৈশাখুর বয়স নয় কিংবা আট, বেঙ্গুর বয়স সাত কিংবা ছয়। দুজনেই সম্পূর্ণ ন্যাংটো।

বেঙ্গু একটা জলনিকাশী চওড়া নালা পার হচ্ছিল, এখন শুকনো। বৈশাখু পেছন থেকে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে ওঠে, ফলে বেঙ্গু হুমড়ি খেয়ে গর্তের ভেতর পড়ে যায়, তার ওপর বৈশাখু। তারপর দুজনেই পাশে ধানখেতের ভেতর গড়িয়ে যায়। তাদের শরীরের চাপে কয়েকগোছা ধান মাটির ওপর শুয়ে পড়ে, দুজনের পিঠ ধানের শিষের টানে কেটে যায়, রক্তের রেখা দেখা দেয়। পরমুহূর্তে রক্তের রেখা লেপটে, মুছে, পিঠময় কিছু কাটা দাগ, চাপ-চাপ মাটির দাগ, শুকনো রক্তের দাগ নিয়ে, ওরা দুজন দুজনকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর হেসে ফেলে। মাটির ওপরের খড় আর সবুজ ঘাসে তাদের পায়ের পাতা ঢাকা, ধানগাছ তাদের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, ধানের পাতা আর শিষের ফাঁকে রোদ আর ছায়া তাদের শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে বয়ে যায়। বৈশাখু আর বেঙ্গু ওপর দিকে তাকায়। এখানে ধানখেতের ভেতর থেকে ওপর দিকে তাকালে মনে হয় আকাশেই ধান পোঁতা আছে। ওরা ধানগাছের তলা দিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। ওরা দু-হাতে ধানগাছ সরায় আর ধানগাছ ফিরে ফিরে আসে। ফলে ওদের শুকনো মাটির ধুলো লাগা—একটু আগেই মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছে তাই কোথাও কোথাও কাঁচা মাটির কালো দাগ-লাগা—ন্যাংটো শরীরে মুহূর্তে মুহূর্তে ডোরা দাগ পড়ে আর মুছে যায়। ধানখেতের নরম মাটি বৈশাখু আর

বেঙ্গুর নরম পায়ের চাপে দেবে যায়, আর সেই নরম মাটির ওপরের সবুজ ঘাস বা কোথাও কোথাও ধানগাছ থেকে ভেঙে বেঁকে পড়ে থাকা সোনালি খড় মাড়িয়ে বৈশাখু আর বেঙ্গু ধানগাছ সরিয়ে-সরিয়ে, আলো মুছে, ছায়া মুছে এগিয়ে যায়। বৈশাখু দু-একবার মাটি থেকে দু-চারটে ধান খুঁটে মুখে দেয়, তারপর চিবিয়ে ফেলে, ভেতরে দুধ-ও নেই, শুধু তুষ। গাছের গোছাগুলিতে কষ-কষ দুধ হয়ত এসেছে—কিন্তু ধানের ভেতরের দুধ জমে কোথাও চাল হয়নি। এখনো দু-পাঁচ দিন দেরি আছে। তারপর ধানকাটা শুরু হবে। তারপর সেই ধান কোটা হবে। তারপর সেই ধানের চাল হবে। তারপর সেই চালের ভাত হবে। বৈশাখু নাক টানে। বেঙ্গু জিজ্ঞাসা করে, 'কিসের গন্ধ পাছিস?' বৈশাখু জবাব দেয়, 'না পাই। চাউলের গন্ধ পাই কি না-পাই দেখি।'

সামনে একটা গর্ত মত জমি। সেই জমির কিনারায় বৈশাখু আর বেঙ্গু দাঁড়ায়। নদীর জল বইতে-বইতে যেমন কোথাও-কোথাও পাক খেয়ে যায়, ধানখেতটা তেমনি বইতে-বইতে এই গর্তটার ভেতর পাক খেয়ে, একটু নেমে বয়ে যায়। গর্তের ভেতরের ধানগাছগুলো একটু বেশি লম্বা হয়ে খেতের ওপরের ধানগাছগুলোর প্রায় মাথায়-মাথায় হওয়ায় ওপর থেকে বোঝাই যায় না ওখানে একটা গর্ত আছে। ধানখেতের ভেতরে ওই গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে বৈশাখু বলে, 'লাফ দিবু, বেঙ্গু?' বেঙ্গু জবাব দেয়, 'নাই রো।' বৈশাখু একটু লম্বা বলে তাকে স্যাংটোই দেখায়, কিন্তু তার পাশে ওইটুকু বেঙ্গুর পেট টনটনিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ানোটাকে খুব প্রাজ্ঞ দেখায়। বেঙ্গু হঠাৎ এক ধাক্কা দিয়ে বৈশাখুকে সেই গর্তের ভেতর ফেলে দেয় আর সমস্ত ধানগাছগুলোকে দলে মুচড়ে বৈশাখু গর্তের ভেতর এমন পড়ে যেতে থাকে যেন গর্তের কোনো শেষ নেই। তারপর বেঙ্গুকে চমকে দিয়ে ছলাত্ করে একটা শব্দ উঠে আসে আর নীচে কোথায় বৈশাখুকে ঢেকে ফেলে ধানগাছগুলো আবার সোজা হয়ে উঠতে থাকে। আকাশজোড়া বাতাসে ধানখেতের কম্পন এক কথা আর শুধু ঐ গর্তটুকুর ধানগাছগুলোর নেতিয়ে পড়ে আবার সোজা হয়ে ওঠা যেন ভৌতিক। তবে কি বৈশাখুকে সে কাঁচা কুয়োর ভেতরে ঠেলে ফেলে দিল। বেঙ্গু ডুকরে কেঁদে ওঠে। কিন্তু এই কার্তিক মাসে ধানখেত এত ঘন আর ঘন ধানগাছের নীচে মাটিতে এত কোলাহল হয় যে সেই কান্না ধানখেতের ওপরে ওঠেই না আর নীচে সেই কান্নাও মনে হয় পাখ-পাখালির ডাক। গর্তের ভেতরের কয়েকটা ধানগাছ সরিয়ে সেই ফাঁক দিয়ে জলে-ভেজা কাদা-লেপা মুখ বের করে বৈশাখু অভিজ্ঞ হাসে, 'কাঁদছু কেনে রে, নামি আয় এইঠে, জল

আছে, ছাঁচিবার ধরি, মাছ পোয়া যাবে।' বেঙ্গু চোখের জল মোছে না, গর্তের কানা দিয়ে দিয়ে গর্তের ভেতর নেমে যায়, যেন ধানের গভীরতা থেকে গভীরতর ধানে সে ডুবে যাচ্ছে। আসলে চাষের সুবিধের জন্য খেতের মাঝখানে এটা একটা কাঁচা কুয়োই—এখন শুকিয়ে গর্ত হয়ে আছে, তলায় তলানি জল। জলটা বেঙ্গুর পা ডুবিয়ে হাঁটুর নীচে, কিন্তু গর্তের ঘেরটা এত ছোট যে এক-পা জলের ভেতরে আর এক-পা পাড়ে রেখে দুই হাতে জলটা ছেঁচতে হয়—সব জল ছেঁচা হলে কাদার ভেতরে যদি সিঙ্গি বা মাগুর বা কাঁকড়া মেলে। কিন্তু ওদের হাত পড়তেই কবেকার বর্ষার সেই জল ঘুলিয়ে উঠে ঝকঝকে, তকতকে, ফুরফুরে পোয়াল, সোনালি ধানশিষ আর ওদের দুজনের চুলে মাথায়, গায়ে কালো পচা, থিকথিকে, বৃষ্টির মত ঝরতে থাকে।

জল একেবারেই কম বলে কিছুটা জল ছেঁচে তুলে ফেলে দুজনে কাদার মধ্যে হাত ডুবিয়ে মাছ খুঁজতে থাকে। পিঠ এত নোয়াতে হয় যে জল বাঁচাতে থুঁতনি এগিয়ে রাখতে হয়। বেঙ্গু শেষে জলের ভেতর বসে পড়ে দুই হাতে কাদা খোঁচায়, জলটা তার নাভি পর্যন্ত ওঠে, আর বৈশাখু গর্ত খোঁচাতে-খোঁচাতে ঘুরতে গেলেই তার মাথা বা পাছার সঙ্গে বেঙ্গুর ঘাড় বা মাথার ঘসা লাগে। দু-হাত ভরে কাদা তুলে চোখের সামনে খুলে-খুলে কাদার গোলা আবার জলেই ফেলে দিতে হয় বৈশাখুকে। কাদার ভেতর ক্রমাগত গেঁথে যেতে-যেতেও বেঙ্গু দুই হাত দিয়ে চারপাশের কাদা খামচে-খামচে তোলে। কিন্তু এক সময় কাদায় কোমরটা এমন বসে যায় যে আর সামনে নোয়ানো যায় না বেঙ্গু তখন কাদা-খোঁচানো ছেড়ে নিজে ওঠবার চেষ্টা করে, পারে না, কাদায় আরো গেড়ে যায়। তখন বেঙ্গু পা দুটো যতদূর সম্ভব টানটান করে শুয়ে পড়ে উপুড় হয়ে যায়, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে যখন উঠে দাঁড়ায় তখন তার মাথায় চুল থেকে সবটুকুই কাদায় লেপা, এমন কি চোখের পাতাও। দাঁড়িয়ে উঠে বেঙ্গু কাদা জলে দাঁড়িয়েই থাকে। বৈশাখুও সোজা হয়, 'চল্ কেনে, একদম মাছ নাই, আর কোনটে পোয়া যায়?' বলে গর্তের কোনায় পা দিয়ে এক ধাপ উঠে, 'আয় কেনে' বলে আরো এক ধাপ উঠে যায়। বৈশাখুর ওঠার পথে ফাঁক করা ধানগাছের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে বেঙ্গুকে দেখা যায়, কিন্তু বেঙ্গুর সবটুকু কাদায় লেপা বলে বোঝা যায় না সে কোন দিকে মুখ করে আছে। 'ধানখেতত্ তুই মাছ মারিবার কইচ্ছিস কেনে রে দাদা?' বেঙ্গু তলা থেকে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করে ওঠে। 'কেনে রে, মাছের ঝোল হবা পারে'—বৈশাখু ওপর থেকে বলে আর ধানগাছগুলো ফাঁকটুকু ভরে দিয়ে বেঙ্গুকে গর্তের ভেতর

ঢেকে দেয়, 'মাছের ঝোল খাবি কী দিয়া রে দাদা?' গর্তের ভেতর থেকে বেঙ্গু চিৎকার করে। 'ভাত দিয়া খাবু'—বৈশাখু গর্তের পাশে ধানগাছের গোড়ায় বসে বেশ শান্তস্বরে বলে। 'ভাত কুন্‌ঠে পাবি?' বেঙ্গুর প্রশ্ন উঠে আসে। 'পাম, পাম, এতো ধান আর ভাত পাম না কেনে রে'—বৈশাখু ধানের গোড়ায় তাকায়। 'এ-ধান য্যালায় ভাত হবা ধরিবে মুই না থাকিম' —বেঙ্গুর গলা উঠে আসে। 'থাকিবু থাকিবু, অ্যালায় উঠি আয়'—বৈশাখু বলে। বেঙ্গু চিৎকার করে ওঠে, 'তুই যা কেনে, মুই না যাও।'

তারপর আর-কোনো কথা হয় না। সেই গর্তের ভেতর, পাকা ধানগাছে ঢাকা বেঙ্গু কাদাজলে দাঁড়িয়ে বুকের কাছে হাত দুটি জড়ো করে কেঁদে ফেলেছে—কাউকে শোনানোর কান্না নয়, যাতে কেউ শুনতে না পায় সেইজন্য চাপা কান্না, পেটের কোনো গভীরে গভীরতর ক্ষুধার মত ভয়ের কান্না। গর্তের ওপরে ধানগাছের গোড়ায় পাকা ধান-খেতে ঢাকা বৈশাখু কাঁদে—এত ধান কবে ভাত হবে! আর তারও ওপর দিয়ে সেই কার্তিকে, সেই পাকা ধানের স্রোত বয়ে যায়।

গর্ত বেয়ে বেঙ্গু কখন এক সময় উঠে এসে ধানগাছের ভেতর কোন একদিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল। তার সারা শরীরে লাগা কাদা কার্তিকের রোদে শুকোতে শুরু করে। কোনো-কোনো জায়গা শুকিয়ে গেছে, কোথাও-কোথাও কাদা কালো হয়ে আছে। বৈশাখু বয়স্ক স্বরে বলে, 'চল্ কেনে হামরালা হাঁটিবার ধরি, হাঁটিলে আর ভোক পাবে না।' বৈশাখু উঠে দাঁড়ায়। ধান-খেতের ভিতরে আলো, ছায়া, খড় আর ধানগাছের আবরণ সত্ত্বেও বৈশাখুর নগ্নতা সেই মুহূর্তটিতে ওর বয়সের পক্ষে অসঙ্গত ঠেকে যায়। বৈশাখু হাঁটতে শুরু করে। বেঙ্গু তার পেছনে-পেছনে চলে। এখন আর ধানগাছের ভেতর দিয়ে দিয়ে তাদের যাওয়াটা রোদ আলো আর বাতাসের অংশ হয়ে ওঠে না। বৈশাখু হাত দিয়ে-দিয়ে ধান-গাছ সরিয়ে-সরিয়ে পথ করে নিচ্ছিল। বেঙ্গু তার দুটো হাত বুকের কাছে জড়ো করে থপ থপ হাঁটছিল। যেন তারা জলের তলায় হাঁটছে এমনভাবে তাদের মাথার ওপর দিয়ে কার্তিকের বাতাস বয়ে যায়। ধানের শিষ তাদের গায়ে লাগে, মাথায় লাগে। বেঙ্গু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। বৈশাখু খানিকটা এগিয়ে পিছন ফিরে দেখে বেঙ্গু হাঁটছে না। দূর থেকে বৈশাখু ডাকে, 'আয় কেনে, খাড়ালু কেনে?' বেঙ্গু জবাব দেয় না, মাথাটা তার বুকের কাছে জড়ো করা হাতের ওপর নোয়ান থাকে। 'আয় কেনে, মা ত চাউল আনিবার গিসে'—বৈশাখুর গলার স্বর কখনো নরম, কখনো

সিক্ত।

বেঙ্গু চিলের মতন চিৎকার করে ওঠে, 'মা কুন্‌ঠে চাউল পাবে ?'

'হয়, হয়, চাউল না পাবে, কচু ত পাবে।'

'কচু পাবে ত কুথন পাবে ?'

'হে ধর কেনে, সন্‌ঝাবেলাত।'

'সন্‌ঝাবেলার তো অ্যালায় অনেক দেরি।'

'ধুত্, আর দেরি কুন্‌ঠে, অ্যালায় বেলা দুপ্‌পর হসে, এর বাদে বেলা নামিবার ধরিবে। তার বাদে সন্‌ঝা। চল্ না, অ্যালায় এইঠে হাঁটি হাঁটি যাই, তারপর হাঁটি হাঁটি ফিরিবার ধরিম। যাইলা বাড়িত্ পৌছায়, স্যালায় সন্‌ঝা হবে, স্যালায় মা কচু আনিবে।'

বৈশাখুর এই কথা শুনে বেঙ্গু হঠাৎ বসে পড়ে। বৈশাখু তার দিকে এগিয়ে আসে, 'চল কেনে বেঙ্গু।'

'মুই আর না যাও, মুই এত্তি থাক, য্যালায় সন্‌ঝা হবা ধরিবে হামক্ ডাকিস দাদা।'

'ধুর বোকা, এইঠে বসি তো সন্‌ঝা হবার অনেক টাইম লাগিবে রে, চল হাঁটি কেনে।'

'মুই আর হাঁটিবার না পার, তুই যা কেনে, মুই এইঠে থাকিম'—বেঙ্গু দুই পা ছড়িয়ে দুই হাত কোলের ওপর নিয়ে ঘাস আর পোয়ালের ওপর বসে থাকে। তার চোখের চারপাশের কাদা শুকিয়ে শাদা আর গালের তলার কাদা তখনো কালো। মুখটাকে দোমাটি-করা ঠেকে। বৈশাখুকে অগত্যা বসে পড়তে হয়। একটা খড় টেনে নিয়ে বৈশাখু সেটা দাঁত দিয়ে কাটে। বৈশাখুর পেটেও তিন দিনের বাসি ও আগামী ক-দিনের অনিশ্চিত ক্ষুধা। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে ভাবে বেঙ্গুকে ক্ষুধার কথা কি করে ভোলানো যায়। 'বেঙ্গু, গপ্‌প শুনবু রে ?'

'কিসের গপ্‌প'—বেঙ্গুর তীক্ষ্ণস্বরে একটু অনুরণন নেই।

'ভালো গপ্‌প রে শুনিবু ?'

'ভাতের ?'

একটু থেমে বৈশাখু বলে, 'দুধের।'

একটু চুপ করে থেকে বেঙ্গু বলে, 'ক কেনে। নম্বা করি কবু রে দাদা।'

'হয়, হয়, অ্যানং নম্বা করিম একেরে সন্‌ঝাবেলায় ঠেকাম।'

ধানখেতের ওপর দিয়ে সরসর বাতাস জীবন্ত বহে যায়, ভেতরে ওদের গায়ে

BanRboi.net

পৌঁছয় না, ধানগাছগুলো একদিকে হেলে, রৌদ্রপাতের কোণ বদলায়, ধান আর খড়ে শিরশির ধ্বনি ওঠে, আর ন্যাংটো শিশুদেহে বয়স্ক ভঙ্গি এনে বৈশাখু হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে খুব আস্তে গলা ঝেড়ে নেয়।

'এইলা এক খুব বড়, খুব সাঁটাইল, খুব বড় মানষি আছিল্। সেলার বলদ, ধর কেনে, দশ হাল জুতিবার পারে। সেলার গাইগুলা বার মাস গাভিন্। হে, বাছুর হবা ধরিছে তো ধরিছে। আজিও বাছুর হয়, কালিও বাছুর হয়। কালিও বাছুর হয়, তার বাদেও বাছুর হয়, তার বাদেও বাছুর হয়। আর অ্যানং বাছুর হবা ধরে কি বাছুরগুলোর তানে এক আলগ্ (আলাদা) গোহালি ঘর বান্ধিবার নাগে। বাছুরের গোহালিয়াত্ বাছুর থাকে। গাইয়ের গোহালিয়ত্ গাই থাকে। বলদের গোহালিয়াত্ বলদ থাকে।'

গল্পটা যখন শুরু হয়, তখনই সুরে শুরু হয়, যে-সুরে শুরু না-হলে বালক বৈশাখু গল্পটা বলতেই পারত না। গলার স্বরের একটা নির্দিষ্ট ধরনের টানে একটার পর একটা কথা উঠে আসে। আর বৈশাখু সেই কটি কথা পর পর বলেই থেমে যায়। সব থামাই যেন গল্পের শেষ থামা। একটা ধ্বনি হঠাৎ বিস্তৃত হয়ে যায়। হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দে নতুন বাক্য শুরু হয়। সেই দীর্ঘশ্বাসের আঘাত, হঠাৎ বিস্তার আর পূর্ণ বিরতির ভেতর কথা ঘুরতে থাকে, যেন একই কথা, একটাই কথা। কখন তার ভেতর নতুন শব্দ এসে যায়। আবার কথা ঘুরে যায়, ফিরে আসে, ঘুরে যায়। গল্পের সুরে কার্তিকের পাকা ধানের খেত ঝন্-ঝন্ করে।

'সকালত আর সন্ঝাত যেইলা দুধ দুহিবার নাগে, বাছুরগুলাক ছাড়ি দেয়। বাছুরগুলাক ছাড়ি দেয় আর বাছুরগুলা ছুটি যায়। বাছুরগুলা ছুটি যায় আর গাইয়ের বাঁট ধরি টানিবার ধরে। এক-একটা বাছুর এক-একটা গাইয়ের বাঁট ধরি টানিবার ধরে। কুন্গাইয়ের কুন্বাছুর কুনো ঠিক নাই রে, কুনো ঠিক নাই।' বৈশাখু একটু থেমে থাকে, তারপর নিম্নতর স্বরে প্রায় গানের গলায় বলে ওঠে, 'কুনো ঠিক নাই রে, কুনো ঠিক নাই।' তারপর যেন একেবারে থেমে যায়।

পা ছড়িয়ে পেটের ওপর দুই হাত জড়ো করে বেঙ্গু বসেছিল। তার সারা গায়ের কাদা শুকিয়ে গেছে। এখন কোথাও-কোথাও ফাটছে। বেঙ্গু চিলের গলায় চিৎকার করে, 'যেই গাইয়ের বাঁট যেই বাছুরের ইচ্ছা টানিবার পারে?'

দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে রেখে বৈশাখু প্রৌঢ় মাথা নাড়ে, 'হয়, হয়, পারে।

boiRboi.net

বাঁট ছাড়া বাছুর নাই। বাছুর ছাড়া বাঁট নাই। একোর বাঁট সগার বাঁট। সগার বাছুর একোর বাছুর।'

'যেইলা বাঁটত মুখ ওইলা দুধ?' বেঙ্গুর গলা যেন তীক্ষ্ণতর। বৈশাখু তিনকাল-পেরনো বুড়োর মত সারা মুখে ধানপাতার রেখা নিয়ে খুব খাদে বলে, 'ঐলা দুধ।'

'কুনো বাঁটের দুধ শুখায় না?'

'না শুখায়।'

'কুনো বাছুরের প্যাটত ভোক না থাকে?

'না থাকে।'

'সব বাঁটত দুধ আছে আর কুনো প্যাটত ভোক নাই?'

'নাই।'

'ভোক নাই?'

'নাই।'

'একোর বাছুর সগার বাছুর?'

'বাছুর।'

'একোর বাঁট সগার বাঁট?'

'বাঁট।'

'ভোক নাই?'

'নাই।'

'একোর বাছুর সগার বাছুর?'

'বাছুর'।

বৈশাখু যে-গল্পটা শুরু করেছিল, সেই গল্পটাই যেন বৈশাখু আর বেঙ্গুর কথায় নতুন রকমে শেষ হতে পারে। আর বেঙ্গু আর বৈশাখুর কথার সুরও কেমন মিলে যায় গল্পের মূল সুরের সঙ্গে। বহুবার বলা, বহুবার শোনা গল্পটা বৈশাখু আর বেঙ্গুর গলায় গলায় নতুন হয়ে যায়। এখন কার্তিকে, এই পাকা ধানের খেতে উপকথার নতুন জন্ম হচ্ছে।

বেঙ্গু তার ভঙ্গি বদলায়নি, চোখ তোলেনি, তবু সে যেন তার চার পাশের অজস্র পোকামাকড় আর পাখ-পাখালিকে দেখতে পায়। 'দাদা রে, পাখি বুঝিবার পারে কোন পাখির কুন ছাও?'

'না পারে। না পারে।'

'পিপিড়া বুঝিবার পারে কোন্ পিপিড়ার কুন ছাও?'

boiRboi.net

'না পারে। না পারে।'

এর পর ওরা আর কোনো কথা বলে না। বেলা বয়ে যায় ধানখেতের ওপর দিয়ে। ধানখেতের গভীরে রোদ ক্রমে কৌণিক আর ধানগাছের যূথবদ্ধ ছায়া দীর্ঘতর হয়ে ওদের শরীর দুটোর ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ওদের ঐটুকু শরীরের পক্ষে আলো আর ছায়ার রেখা বড় বেশি মোটা আর লম্বা। মাত্র দুটি কি তিনটি রেখাই ওদের ঢেকে ফেলতে পারে। কার্তিকের পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশে রঙ খুব ঘন ও গভীর বদলাতে পারে। কার্তিকের পাকা ধানের খেতের গভীরে ছায়া গাঢ় হয়ে যায়। ধান আরো একদিন পেকে ওঠে।

চোখ রগড়ে বৈশাখু ডাকে, 'বেঙ্গু'। বেঙ্গু সাড়া দেয় না। 'বেঙ্গু-রে।' তা-ও কোন সাড়া পায় না। 'বেঙ্গুর রাগ কেনে।' শুকনো, ফাটা, মাটিলেপা শরীরে বেঙ্গু কাত হয়ে পড়ে ছিল—সন্ধ্যাবেলার বটতলার বালগোপালের মূর্তির মত। আচ্ছন্নতার ভেতর থেকে সে বলে, 'মুই না জাগ।' বৈশাখু একবার ধানখেতের ভেতর থেকে আকাশের দিকে তাকায়, আকাশে এখনো অনেক আলো। তারপর বেঙ্গুকে ডাকে, 'বেঙ্গু'। বেঙ্গু সাড়া দেয় না। 'বেঙ্গু রে' সাড়া আসে না। 'বেঙ্গু জাগবু না কেনে রে।'

আচ্ছন্নতার ভেতর থেকে বেঙ্গু সাড়া দেয়, 'জাগিলে বড় ভোক'।

বেঙ্গুর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বৈশাখু উঠে দাঁড়ায়। অনেক ওপরে আকাশে তখন আলো, ধানখেতের ওপরে ছায়া, ধানখেতের ভেতরে আবছায়া। বেঙ্গুর কাছে গিয়ে তার দুই হাত ধরে টেনে বৈশাখু বলে, 'উঠ, বেঙ্গু উঠ।' পা ভেঙে বেঙ্গু দাঁড়ায়। ক্ষুধায় বা ঘুমে তার মাথা পেছনে হেলে থাকে, মুখটা হাঁ, সারা মুখ শুকনো মাটি লেপা। বৈশাখুর দুই হাতের ওপর ঝোলা বেঙ্গুর মাটিমাখা মুখখানা বৈশাখুর কোলের কাছে—মাটির খেলনার ভাঙা মুখের মত অসংবদ্ধ। 'বেঙ্গু, খাড়া কেনে, বেঙ্গু, খাড়া'—বেঙ্গুকে টানতে গিয়ে বৈশাখু পেছনে হেলে যায়।

টলটলে পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে কোনো রকমে দাঁড়িয়ে বেঙ্গু জিজ্ঞাসা করে 'কেনে, খাড়াম কেনে?'

'হামরালা অ্যালায় যাম, বেঙ্গু, চ কেনে' বৈশাখু বেঙ্গুকে জড়িয়ে ধরে পা ফেলে।

বেঙ্গু দু-পা এগিয়ে চারপাশে তাকিয়ে নেয়, ওপরে শেষবেলার রঙে-রঙে উজ্জ্বল আকাশের দিকে অপরিচিত তাকিয়ে বেঙ্গু বলে, 'ঐ ঠে কি হচ্ছে।'

BanglaBook.org

'ঐটা তো আকাশখানা।' 'আর এইঠে ?' 'এইঠে তো ধানখেতের ভিতর।' 'ধানখেতত্ ভাত নাই ?' 'নাই রো।' 'ঘরও ত ভাত নাই ?' বৈশাখু জবাব দেয় না। বেঙ্গু থেমে গিয়ে বলে, 'মুই না যাও। মুই এইঠে থাকিম' 'অ্যালায় এইঠে থাকিলে ত যথ হবার ধরিবু তুই।'

'যথ হইলে কি হয় ?'

'এইঠে তোর মরণ হবে।'

'হছে ত।'

'মরণের পরও এইঠে থাকিবার নাগিবে।'

'কত দিন থাকিবার নাগিবে।'

'আমরণ।'

'ধান কাটিবার আর কতদিন বাকি ?'

'পাঁচ-সাত-আট-দশ দিন।'

'দশ দিন বড়, না, আমরণ বড় ?'

'আমরণ, আমরণ।'

'ত অ্যালায় মুই এইঠে মরিলে ধান কাটিবার বাদে যখ হইয়া বাঁচি থাকিম ?'

'থাকিবু।'

'স্যালায় যথ হইয়া ধানের ভাত হওয়া দেখিম ?'

'দেখিবু।'

'ভাত খোয়া পারিম ?'

'পারিবু।'

'কিন্তুক স্যালায় তো তুই আর বেঙ্গু না থাকিস স্যালায় তো তুই যথ, যথ--'।

যেন জলের গভীরতা থেকে আকাশ দেখেছ এমনি ভাবে, ধানখেতের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তর থেকে, ধানখেতের ছায়াপ্রান্তর ভেদ করে, অস্ত-আকাশের দিকে মুখ তুলে, দোমাটি-করা মুখ খান খান কান্নায় ভেঙে ফেলে বেঙ্গু চিৎকার করে ওঠে, 'দাদা হামার বড় ভোক। হামাক মারি ফেলা। মুই আর বেঙ্গু থাকিম না। মুই যথ হম।'

তাদের ওপর দিয়ে কার্তিকের পাকা ধানখেত আরো পাকবার দিকে প্রসন্ন বয়ে যায়।

boiKhoj.net

৪

টুলটুলি খুব তাড়াতাড়িই হাঁটে। কীচকের ভিটার পশ্চিমে তালমানদীর পাড়ে খুব মোটা-মোটা কচুগাছ হয়। কারো-না-কারো জমি নিশ্চয়। কোনো জমি ত আর ভগবানের নয়, কোনো-না-কোনো গিরির। কিন্তু বরাবরই পতিত। অন্তত যতদিন টুলটুলি দেখছে ততদিন পতিতই দেখছে। বছরের মধ্যে বার-কয়েক ত টুলটুলিকে দেখতেই হয়, কচু আর বুনো আলুর খোঁজে। কিন্তু খোঁজটা আরো সবার ত জানা। তাই টুলটুলিকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হয়, যাতে সে আগেভাগে পৌছতে পারে। কিন্তু এমন ত হতে পারে টুলটুলির মত আর-একজন গতকাল বা পরশু বা তার আগের দিন বা তার আগের দিন বা সাতদিন আগে ঐ কচু তুলে নিয়ে গেছে। আবার এ-ও হতে পারে, আজ প্রথম টুলটুলিই ঐ কচুতে হাত দিল। এই জায়গাটার কচু তুলতে ত আসবে দ্বারিকামারীর লোক, কীচকের ভিটার লোক, গোলান্দিপাড়ার লোক আর সরকারপাড়ার লোক। সবচেয়ে আগে আসে গোলান্দিপাড়া, সরকারপাড়া—একটা মাঠের ত মাত্র তফাত, তারপর কীচকের ভিটা তারপর দ্বারিকামারী।

ঘরে ধান না থাকতে পারে, কিন্তু কচু আর বুনো আলু বা শাক-খোঁজারও ত একটা সীমা-সরহদ্দ আছে। প্রথমে বাড়ির আনাচে কানাচে খোঁজাখুঁজি চলে। পাওয়াও যায়। তারপর পাড়ার আশেপাশে, বাঁশবনে, পতিত জমিতে। এমনি করে-করে সীমা বাড়ে। বাড়তে-বাড়তে নাওয়াপাড়া-সরকারপাড়ার লোকেরা বর্ষার মাঝামাঝিই তালমার পাড়ে পৌছে যায়। খিদেও পায়, খিদে মেটাতেও হয়, কিন্তু সেজন্যে ত আর গাঠিয়াপাড়ার লোক এসে তালমার এপারে জমি খোঁচাবে না। আর যদি খোঁচাতে হয়, যদি নিজের সীমানা ছেড়ে অন্যের সীমানায় ঢুকতেই হয়, তাহলে তখন আর-কোনো সীমাই থাকে না, চোখ দুটো যেদিকে চায়, সেদিকেই পা দুটো নিয়ে যায়। তখন তালমানদী আর বরমতলের মাঠ—কোনোটাই আর ঠেকাতে পারে না।

কিন্তু তেমন অবস্থায় যাবারও ত একটা নিয়ম আছে, কতকগুলো ভাগ আছে। যত নিয়মছাড়াই হোক, ক্ষুধা আর খাদ্যসংগ্রহের তবুও একটা নিয়ম

না-থাকলে এই ভুবনসংসার চলে কি করে! আশ্বিনের শেষ সপ্তাহের কিছুদিন পর্যন্ত আধপেটা ভাত জুটে গেছে। জুটে যায়। তারপর শুরু হয়, চেয়ে-চিনতে আনা, ধার করা। তারপর ঘটিবাটি বিক্রি। আর তারপর মাঠেঘাটে বুনো আলু আর কচু, নালায় ডোবায় মাছ। এই স্তরপরম্পরার শৃঙ্খলায় আজকালের মধ্যেই কচু আর বুনো আলুর খোঁজে মাঠে নামার কথা। তাই এমন হওয়ার সম্ভাবনা কমই যে আজকের আগেই কেউ কীচকের ভিটের পশ্চিমের জমির কচু গাছে হাত দেবে। কিন্তু টুলটুলির স্বামী খেতখেতুর ত তাও পাঁচ-দশ বিঘে আধি জমি আছে, খেতখেতুর ত একটা গোয়ালঘর আছে। খেতখেতুর ত একটা ঘটি থাকে যেটা বেচা যায়। পাটের দাম বেশি হলে খেতখেতুর ত কলাই-করা থালা থাকে। এর কোনোটাই যাদের নেই তাদের ত সারা বছরটাই খাওয়া খুঁজতে হয়। তারা এর ভেতরেই বুনো আলু আর কচুতে হাত দিয়ে ফেলতে পারে। পারে। তারা এর মধ্যে কচু তুলে নিয়ে গিয়ে থাকলে টুলটুলির কিছু করার নেই।

তখন টুলটুলিকে আর-কোথাও খুঁজতে হবে। এক আশা, সব জায়গায় সব কচু এর ভেতরই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। আর দিন পনেরর ভেতর সব কচু শেষ হবে। মাঠেঘাটে কচুর খোঁজ করে যাদের কাতার ধান কাটা পর্যন্ত চালাতে হবে, তাদেরও একটা হিশাব থাকে বনবাদাড় মাঠঘাটের কচু দিয়ে কতদিন চালানো যাবে। তাই রোজকার কচু রোজ তুলতে হয়। পরের দিনের কচু আগের দিন আনে না। তেমন আনা যায় না।

কিন্তু এই যে কার্তিকের পাকা ধানের খেতের ভেতর দিয়ে টুলটুলি প্রায় ছোটে, সেই পাকা ধানের খেতটাই শেষ হতে চায় না। মাঝেমাঝে আলটা নিচু, তখন ধানখেত বুকের ওপর, মনে হয়, ধানখেতে বুঝি ঢাকা পড়ে যেতে হবে। টুলটুলিকে ধানখেত পেরিয়ে পেরিয়ে কতদূর চলে আসতে হয়, সেটা বোঝবার জন্যই যেন, সেই ধানখেতের প্রান্তরের ভেতর খেতখেতুর গোহালঘরের মাথাটা জেগে থাকে, একটুখানি। কোথাও আল উঁচু। তখন চারপাশের ধানখেতের উজ্জ্বল টকটকে সূর্যের আলো ধানগাছে ঠিকরে চোখে লাগে। এই পাকা ধানের খেত, এই পাকা ধানের খেতে সূর্যের আলোর প্রতিফলন, এই পাকা ধানের খেতের শুকনো মিষ্টিগন্ধ, পাকা ধানের ওপর দিয়ে কার্তিকের প্রথম উত্তুরে হাওয়ার শিরশিরানি, এই খেতের পর খেত পাকা ধান যে আর শেষ হতে চায় না—এ-সবটাই টুলটুলির কাছে অবাস্তব। মাত্র কদিন পর যে-খেতের কোণে কোণে গাছের গোড়ায় কাঁচি পড়বে, মাত্র আরো কদিন পর যে—

BanglaBook.org

খেতের সব জায়গাতেই কাঁচি হাতে চাষি নেমে পড়বে, মাত্র আর-এক মাসের ভেতর যে-মাঠের নির্জনতা, কবজির দাপটে শিশিরে ভারি ধানের গোছা নামিয়ে ফেলা আর গোছাসুদ্ধু ধান কাটা আর বাতাস কেটে কেটে ধানের বাঁধা-আটি ছোঁড়া আর বেলাডোবা সময় জুড়ে মাথায়-মাথায় ধানের আঁটি খোলানে নিয়ে যাওয়া আর বেলাডোবা সময় জুড়ে পাখি-গাই-বলদ-মেয়ে-পুরুষের কলরবে অবাস্তব হয়ে উঠবে, যেন গল্পকথা—ধানে ধানে, পাকা ধানে ধানে, কাতারে আমনে, থৈ থৈ টইটম্বুর জলের মত বীচিভঙ্গমুখর সেই ধান্যময় প্রান্তরকেই, টুলটুলির মনে হয়, তার আর কচুখেতের মধ্যে সবচেয়ে বড় বাধা। পরিণত-শস্যহরিৎ মৃদুগন্ধমন্থর এই ধান্যময় প্রান্তর টুলটুলির কাছে এখন অবাস্তব অর্থহীন বিস্তার শুধু। এই অর্থহীন অবাস্তব বিস্তার ঠেলে টুলটুলি ও তার বেশ কিছু পিছে বৈশাখু আর বেঙ্গু, তার দুই বেটা, চলে—বন্যার কুকুর যেমন জল ঠেলে-ঠেলে ডাঙার দিকে ছোটে।

ধানখেতটা শেষ হতেই সবুজঘাসে ছাওয়া ক্রমশ উঁচু জমি আর পাশাপাশি ধানখেতগুলোর শেষে বড় বড় গাছের নিশানা চোখে পড়ে। এইখান থেকে জমিটা উঁচু হওয়া শুরু। উঁচু হতে-হতে ইস্কুলের কাছে উঠেছে, ইস্কুলের পরে হাটখোলা, হাটখোলার পরেও ডাঙা মাঠটা সোজা উত্তরে বয়ে গেছে—সেই জহুরির কলোনিতে। এই ডাঙা মাঠের পুব পাক দিয়ে রাস্তা আর পশ্চিম পাক দিয়ে তালমা নদী। হাটখোলার পর তালমানদীর উপর কাঠের সাঁকো। নদীর ভেতর পোতা দুই সারি থাম আর থামের সঙ্গে বলটু দিয়ে লাগানো লম্বালম্বি তিনটি কাঠ। গত কয়েক সনে ভোটের সময় তার ওপর মুলি বাঁশের বেড়া পড়েছে। সেই বেড়া নতুন থাকতে ভোটের গাড়ি পার হত, গরুর গাড়ি ত বটেই। এখন ঝরঝর হয়ে গেছে, খসেখসে পড়ে।

ধানখেতটা পেরিয়ে টুলটুলি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, যেন প্রধান বাধাটা সে পেরিয়ে আসতে পেরেছে। একবার পেছন ফিরে চায়—কতটা এসেছে দেখতে, বৈশাখু-বেঙ্গুকে খুঁজতেও হয়ত। কিন্তু কিছু বোঝে না। টুলটুলি চলে আসার পর পেছনে আলের রেখা উপছনো ধানে-ধানে মুছে গেছে।

এই মাঠটা কচ্ছপের পিঠের মত গড়িয়ে গড়িয়ে উঁচুতে ক্রমে উঠেছে বলে চারদিকের দৃশ্য ধাপে-ধাপে টুলটুলির কাছে ধরা পড়তে থাকায় টুলটুলির ভালই লাগে। কিন্তু তার পরই তার কেমন একা বোধ হয়। কচ্ছপের পিঠের মত সেই ঢাল বেয়ে ওঠার সময় দুদিকের অনেকটাই নজরে আসে। যতই নজরে আসে, ততই যেন টুলটুলির নিজেকে একা লাগে। একা লাগলে পেছন ফিরে

boiboi.net

ধানখেতটার দিকেই টুলটুলিকে আবার তাকাতে হয়, যে-ধানখেতের ভেতর তার এমন একলা-একলা লাগে নি, ধানের শিষ তার গায়ে এসে পড়েছিল। আর এখন তার দুপাশ ও সামনে ও পিছনে ক্রমেই অধিকতর খালি করে করে নিজেকে একলা থেকে একলাতর করছিল টুলটুলি—

এ্যালায় বেলা উঠিবার ধইচছে। সগায় চাহি থাকে আকাশ আর মাটি মিশান ধান বাড়ির পানে, কখন পাকিবার ধরিবে ধানা, কখন পাকিবার ধরিবে। খ্যাতত্ কুন্থ কাম নাই। কায়ও ঘরত বাহির হবে না। এ্যানং টাইমে কুনো বেটিছোয়া ঘরত বাহির হওয়া ধরিলে সগায় বুঝে সরগোচালী (পাড়াবেড়ানি) চলোছে। সরগোচালীক সগায় চিনে। হামাক দেখিলে সগায় বুঝিবে, ধানখেত উজাইয়া যে-ই বেটিছোয়া হেই ইশকুলের মাঠ কাক পাড়িবার ধরিছে, সেইলার প্যাটত ভাত নাই, সেইলার ঘরত ভাত নাই—

এই ক্রমোচ্চ ডাঙায় উঠতে কোমরটা একটু এগিয়ে দিতে হয়। কোমরে, পায়ের পাটিতে আর গোড়ালির ওপরের শিরায় টান ধরে, আর হাঁফ ধরে। টুলটুলি ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে হাঁফ ছাড়ে। সামনে আরো উঁচুতে উঠে গেছে মাঠ, এই ডাঙার ওপর ইশকুল, ইশকুলের পরে হাটখোলা, হাটখোলার পরে আবার মাঠ—সেই মাঠের পশ্চিমে কচুগাছের ঝাড় বর্ষায় বড় হয়। এই এতটা মাঠ সম্পূর্ণ একা-একা পেরতে হবে ভাবতে টুলটুলির লজ্জা লাগে। যে দেখবে সেই বুঝবে সে কচুখোঁচানি। এখন চারপাশের ধানখেতের ভেতর থেকে গড়িয়ে উঠে-আসা সবচেয়ে উঁচু ও বিস্তারিত এই মাঠের উচ্চতা আর বিস্তার টুলটুলির না-খাওয়া ভোক পাওয়া পেটের সব ভাঁজ যেন উদোম করে দেয়। রোদও বাধা-হীন। টুলটুলির একটু আড়াল লাগবে, একটুখানি আড়াল, নইলে সে কচু খুঁড়তে যেতে পারবে না। তাহলে, টুলটুলি সোজা উঠছে কেন। সোজা উঠে তার কী হবে। তার চেয়ে যদি এখান থেকে, এখনই, ডাইনে, পশ্চিমে, তালমার দিকে ফেরে তাহলে—পশ্চিমের ঢালত, তালমার পার দিয়া ইশকুল-বাড়ির পাছত দিয়া, হাটখোলার পাছত দিয়া কচুগাছের জঙ্গলবাড়িতে উঠিবা পারে।

টুলটুলি আর সোজা না উঠে ডাইনে বেঁকে। জমিটা গড়ান জমি। বাঁ পা-টা তাই পড়ে উঁচুতে, ডান পা-টা পড়ে নিচুতে। যেন খোঁড়া, এমন হাঁটে টুলটুলি, বাঁ পায়ে বেশি জোর আর ডান পায়ে কম জোর দিয়ে দিয়ে। আগে থাকতে যদি টুলটুলির ঠিক করা থাকত কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথায় যাবে, তাহলে ধানখেতের ভেতরেই আলে-আলে পশ্চিমে সরে-সরে তালমার পাড়ে চলে যেতে

boiRboi.net

পারত। এতক্ষণ তালমার পাড়ে পাড়ে কচু খোঁচাতে পারত বা তালমার জলে মাছ ছিঁচোতে পারত। এমন-কি, ধানখেতটা শেষ হওয়ার সময়ও যদি তার মনে হত, তাহলে এই ঢালুর তলা দিয়ে তালমার পাড়ের দিকে চলে যেতে পারত। কিন্তু এই গড়ান বেয়ে মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে টুলটুলির লজ্জা লেগে যায়, এত বড় মাঠে সে একা, বেটিছোয়া—সেই লজ্জা, তার খিদে পায়—সেই লজ্জা।

এতখানি বেলা হয়েছে, এখনো টুলটুলি খোঁজাখুঁজি করতে পারে নি। কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথায় যাবে, সে-সব আগে ঠিক করা থাকলে এত দেরি হত না। বা, যদি টুলটুলি না-খেয়ে থাকার জন্য লজ্জা না পেত।—না-খাউয়াইয়ার এ্যানং অ্যালাং ভ্যালাং ভাল না। খাউয়াইয়ার ঘরের ভাঁড়ার ঠনঠনায় আর না-খাউয়াইয়ার ঘরের ভাঁড়ার গদ্‌গদায়। কৌটা টিনের ঠনঠনে, খাউয়াইয়ার ভাঁড়ারঘরে বাজনা বাজে। আর না-খাউয়াইয়ার ঘরের ভাঁড়ার ত নদীর পাড় আর কাদায়। গদ্‌গদ করে পা গেড়ে যায়। খাউয়াইয়ার ভাঁড়ার একটুখানি, না-খাউয়াইয়ার ভাঁড়ার মাঠকুড়ানি। খাউয়াইয়ার ঘরের একটুখানি জায়গায়, সব সাজানো-গোছানো, কৌটো আর টিনের মুখ খুলে খুলে রান্নার জিনিশ বের করে দেয়। আর—

না-খাউয়াইয়ার ঘরক্ সকালত উঠি এ্যানং ধানখেত সাঁতরাইয়া, হে-ই তালমা নদী হতে মাছ ধরি, হেই হাটখোলার পাছত কচু তুলি, হে-ই কনেক সুখা কাঠি নিয়া ঘরত যাইয়া আন্না (রান্না) করিবার নাগে। তাই অ্যানং অ্যালাং ভ্যালং ভালো না। হিপাকে আসিবার ত হুপাকে যাছে; হুপাকে আসিবার ত হিপাকে যাছে। য্যানং হাঁসের নাখান হকর-পকর করি ঘরঠে বাহির হছে, টুলটুলির ত জানা উচিত কুন্‌ঠে যাছে, কেন যাছে। এ্যালায় এক-বার পাহাড়ত উঠিবার ধইচ্‌ছে, একবার নামিবার ধইচ্‌ছে—

ঢালু জমির গড়ানের মাঝখান থেকে কেউ এমন চওড়াচওড়ি পার হয় না, শিশুরা ছাড়া। আর, এই এতটা জমি চওড়াচওড়ি পার হতে কত আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে পারে তিনবিয়োনি টুলটুলি। তার দুই বাচ্চা ধানখেতের ভেতর কোথাও আছে দেখা যায় না। এই খাড়া ঢালু জমিটাকে মাঝখানে রেখে চার পাশেই ত ধানি জমি। উত্তরের জমিগুলো টুলটুলি পেরিয়ে এসেছে—ওর ভেতর এখন বৈশাখু আর বেজু। পশ্চিমে তালমা নদীর ওপার থেকে আবার পাকা ধান। পুবে, এই ডাঙা জমির পাশ দিয়ে সড়ক গেছে উত্তরে জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি বাস রাস্তার দিকে আর দক্ষিণ চাউলহাটি বর্ডারের রাস্তার দিকে। এই

সড়কের পুব দিকে কীচকভিটা, সরকারপাড়া, গোলান্দিপাড়া, নাউয়াপাড়া—ছাড়া-ছাড়া বাড়ির এক-এক পাড়া, এক-এক গাঁও। এই সব বাড়িঘরের পেছনে আবার ধানখেত। চারদিকে পাকা ধানের পাকা হলুদ, তার ভেতর বাড়িঘরে পোঁতা গাছগাছড়ার সবুজের রং দূর থেকে কটকট করে। শুধু শুধু চোখ মেলে রাখার স্বভাব আর টুলটুলির হবে কোত্থেকে, কিন্তু বাড়ির আঙিনা থেকে চোখ তুললেই দিগন্ত দেখার অভ্যাসে, সে, একেবারে সন্নিহিত, একেবারে নিকটের এই ধান খেতের দৃশ্যের দিকে চোখ মেলে। যেন এই বিরতিহীন পাকা ধানের স্রোত, বিরতিহীন দিগন্তের মতই তার কাছে অবান্তর, আগামী পাঁচ অথবা সাতদিন পর ধান পেকে ওঠা তার কাছে অবান্তর, শাল-সেগুন-খয়েরের জঙ্গলের মত এই ধানের জঙ্গলে সে কাঠ কুড়োয়, বা কচু খোঁচায়, রোয়া বোনা-পেকে ওঠার হিশাব তার কাছে নেই। গত তিন দিন যার পেটে ভাত নেই তার কাছে আগামী তিনদিনের পরের ভাতের কোনো হিশাব নেই। সেই বেহিশেবি পারিপার্শ্বিকে টুলটুলি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে ডাঙা জমির কিনারে পৌঁছায়।

নীচে তালমা। প্রায় পাঁচ-ছ মানুষ উঁচু পাড়ের মাথায় টুলটুলি। টুলটুলি কোমরে হাত দিয়ে নীচে জলের সোঁতাটাকে দেখে আর পাড়টাকে যাচাই করে নেয়। কার্তিক মাসে আর তালমায় জল আসবে কোথা থেকে। বৈশালি (বর্ষা) দিনে জল বাড়ে, আবার কমে। কার্তিক মাসে এখন ত শুখা। এই উঁচু পাড়টা থেকে তালমার জলের দিকে তাকালে গা ছমছমায়। জলের জন্য না, পাড়ের এই খাড়াটার জন্য। এত নীচে নদী, যে মনে হয় বর্ষার এই এতটা জায়গা জলে ভরে যায়। মোটেই তা হয় না। আসলে নদীর পাড়টা উঁচু না, জমিটা উঁচু বলে পাড়টা এত খাড়া।

কোমরে হাত দিয়ে টুলটুলি সোজা নীচে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে, তারপর ডাইনে তাকায়। ডাইনে খানিকক্ষণ তাকিয়ে আবার বাঁয়ে তাকায়। খোঁপার সঙ্গে ঝোলানো ঝুড়িটাতে একবার হাত দেয়। তারপর দুটো হাতই মাথার ঝুড়িটার ওপর রেখে ডানদিকে কয়েক পা আস্তে-আস্তে হেঁটে যায় আর নীচু হয়ে খাড়া পাড়টার গা কোনাকুনি দেখার চেষ্টা করে, সেই পাড়েরই মাথায় দাঁড়িয়ে যতটা দেখা সম্ভব।

আসলে, টুলটুলি যাচাই করে কোনখান দিয়ে নামাটা সম্ভব। নদীর পারে নেমে যাওয়াটা ত টুলটুলির উদ্দেশ্য নয়। সে এই খাড়া পাড় বেয়ে নামতে চায়। খাড়া পাড়ের গায়ে বুনো আলু, ওল, কন্দ কচু থাকে। মাটি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেগুলো বের করতে চায় টুলটুলি। তাই নদীর নিচু পাড়ে সে যায় নি। সেখান

দিয়ে ত সবাই ওঠানামা করে, যে যা পায় তাই তুলে নিয়ে যায়। এই খাড়া পাড় বেয়ে নীচে নামা প্রায় অসম্ভব। কোনো-রকমে যদি মাটি ধরে ধরে নামা যায়, তাহলে কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে। তারপর নদীর জলে মাছ ওঠে কিনা দেখতে দেখতে, নদী ধরে ভাটিয়ে যেতে যেতে, টুলটুলি সেই হাটখোলার পেছনের কচুর জঙ্গলে গিয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু পাড় বেয়ে নামতে গেলে পাড়ের মাথায় পা-রাখার মত জায়গাটা ত অন্তত দরকার। নইলে ত পাড় গড়িয়ে সেই নদীর পারে গিয়ে পড়বে। তেমনি একটা জায়গা খুঁজছে টুলটুলি। টুলটুলি যেখানে দাঁড়িয়ে ঝোঁকে তার নীচের পাড়টা একটা কাত করে খাড়া বাটির মত, ভেতর দিকে গর্ত। যেখানে গিয়ে গর্তটার সীমানা আবার উঁচু হয়েছে টুলটুলি সেখানে যায়। বাঁয়ে। কিন্তু এমন নিটোল ঢেউয়ের মত গোল হয়ে পাড়টা ঘুরেছে যে সেখানে শ্যাওলা জমে আছে। কোনো খাঁজ নেই। কিন্তু তার ফলে মাটির সেই গোল ঢেউটা সেখানে সোজা হয়েছে সেখানে একটা খাঁজ তৈরি হয়, লম্বালম্বি খাড়া। পিঠটা হেলান দিয়ে সোজা হয়ত বসা বা দাঁড়ানো যেতে পারে, একটা খাঁজই ত, তা-ও আবার শ্যাওলাধরার মত শক্ত পুরনো খাঁজ, তার সইবে আর গোড়ালি দিয়ে গুঁড়িয়ে বাঁ হাত দিয়ে খিমচিয়ে হয়ত হাত-পা রাখার খাঁজ বানানো যাবে। টুলটুলি পা ঝুলিয়ে বসে, দুহাতে মাথার খোঁপার সঙ্গে লাগানো ঝুড়িটা তুলে এনে নীচে ফেলে দেয়, দুহাত দুই পাশে ঘাসের ওপর রেখে একটু নড়ে চড়ে। তারপর দুই হাতের ওপর ভর দিয়ে কোমরটা একটু এগিয়ে নিয়ে উপুড় হয়ে যায়, ডাঙার কানায় বুকটা লেগে থাকে। পা দুটো একটা জায়গার জন্য পাড় আঁচড়াতে থাকে, কখনো পা পাড়ে লাগে, কখনো লাগে না, ঝুরঝুর মাটি ঝরে পড়ে। টুলটুলির শরীরের ভারে মাটি ভেঙে পড়লে বা টুলটুলি হড়কে গেলে, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট নীচে নদীর পারে পড়ে যাবে। তার হাতের সামনে কিছু ধরার নেই, ঘাস ছাড়া, পা-ও মাটি পাচ্ছে না। ডাঙার কানায় বুক লাগিয়ে উপুড় হয়ে ঝুলে নীচে পা ছুঁড়তে-ছুড়তে টুলটুলি বাঁ পা-টা আরো বাঁয়ে ছুঁড়ে সেই খাঁজটায় লাগাতে চেষ্টা করে। এদিকে ঘসতে ঘসতে সে শরীরটাকে প্রায় কিনারে নিয়ে এসেছে। মাইদুটো শুধু ডাঙার কানায় অতিরিক্ত বাধা হয়ে আছে। ঘসটে ঘসটে টুলটুলি ডান মাই ডাঙা থেকে নামিয়ে আনে, ফলে তার শরীরটা ঝুলে পড়ে। দুই হাতের পাঞ্জায় শরীরটাকে ঝুলিয়ে রেখে বাঁ দিকের সেই খাড়া খাঁজে পা-টা হাঁটু পর্যন্ত আটকে, ডান পা-টা ছুঁড়ে-ছুঁড়ে পাড়ের গায়ে একটা গর্তমত করে, ডান পায়ের পাতা সেখানে রেখে টুলটুলি পাড়ের

boiRboi.net

গায়ে সেঁটে যায়। সেইভাবে খানিকক্ষণ থাকে—দুই হাতের আঙুলে পাড়ের মাথাটা শক্ত করে ধরা। পাড়ের গায়ে একটা বিরাট শিকড়ের আকারে সাঁটা টুলটুলির শরীরের ওজনটা বেশ কিছুক্ষণ সময় জুড়ে ধীরে-ধীরে হাত থেকে পায়ে চলে আসতে থাকে। টুলটুলির মুখ থেকে তলপেট পর্যন্ত পাড়ের সঙ্গে সাঁটা, দুই পা দুদিকে ছড়ানো, হাতদুটো মাথার ওপরে। কার্তিকের শুকনো মাটি ঝুরঝুর ঝরে যেতে পারে। মাটি না ঝরলেও টুলটুলির পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা, কারণ তার পা ঠিকমত কোথাও গাড়া নেই যাতে শরীরের ওজন সামলায়। শরীরে ভার-সঞ্চরণের নিয়মে একসময় টুলটুলির ডান পায়ের বাটির রগগুলো শক্ত হয়ে ওঠে। ডান পায়ের ওপর ভর দেয়া, বাঁ পায়ের হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত একটা খাঁজে আটকানো, সেদিকে শরীরটা ঝুঁকে আছে। পাড়ের কানা ধরে থাকা আঙুলগুলো খানিকটা আলগা হতে টুলটুলি প্রথমে ডান হাতটার আঙুলগুলো শিথিল করে, কারণ শরীরটা বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ায় ডান হাতটাতেই টান পড়েছিল। হাতটা শিথিল করলেও কানাটা ধরেই থাকে। শিথিল হাতটা মাথার ওপরে সেই মাটির কানায় থিরথির করে কেঁপে উঠতেই চট করে টুলটুলি আবার কানাটা চেপে ধরে কিন্তু তারপরই বোঝে, হাতটা কাঁপছে। খুব ধীরে-ধীরে টুলটুলি ডান হাতটা পাড়ের মাথা থেকে নামিয়ে আনে। তারপর শরীরের পাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিতে-দিতে টুলটুলি অনুভব করতে পারে এতক্ষণ এই হাতটার ওপর রাখা শরীরের ওজনের চাপ হাতটার শিরা উপশিরা ও পেশি থেকে সরে যাচ্ছে।

মাটির পাড়ের সঙ্গে উপুড় হয়ে সেঁটে থাকার একটা অবস্থায় আসার পর, এখন টুলটুলি চেষ্টা করে চিত হতে, যাতে মাটির পাড়ের গায়ে বুক মুখ নয়, পিঠ লাগিয়ে সে দাঁড়াতে পারে। পাড়ের সঙ্গে টুলটুলি এমনভাবে সাঁটা যে তার ডান গালটা মাটিতে লেগে থাকে। সুতরাং ঘাড় ঘোরানো যায় না। ঘাড় না-ঘুরিয়েই ডান হাতটা বাড়িয়ে মাটি আঁচড়ে-আঁচড়ে সে একটা গর্তমত খুঁড়তে থাকে, যাতে ডান হাত দিয়ে সেই গর্তটা আঁকড়াতে পারে। আঙুলগুলো মাটির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে সে খুব জোরে খুঁড়তে পারে না—মাটি খোঁড়ার ঝোঁকে সে শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে পাড়ের গা থেকে খসে পড়তে পারে। আঙুল বেঁকিয়ে ধরা যায় এমন একটা গর্ত খোঁড়া হলে টুলটুলি একটু টেনে দেখতে চায় মাটি খসে যায় কিনা, কিন্তু এত বেশি জোর দিতে পারে না যাতে সেই জোরের বিপরীত ধাক্কা হাত থেকে শরীরে এসে লাগে।

ডান হাত দিয়ে সেই গর্ত আঁকড়ে, ডান পায়ের ওপর ভর রেখে, বাঁ হাতটার

ওপর শরীরটাকে ঝুলিয়ে টুলটুলি বাঁ-পা-টাকে সেই লম্বা খাঁজ থেকে তুলে আনে। পাড়ের কানা ধরে মাথার ওপরে বাঁ হাত, মাথাটা বাঁয়ে হেলে সেই বাহুতে লেগে আছে, ডান হাত পাশে মাটির গায়ের গর্ত আঁকড়ে আনুভূমিক, শরীরের কোনো অঙ্গ বেঁকে নেই, সব অঙ্গ টানটান, শুধু বাঁ-পা টা সম্পূর্ণ মুক্ত। ফলে, পরস্পর ছেদক বিরাট শিকড়ের আকার বদলে টুলটুলিকে বাঁ থেকে ডাইনে কোনাকুনি উড্ডীন দেখায়। বাঁ পা-টাকে ডান পায়ের পাশে নিয়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে টুলটুলি ডান হাতটা গর্ত থেকে খুলে চিত হয়ে যায়, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সমস্ত শরীরটা পাড়ের কানা-ধরা বাঁ হাতটার ওপর সবটুকু ভর রাখে। তারপরই টুলটুলি ডান হাতে সেই খাড়া খাঁজটা জোর কব্জায় ধরে ফেলে। ডান পা যেখানে ছিল সেই গর্তটার ভেতর বাঁ পা-টা ঢুকে যায় আর ডান পা সহ শরীরটা খাড়া খাঁজে আটকে পড়ে। এখন টুলটুলি পাড়ে পিঠ দিয়ে মুখটা বাইরে রেখে দাঁড়াতে পারে। খাঁজটার ভেতর কোমরের ভর থাকায় ডান পা-টা দিয়ে মাটি ঘসে-ঘসে ফেলে গোড়ালি রাখার মত একটা জায়গা বানিয়ে নেয়। একটু নড়ে-চড়ে নিজেকে ভাল মত দাঁড় করিয়ে টুলটুলি মাথার ওপর থেকে বাঁ হাতটা ধীরে-ধীরে নামায়। বাঁ হাতটার ওপর এত টান পড়েছে যে এখন কনুই বাঁকানোর সময় রগটা টনটন করে ওঠে। বাঁ হাতটা ভাঁজ করে বুকের কাছে তোলার পর টুলটুলি সেই খাড়া খাঁজ থেকে ডান হাতটা ধীরে-ধীরে তুলে আনতে পারে।

এতক্ষণে টুলটুলির শরীর খাঁজে আটকা আর দুই পায়ে খাড়া। মুক্ত দুই হাত দিয়ে এখন টুলটুলি পাড়ের ভেতর শিকড়, কন্দ, কচু, বুনো আলু খুঁজে-খুঁজে খুঁচিয়ে যেতে পারে। যে পাড় বেয়ে কেউ নামে নি, এত খাড়া সেই পাড়টি দিয়ে এত কশরত করে টুলটুলির নামার উদ্দেশ্য ত একটিই, যেখান দিয়ে কেউ কখনো নামে নি, নদীর সেই পাড় দিয়ে কোনো-রকমে নামতে পারলে কচু হোক, ওল হোক, কন্দ, বুনো আলু, মিষ্টি আলু, কেশর, বুনো মূলো—কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবেই।

কিন্তু তিন দিনের বাসি ও আগামী ক-দিনের অনিশ্চিত ক্ষুধার এই শরীর নিয়ে এই নদীর পাড়ে ঝুলে-ঝুলে উপুড়-চিত হওয়ার এত কশরতের পর খুব অপ্রস্তুত হাঁফ ধরে। টুলটুলি জোরে-জোরে ক-বার নিশ্বাস নেয়, যেন এখানে এ-রকম হাঁফ ধরার কথা ছিল না। তারপর, এতটা শারীরিক শ্রমে ও উত্তেজনায় জলজলে দুই চোখ দিয়ে মাটির দেয়ালটা খুঁজতে থাকে, কোথাও কোনো কচু কন্দের আগ, বা গোড়া বেরিয়ে আছে কি না।

যেখানেই দেখে গোছামত শিকড় বেরিয়ে, সেখানেই টুলটুলি আঙুল দিয়ে খোঁচায়। বেশির ভাগই বুনো গাছগাছড়া। আঙুল দিয়ে খোঁচানোর পর যদি সন্দেহ হয় ভেতরে অন্য কিছু থাকতে পারে, টুলটুলি ডালপালা ধরে টানে। বেরিয়ে এল ত এল। নইলে ফোতার ওপর থেকে একটা ছোট্ট ছুরি মত বের করে টুলটুলি মাটিটা আলগিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু সব শিকড় ধরে টুলটুলি টানে না, সব গাছের ডালপালা টুলটুলি টেনে-টেনে দেখে না। চোখ দিয়ে সে দেয়ালটা তন্ন-তন্ন যাচাই করে। চোখ দিয়ে দেখে যেটাকে সন্দেহ হয় সেটাকে আরো খানিকটা দেখে, যেন সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলেই গাছটার মাটির ভেতরের অংশটা টুলটুলির চোখের সামনে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। গত ক-মাসের অনির্দিষ্ট ক্ষুধা আর ক্ষুণ্নিবৃত্তি, গত তিন দিনের পরিপূর্ণ অনাহার, আর আগামী ক-দিনের নিশ্চিত উপবাস কি টুলটুলির ভেতরে কোনো অন্তর্জ্যোতির জন্ম দেয় যার ফলে সে শুধু বাইরের চেহারা দেখে বুঝে যায়, এই ডালপালার ভেতরে, এই শিকড়বাকড়ের ভেতরে, মাটির নীচে কোথায় কোনো এমন খাদ্য আছে কি না যা মাটি উপড়ে তুলে আনলে তার বা তার বাচ্চাদের ক্ষুধার কিছু-কিছু অংশ মেটাতে পারে। যত কম সময়ের জন্যই হোক, মিটতে পারে।

একটা শুকনো কাঠির মত ডাল ধরে টান দিলে কিছু মাটিসহ ডালটা উঠে আসে। গর্তটার ভেতর শাদা মত দেখা যায়। আঙুল দিয়ে গর্তটার মাটি আরো খানিকটা ঝরিয়ে দিলে সেই শাদা রঙের চারপাশে পাতলা রঙ দেখা যায়—কাশুরা হবা পারে। আঙুল দিয়ে মাটিগুলো আরো ঝরিয়ে দিলেও গর্তটা খুব বেশি বড় হয় না। শেষে ফোতার ভেতর থেকে ছুরিটা বের করে গর্তটা খুঁড়তে থাকে। শরীরের ভার সামলানোর জন্য খুব জোরে টুলটুলি গর্ত খুঁড়তে পারে না। বেশি জোরে খোঁড়ার জন্য তাকে যে-ঝোঁকটা দিতে হবে তাতেই সে টলে পড়ে যেতে পারে। ছুরিটা মাটির ভেতরে ঢোকাচ্ছে, বের করে আনার সময় ছোট-ছোট মাটির টুকরো ঝরে পড়ছে। সেই পাতলা রঙের বৃত্ত আর-একটু বড় দেখায়—ওন্দাকচু হবা পারে। আবার কোনোবার ছুরিটা তুলে আনলেও কোনো মাটি খসে পড়ে না। তখন আঙুল দিয়ে মাটিটা ঝরিয়ে দিয়ে আবার ছুরিটা মারতে হয়—

কাশুরা হবায় আর লাভ কী। প্যাট তো ভরিবে না। মুখত দিয়া অস্ (রস) খাইয়া ছুবরাটা ফেলি দিবার নাগিবে। তিন দিনের বাসি খিধা কি আর কাশুরার অসে মিটিবার পারে? কাশুরার ছুবরাটা তো গিলা না যায়—শুধা খড়খড়া। গিলা গেইলে তো ছুবরাটা দিয়া পেট ভরি যাইত। আর কাশুরা,

কত বড় কাশুরা হবা পারে ? সেই কাশুরাতে কত 'অস' ধরিবার পারে ? আর না-খাউয়াইয়া মুখ হছে এতগুলান।

কোদালের একটা বা দুটো ঘায়ে মাটির চাঙারের সঙ্গে যেটার উঠে আসার কথা, সেটাকে মাটির ভেতর থেকে তুলে আনতে একটা হাতের কয়েকটা আঙুল আর একটা ছোট ছুরি দিয়ে গর্ত খুঁড়েই চলেছে টুলটুলি। এখন সেই ঘিয়ে রঙের বৃত্তের ওপরের দিকটা থেকে মাটি খসে পড়ছে। কিন্তু পুরোটা এখনো বেরয় নি। যত বেরচ্ছে না, টুলটুলি ততই খুশি। এটা আগা না গোড়া বোঝা যাচ্ছে না। যদি আগা-ই এত মোটা হয়, তাহলে গোড়াটা ত আরো কত বড়, কত বড়, সামান্য একটা ছুরি আর আঙুল দিয়ে এত মাটি কতক্ষণ ধরে সরিয়েই যাবে টুলটুলি, আর কতক্ষণ পর এই সমস্ত মাটিজোড়া বিরাট গোড়াটা নিয়ে সেই মস্ত ওন্দাকচু বা বুনো আলুটা বেরিয়ে আসবে ? এত বড় যে সেটা বাড়ি বয়ে নিয়ে যেতে কতবার না জানি ঘাড় থেকে নামিয়ে-নামিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে আর শেষে হয়রান হয়ে সারা মুখ ঘামে ভিজিয়ে বাড়ি পৌছবে, দুপুরে, বিকেলে, নাকি সন্ধ্যায়—

বুনা আলু বা ওন্দা কচু এত বড় হবা ধরিলে এই একোটা দিয়া ত হামরালা তিনজন পুরা মানষির আধপেটা আর তিন বাচ্চার একবেলা পুরা পেটা আর একবেলা আধপেটা হবা পারে। ঘরত নুন আছে, ঝালও কনেক-আধেক জুটিবার পারে। গিয়া গরম জলত সিদ্ধ করিবার ধরিলে, ধর কেনে, আলু হইলে ঘণ্টা আর কচু হইলে দুই ঘণ্টা নাগিবার পারে। কচু হইলে জলটা বারবার ফেলি দিবার নাগিবে। না-হয় ত গলা চুলকাবার ধরিবে। আর কচুসিদ্ধর জলখান ফেলি দিলে গরম জলের ধোঁয়ার গন্ধখান পাবার তানে ছাওয়া-ছোটর ঘর হুমরাইয়া পড়িবার ধরিবে। গরম জলের ধোঁয়ায় সিদ্ধ হইবার গন্ধ পাওয়া যাবার ধরিবে। ধোঁয়ার গন্ধত কাঁয় বুঝিবে ভাত সিদ্ধ হছে নাকি কচু সিদ্ধ হছে ?

ভেতরের জিনিশের ওপরটা এখন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওপরের মাটিটা খসিয়ে দিলে জিনিশটা ত বেরিয়ে আসবে না, নীচে লেগে থাকবে। তখন ত টুলটুলিকে দুটো হাত দিয়ে জিনিশটা টেনে বের করতে হবে। কিন্তু টুলটুলি যে-রকম দাঁড়িয়ে আছে তাতে তার পক্ষে ত আর দুই হাত দিয়ে জিনিশটা টেনে বের করা সম্ভব না। যদি পারত, যদি পারত টুলটুলি দুই হাতের একটা জোর হ্যাঁচকা টানে মাটির ভেতর থেকে জিনিশটাকে উৎপাটিত করে আনতে! যদি পারত! তা যখন পারছে না, পারা সম্ভব নয়, তখন

টুলটুলিকে নীচের মাটিটা সরাতে হয়, সেই ছুরি দিয়ে, আঙুল দিয়ে, একটু-একটু করে মাটি ঝরিয়ে-ঝরিয়ে। যত খুঁড়তে হয়, টুলটুলি তত তাড়াতাড়ি করে। যত দেরি হয়, টুলটুলি তত অস্থির হয়। যত অস্থির হয় টুলটুলির তত আশা হতে থাকে ভেতরের জিনিশটা অনেক বড় হয়ে আছে যেন, এত বড় যাতে তাদের পুরো পরিবার ধানকাটার দিন পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে প্রায়। টুলটুলি বুঝতে পারে না জিনিশটার শেষ পর্যন্ত সে খুঁড়ে ফেলেছে কিনা। গর্তের ভেতর হাত ঢুকিয়ে ছুরিটা দিয়ে ওপর দিকে একটু ঠেলা দিতেই, খানিকটা জমাট কালো মাটি ছিটকে এসে টুলটুলির কব্জির ওপর পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, টুলটুলি টালটা সামলে নিতে গেলে জিনিশটা গড়িয়ে নীচে পড়ে যায়, টুলটুলির পা কাঁপে আর বুক ধক করে ওঠে, তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে দুদিকের পাড় ধরে। একটু পরে নীচের দিকে তাকায়, জিনিশটা দেখতে পায় না। না পাক। নীচে নেমে ত দেখবেই।

টুলটুলি তার দুই হাতের সীমানার ভেতর পাড়ের গা-টা শেষবার তন্নতন্ন করে দেখে নেয়, যদি কিছু থাকে তুলে নেবে। এবার তাকে আবার এক ধাপ নামতে হবে। ছুরিটা ফোতার ভেতর গুঁজে রেখে দুই দিকের পাড় ধরে টুলটুলি একবার নীচের দিকে তাকায় কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে চোখটা তুলে নেয়, যেন তার চোখের পাতা যেটুকু নেমে এসেছে সেটুকুর ভারেই সে হুমড়ি খেয়ে হয়ত পাঁচ-ছ-মানুষ-সমান খাতে পড়ে যাবে।

পাড়ের গা খুঁজতে-খুঁজতে পাড় বেয়ে নীচে নামার মাত্র একটি উপায়ই ত এখন আছে। ডান দিকে হেলে খাঁজটার গায়ে ভর দিয়ে ডান পায়ের ওপর শরীরের ভার রেখে আভঙ্গ দাঁড়িয়ে ধীরে-ধীরে বসার চেষ্টা করা, যতটা সম্ভব, আর মুক্ত বাঁ পা টাকে, সোজা যতটা সম্ভব, নীচে নামিয়ে, কোথাও আটকে ওপর থেকে শরীরের ভারটা বাঁ পায়ের ওপর নামিয়ে নেমে আসা। এই পদ্ধতিতে টুলটুলি শরীরের ভঙ্গি বদলে-বদলে, দুই হাতে পাড়ের গা ধরে সামলে-সামলে যখন খানিকটা নীচে নতুন জায়গায় দাঁড়াতে পারে—দুই চোখ সরু করে পাড়ের গা তন্নতন্ন খোঁজার বদলে, দুই চোখ বুঁজে আসে, মাথাটা একটু হেলে পড়ে, গলার শিরাটা দবদবায় আর তেষ্টা পায়। টুলটুলি খুব আস্তে-আস্তে একটা ঢোঁক গিলতে থাকে—আঠালো লালায় চেটচেটে আর কাঁটা-কাঁটা সেই ঢোঁকটা টুলটুলির শুকনো গলায় আটকে যায়। সাঁ-সাঁ খালি পেটে নিরেট বাতাসের সেই ঢোঁকটা গিলে ফেলতে, চোখমুখ কুঁচকে টুলটুলিকে মাথাটা সোজা করে চোখটা বুঁজে ফেলতে হয়।

চোখ খুললে পাড়ের গায়ে একটা ছোট লতায় টুলটুলির চোখ পড়ে। একটা লতা। ঘাসের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছে। খানিকটা পরে সোজা উঠেছে। পাতাগুলো ছোট-ছোট জোড়া-জোড়া। লতার রং খয়েরের মত। টুলটুলি সেই ছোট লতার দিকে হাত বাড়ায়। ব্যথা-ওঠার শিকড়। যে-পোয়াতির কিছুতেই ব্যথা উঠছে না, বা ব্যথা উঠলেও ব্যথা থাকছে না—সরে-সরে যাচ্ছে, এই লতার শিকড় বেটে খাওয়ালে তার নির্ঘাত ব্যথা উঠবে। টুলটুলি নেহাত স্বভাবের বশে হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর হাতটা নামিয়ে নিয়ে আসে, তার এখন ব্যথা-ওঠার শিকড় দিয়ে কী হবে। কিন্তু হাতটা গুটিয়ে নিয়েও আবার বাড়িয়ে দিতে হয় টুলটুলিকে—তারপর আঙুল দিয়ে-দিয়ে ঘাসের ভেতরে-ভেতরে লতাটাকে ধরে-ধরে শিকড়ে পৌঁছয়। ঘাসের গা থেকে লতাটা টুলটুলির হাতে উঠে আসে। ঘাসের গায়ে যেমন টুলটুলির হাতেও তেমনি লতিয়ে থাকে, যেন টুলটুলি এই পাড় আর ঘাসের মত এখানেই আছে আর লতাটা তাকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে উঠেছে। লতাটাকে ধরে-ধরে টুলটুলির হাত প্রায় তার নিজেরই ঘাড়ের কাছে এসে পৌঁছয়। সেখানেই শিকড়টা। একটুখানি লতা, মোটা ঘাসের গোড়ার চাইতেও সরু। আঙুল দিয়ে খুঁড়তে শিকড়টা উঠে আসে। শাদা ভেজা শিকড়। মাটি লেগে আছে। টুলটুলি শিকড়টার একটু ওপর থেকে খুব আস্তে দুই হাতের তর্জনী দিয়ে লতা থেকে শিকড়টাকে ছিঁড়ে নেয়, যেন তুলে নিচ্ছে। যে-লতার শিকড়টাই তুলে ছিঁড়ে নিল টুলটুলি, সেই লতাটাকে খুব মায়ার সঙ্গেই যেন সে পাড়ে আবার শুইয়ে দেয়, যেন ইচ্ছে করলে লতাটা আবার নিজের শিকড় নিজে গজিয়ে নিতে পারবে। তা পারুক আর না-পারুক, টুলটুলিকে ভক্তিভরে ত এ-শিকড় তুলতে হবে। এল, দেখল, ধরল, ছিঁড়ল এমন করে এ-শিকড় তুললে ত ফল হবে না। যে-শিকড় গর্ভের শিশুর ঘুম ভাঙাবে সে-শিকড় মায়া দিয়ে না-তুললে কি চলে, কাজ হয়? টুলটুলি সকালে স্নান করে নি ঠিকই, কিন্তু তার পেটে ত এক-সকালের নয়, তিন-তিনদিনের বাসি উপবাস। সেই খিদের তাড়নায় প্রথমে দেখেও সে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল আর সঙ্গে-সঙ্গেই তার মনে পড়ে যায়, দেখেও কেউ যদি এই শিকড় না তোলে তাহলে তার গর্ভকষ্ট হয়। টুলটুলির মোটে দুই ছেলে, এক মেয়ে। টুলটুলিরই কখন লাগবে বলা যায় না। লোকজনের ত লাগতেই পারে। দরকারের সময় ত মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যাবে না। শিকড়টা থেকে ধুলো আর মাটি আস্তে-আস্তে ঝেড়ে নিয়ে টুলটুলি ফোতার ভাঁজের ভেতর রেখে দিল।

BanglaBook.org

টুলটুলি দেখতে পায়, যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে সোজা এক লাইনে দূরে এক-থোকা পাতা, যেন পাতাগুলিরই শোভা, যেমন, কাঁটা-কাঠাল, আনারস, কিন্তু আসলে ওটা বোন্দা শিকড়ের ঝাড়। একটা গর্তের ভেতর গজিয়েছে বলে ওপর থেকে টুলটুলি দেখতে পায় নি, এখন নীচে নেমে আসায় নজরে পড়ে, গর্তের ভেতর থেকে পাতাগুলো বেরিয়ে পাড়ের ওপর ছড়িয়ে। পাতাগুলো খুব চওড়া আর মোটা। আর কলাপাতার উল্টোদিকের রঙের। বোন্দা শিকড় সাধারণত খুব মোটা হয়। এই বোন্দাটা কত মোটা টুলটুলি আন্দাজ পায় না।

—পাতাগিলা ত মোটাশিলা। মোটাশিলা পাতার গোড়ায় পাতলা কচুও হবা পারে, সব অস (রস) যদ্দি পাতা টানি নেয়। আর না হয় ত খু-উ-ব-ই মোটা কচু হবা পারে। য্যানং পাতা মোটা, স্যানং শিকড় মোটা।

আগে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে যেটা ফেলেছে সেটা কচু, না কেশর, না বুনো আলু দেখতে পায় নি টুলটুলি। কত মোটা তাও শেষ পর্যন্ত আন্দাজ করা যায় নি। যদি সেটাতে একবেলার খিদে মেটানো যেত তাহলে হয়ত কাল সকালে একটা বাতা বা বাঁশ এনে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে এটাকে পাড়া যেত। কিন্তু নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ঐ বোন্দাটাকে বাঁশ বা বাতার সীমানায় পাওয়া যায় বলেই ওটাকে এখুনি তোলা দরকার। নইলে আরো-কারো আজকের খিদের জন্যই এটার দরকার হতে পারে। আর এখন বোন্দাটাকে ছেড়ে নদীর পাড়ে নেমে গিয়ে যদি দেখে আগেরটা ছিল কেশর ? তাহলে, তখন কি আবার নীচে থেকে এই পাড় বেয়ে উঠে আসা সম্ভব ? কিন্তু টুলটুলি কী করে বোন্দা শিকড়টাকে হাতে পাবে। ওখানে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। ওপর থেকেই যদ্দি ওটা চোখে পড়ত, তাহলে হয়ত টুলটুলি এদিক দিয়ে না-নেমে ঐ বোন্দা শিকড়টার দিক থেকে নামতে চেষ্টা করত। চেষ্টা করলেই যে নামতে পারত এমন-কোনো কথা নেই। দু-পাশের অনেকখানি জায়গার ভেতর এই জায়গা দিয়ে গড়িয়ে পিছলিয়ে তাও নামা যাচ্ছে এই খাঁজটার দৌলতে। টুলটুলি পাড় বেয়ে ধীরে-ধীরে তার চোখ তোলে, একবারে নয়, একটু-একটু করে, যেন চোখটাও পাড় ভেঙে-ভেঙে উঠছে। টুলটুলি একেবারে পাড়ের মাথাটা দেখতে পায়—ভাঙা-ভাঙা রেখায় পাড়টা এগিয়ে গেছে। এত সিধে ওপর থেকে টুলটুলি এতটা নামল কী করে। এখানে মাটির গর্তের ভেতর থেকে টুলটুলি শুধু টলটলে নীল আকাশ দেখতে পায়, আর এক কোনায় একটা গাছের ঝাঁকড়া মাথা, যেন পাড়ের ওপরের সেই অশেষ ধানখেত থেকে টুলটুলি এখানে লুকিয়ে। সেই নীল আকাশ থেকে সেই গাছের ঝাঁকড়া মাথা, আবার নীল আকাশ,

ভাঙা-ভাঙা এবড়ো-খেবড়ো পাড়, পাড়ের গায়ে ঘাস, মাটি—টুলটুলির চোখ আবার নীচে নেমে আসে। আবার পাড়ের ওপরে ওঠে, ঐদিক থেকে কোনো খাঁজ খুঁজে-খুঁজে বোন্দা শিকড়টার কাছে নামা সম্ভব নয় আর। আর-এক হতে পারে—পাড়ের মাথা থেকে গোড়ালি ঠুকে-ঠুকে যে-গর্ত বানিয়ে-বানিয়ে নেমেছে, সেই গর্তে পা দিয়ে এক ধাপ ওপরে উঠে, তারপর সোজা বোন্দাটার কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা। টুলটুলি বাঁ হাত দিয়ে মাথার ওপরের সেই গর্তটা খোঁজে। পায় না। কিন্তু না-পেয়ে আর খোঁজে না। টুলটুলি বুঝে যায়, পাড়ের দিকে পেছন ফিরে দুই হাতের ওপর জোর দিয়ে ওপরে ওঠা শারীরিক-ভাবেই অসম্ভব। এমন-কি সেই চেষ্টাও করা যায় না। তখন টুলটুলি সেই খাতটার নীচের দিকেই তাকায়। পাড়টা নদীর কিনারায় গিয়ে মেশার আগে খানিকটা উঁচু থেকে একটু-একটু করে যে চওড়া হয়ে নেমেছে—পুরনো পাড় বলেই নীচের দিকটা চওড়া, নতুন পাড়ের নীচের দিকটাই থাকে—তার ওপর দাঁড়িয়ে, পাড়ের সঙ্গে শরীরটা লেপ্টে পা-পা করে সরে-সরে ঐ বোন্দা শিকড়টার নীচে কোথাও যাওয়া যায় কি ?

অত উঁচু পাড়ের মাঝামাঝি ও-রকম সেঁটে থেকে টুলটুলি নীচের সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে যতক্ষণ সময় যায়, ততক্ষণ সময় ধরে একটা কোনো জিনিশ নিয়ে ভাবার কোনো অভ্যেসই টুলটুলির নেই। বা টুলটুলিকে যখন এ-রকম কচু খোঁজার মত কাজে ঘুরে বেড়াতে হয় না, যখন তাকে চালভোখা, ধানভোখা, চিড়াভোখা এইসব গেরস্থালির কাজকর্ম করতে হয়, তখন একটা কাজ থেকে আর-একটা কাজে চলে যাওয়াটা এমন পূর্বনির্ধারিত আর সারাটা দিন আর রাত কাজে-কাজে এমন ভাগ-ভাগ করা যে একটা কাজ না-সেরে যেমন আর-একটা কাজে হাত দেয়া যায় না, তেমনি একটা কাজ থেকে আর-একটা অনিবার্য এসে যায়। ভেবে-ভেবে টুলটুলিকে কাজ থেকে কাজে যেতে হয় না বা একটা কাজে হাত দিয়েও টুলটুলিকে ভাবতে হয় না। টুলটুলির যা কাজ তা নিয়ে ভাবনা নেই, পায়ের কতটা ঝোঁকে ঢেঁকি ওঠে, পড়ে, বা, কুলোয় কটা টোকায় তুস ঝরে পড়ে, তা নিয়ে আর টুলটুলি ভাববে কী। সে সব ত টুলটুলির হাত-পায়ের আঙুলের জানা। এখন যে টুলটুলিকে নীচের সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, সেটা ভাবনার জন্য নয়, টুলটুলিকে ওখানে নামতেই হবে, ও-ছাড়া উপায় নেই—যদি কচুটা পাওয়ার চেষ্টা করতে হয় আর কচুটা পাওয়া ছাড়া কোনো উপায় টুলটুলির হাতে বা ভাঁড়ারে নেই, আজও নেই, আগামী পাঁচ-সাত-দশদিন থাকবেও না, যতদিন ধানকাটা না হয়।

কিন্তু তবু যে টুলটুলিকে ও-রকম একটা অদ্ভুত জায়গায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, তার কারণ, তার দাঁড়ানোর জায়গা থেকে নীচের সেই একটু উঁচু মতন জায়গাটিতে পৌঁছবার জন্যে দরকারি শারীরিক উদ্যম সে পাচ্ছিল না। পেটে মদ পড়লে মাতালের যেমন সময়চেতনা ও চিন্তার সংগতি নষ্ট হতে থাকে, তেমনি গত তিন দিনের পুরো-পেট খিদে, আর তারও আগের ক-মাসের ধারাবাহিক খিদে, আর আগামী কয়েকদিনের নিশ্চিত খিদে টুলটুলির রক্তে সঞ্চারিত হচ্ছে, এখন, এই খাড়া পাড় বেয়ে পথ বানিয়ে-বানিয়ে নদীর পুরনো এই পাড়ের গা খুঁজে-খুঁজে নামতে-নামতে। টুলটুলির শরীরের ভেতর রক্তের প্রবহমাণতা কমে আসছে। টুলটুলির শরীরে এক-একটা-ভঙ্গি বা একটা ভঙ্গি থেকে আরেকটা ভঙ্গিতে পরিবর্তন এখন অপেক্ষাকৃত বেশি সময় নিচ্ছে। দুই হাত দুই দিকে ঝুলিয়ে, দুই গর্তে দুই পা লাগিয়ে, মাটি থেকে তিন-চার মানুষ সমান উঁচুতে, পাড়ের একটা খাঁজে আটকে থেকে, টুলটুলি নীচে সেই উঁচুমতন জায়গাটার দিকে চোখ রেখে এমন অনড়, যেন টুলটুলি ঐ মাটির দেয়ালে দৃশ্য হিশেবে সাঁটা, বা মাটির ভেতর খোদা, বা মাটির ওপর উৎকীর্ণ – যেন তাকে নিয়ে মাটি ভেঙে পড়লেই সে নীচে পড়তে পারবে, নচেৎ নয়।

কিন্তু টুলটুলির শরীরের ভেতর রক্তের গতি কমে আসায় তার পেশি ও স্নায়ুতন্ত্রের গতিও কমে আসছিল। তাই নীচের ঐ জায়গাটা দেখে নিয়ে, সেখানে পৌঁছবার জন্য শারীরিক উদ্যম জোগাড় করতে তার খানিকটা সময় যায়। তারপর সেই মূর্তিটা নড়ে। ডান হাত দিয়ে খুব শক্ত করে খাঁজটা ধরে আর বাঁ হাতে পাড়ের গায়ে ভর দিয়ে ধীরে-ধীরে নিচু হয়ে, একটা পা নামিয়ে দিয়ে, গোড়ালি ঠুকে-ঠুকে মাটির গায়ে গর্ত করে-করে, পাড় বেয়ে নেমে আসার সেই পদ্ধতিতে টুলটুলি নামে বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে টুলটুলির মস্তিষ্কের যোগাযোগটা দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল বলে, পাড়ের দিকে পিছন ফিরে ঘসে-ঘসে নামতে-নামতেও টুলটুলির মনে হচ্ছিল তার নামার জন্য যেন ঠিক-ঠিক মাপের গর্ত ঠিক-ঠিক দূরত্বে খোঁড়াই আছে, তাকে কিছু করতে হচ্ছে না, শুধু নেমে যেতে হচ্ছে, তবে সে কেন ঘুরে গিয়ে পাড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে খাঁজটা ধরে-ধরে নেমে যাচ্ছে না, যেমন করে মই থেকে নামতে হয়? প্রশ্নটা ক্রমেই টুলটুলির ভেতরে এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে, সে যেন যে-কোনো মুহূর্তে ঘুরে যেতে পারত। সেই চওড়া জায়গাটায় পৌঁছে টুলটুলি একবার নীচের দিকে তাকায়, দেড়-দু-মানুষ উঁচু। টুলটুলি পাড়ের চওড়া অংশটাতে পা রাখে, ডান হাতটা দিয়ে পাড় ধরে। একটা পায়ের পাতার মাথাটুকু আঁটে না এতটুকু মাত্র

চওড়া জায়গাটিতে টুলটুলি এমন ভাবে পা রাখে যেন বোন্দা শিকড়টার কাছে পৌঁছনোর জন্যে কোনো সাবধানতা দরকার নয়। ধীরে-ধীরে টুলটুলির শরীরের ভেতর রক্তপ্রবাহ, পেশিপুঞ্জ ও স্নায়ুতন্ত্রীর শিথিলতা—ভয় পাওয়া না-পাওয়া, সাবধান হওয়া না-হওয়া ইত্যাদি মানসিক ব্যাপারগুলিকে অকেজো করে দিচ্ছিল। তার নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া না-নেয়া আর প্রয়োজনীয় থাকছিল না।

ঢালুটার ওপর পা দেয় বটে টুলটুলি, হাতটাও মাটির পাড়ের গায়ে রাখে, কিন্তু পর মুহূর্তেই তাকে বসে পড়তে হয়—জায়গাটার আয়তন এতই কম চওড়া যে দাঁড়িয়ে টুলটুলি নিজেকে সামলাতে পারবে না। টুলটুলিকে খুব বেকায়দায় বসে পড়তে হয়। ডান পা আর ডান হাত সেই ঢালু মত জায়গাটায়, বাঁ পা আর বাঁ হাত সমকোণে সেই খাড়া খাঁজে। টুলটুলি ধীরে-ধীরে প্রথমে বাঁ পা-টা সরিয়ে আনে, তারপর হাতটা।

এখন টুলটুলি সেই ঢালের মাথায় উবু হয়ে বসে, দুই পা দুই দিকে ছড়িয়ে, যাতে কোমর ও পেট ঢালের বিস্তারের ভেতর থাকে। যদি কোমর আর পাছা ঢালের বাইরের শূন্যতায় বেশির ভাগটা চলে যায় তাহলে টুলটুলি নিশ্চিতই পড়ে যাবে। উবু হয়ে বসলে সাধারণত হাতের ভেতরে হাঁটু দুটো থাকে। কিন্তু কোমরটাকে এগিয়ে আনার জন্য হাঁটু দুটো ছড়িয়ে দিতে হয়েছে আর সেই হাঁটুর ভেতর থেকে হাত দুটো মাথার ওপর উপর উঠে মাটির দেয়ালের গায়ে পাঁচ-পাঁচ দশ আঙুল ছড়িয়ে। টুলটুলির বাঁ গালটা পর্যন্ত মাটির দেয়ালের সঙ্গে লাগানো। মাথার ওপরের সেই হাত আর ঢালের ওপর রাখা পা, এক-এক সময় এক-একটার ওপর থেকে ভার সরিয়ে, অন্য কোথাও নিয়ে, আবার সেখান থেকে ভারটা অন্য জায়গায় সরিয়ে, টুলটুলি একটু-একটু করে এগয়। কখনো তার ডান হাতের আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতন বেঁকে যায়, তখন বাঁ হাত আর ডান পা-টা একটু শিথিল হয়ে সরে যায়। পরমুহূর্তে আবার বাঁ হাত আর ডান পা মাটি আঁকড়ে ধরে, তখন ডান হাত আর বাঁ পা একটু সরে যায়। এইভাবে মাটির সঙ্গে হেঁচড়ে-হেঁচড়ে সেই বোন্দা শিকড়ের নিচে টুলটুলি নিজেকে থামাতে পারে। মাথার ওপর খাড়া দুই হাতের তেলোতে পাড়ের গা-টা খুব চেপে কোমরটা টুলটুলি খুব ধীরে-ধীরে তুলতে চেষ্টা করে। ডান কব্জির ওপর থেকে ঝুরঝুর মাটি ঝরে পড়লেও টুলটুলি কোমরটা একটু তুলতে পারে। কোমরটা তোলার সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটুদুটো আরো ফাঁক করে দিয়ে কোমরটা আর পাছাটাকে ভেতরে রাখতে হচ্ছে। টুলটুলির তলপেটটা পাড়ের সঙ্গে লাগানো বা প্রায় লাগানো থাকে, দুই মাইয়ের বাধা সত্ত্বেও। সোজা খাড়া দাঁড়ায়

boiboi.net

টুলটুলি, দুই হাঁটু ফাঁক—আর বেশি ফাঁক সম্ভব নয়, মাথার ওপর খাড়া দুই হাত ফাঁক—বেশি ফাঁক আর সম্ভব নয়। এই অবস্থায় টুলটুলিকে আরো-কিছুটা ওপরে উঠে বোন্দা শিকড়ের গোছাটা ধরতে হবে। টুলটুলি বাঁ পা-টা দিয়ে পাড় আঁচড়ায়, কোনোখানে যদি পায়ের আঙুলের ভর রাখার জায়গা পাওয়া যায়। তারপর হঠাৎ টুলটুলি তার সেই বাঁ পায়ের ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে একটানে ওপরে তোলে আর বাঁ পায়ের তলা থেকে মাটি ঝরঝর খসে যায়, টুলটুলির সমস্ত শরীরটা ডান দিকে আছড়ে পড়ে আর সেই আছড়ে পড়ার সময় নিজের উৎক্ষিপ্ত হাতদুটো দিয়ে টুলটুলি বোন্দা শিকড়ের পাতার ঝাড়টাকে আঁকড়ে ধরে। পাতার ঝাড়ে পড়্ পড়্ আওয়াজ ওঠে। ডান পা-টাকে একটা জায়গায় আঁচড়ে-আঁচড়ে আটকে বাঁ-পা-টাকে টুলটুলি জায়গায় নিয়ে আসার চেষ্টা করে। মনে হয়, টুলটুলি এখন শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বোন্দা শিকড়টাকে মাটির ভেতর থেকে তুলে এনে এই দেড়-দু-মানুষ সমান উচ্চতা গড়িয়ে পড়ে যেতে চায়। কিন্তু বাঁ পায়ের আঙুলগুলো পাড়ে গাঁথতে পারলে বোন্দা শিকড়ের ওপর দুই হাতের টান একটু শিথিল হয় আর টুলটুলি টের পায় তার ফোতাটা খুলে যাচ্ছে। খুলে, বাঁ-বুক থেকে খসে গিয়ে কোমর পর্যন্ত ঝুলে পড়ে, এমন ভাবে যাতে ফোতাটা পেটের কাছে পাঁজা হয়ে যায়, ফলে সমস্ত শরীর দিয়ে টুলটুলি মাটিটা আঁকড়াতে পারে না। আবার দুই হাতে ভর দিয়ে টুলটুলি পেছন থেকে কোমরটা উঁচু করে, যাতে ফোতাটা পড়ে যায়। তখন বাতাস ছিল না। মাটির দেয়ালের গা বেয়ে গড়িয়ে মাটির দেয়ালের লম্বালম্বি ফোতাটা এমন এলোমেলো ছড়িয়ে লেগে থাকে যেন এইমাত্র বসন ত্যাগ করে টুলটুলি বোন্দার ঝাড়ে ঝুলে মাটির দেয়ালের গায়ে খোদিত মূর্তি হয়ে আছে। দলিতস্তন, বাহুসন্ধির অবকাশে পিষ্ট স্তনতা, উরুর বিস্ফারে নিতম্বের সংক্ষিপ্ততা, বাহুর উৎক্ষেপে কাঁধের লুপ্ত বর্তুলতা, আর মাটির দেয়ালে প্রকীর্ণ সমকোণে দক্ষিণাস্য সেই মূর্তি, সারা শরীরের আক্ষেপে রেখায়-রেখায় চলৎমূর্তি রচে-রচে, অবশেষে উৎপাটিত বোন্দা শিকড় নিয়ে, ধ্বংসস্তূপের ধারাবাহিক বেগে, দেড়-মানুষ দু-মানুষ নীচে তালমানদীর পাড়ে খান খান ভেঙে পড়তে থাকে।

টুলটুলির সারা শরীরে একটা প্রবল ঝাঁকি লাগে বটে কিন্তু মাটিটা নরম ঝুরঝুরে থাকায় কোনো বিশেষ জায়গায় ব্যথা লাগে না। পড়ে গিয়েছে টুলটুলি, কোথাও ব্যথা লাগল কি লাগল না সেটাও বুঝে ওঠার আগে দাঁড়িয়ে উঠে, হাত বাড়িয়ে, পাড়ের গা থেকে কাপড়টা টেনে নিয়ে, তাড়াতাড়ি গায়ে ফোতাটা

boiRboi.net

বেঁধে নিতে গিয়ে দেখে প্রসববথা ওঠার শিকড়টা সুতোর মত ফোতায় সেঁটে আছে। শিকড়টা ভেতরে রেখে ফোতার গিঁটটা দিতে-দিতেই নিচু হয়ে টুলটুলি প্রথমে মাটিতে ফেলা সেই মূলটা তোলে, তারপর বোন্দা শিকড়টা—ঝুড়িটা উপুড় হয়ে ছিল, সেটাকে সোজা করে টুলটুলি কেশর আর কচুটা তার ভেতর রাখে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সামনে নদীর পাড় টুলটুলির চোখের সামনে দুলে ওঠে, তারপরই টুলটুলি আকাশ দেখতে পায় আর চোখের সামনে সব কিছু ঘুরতে থাকলে টুলটুলি সঙ্গে-সঙ্গে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে পড়ে। দু হাতে মাথা ধরেও টুলটুলি চারপাশের ঘূর্ণি বন্ধ করতে না-পেরে পাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে চোখদুটো বুঁজে ফেলে। চোখ বন্ধ করার পরও টুলটুলির মনে হয় সে যেন চোখ বন্ধ করে নি, তার চোখের পাতাটা যেন পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা, তার ওপর হলদেটে রোদ। টুলটুলির চোখের পাতাটা একটু ফাঁক হয়, সামনে নদীর জল, ওপারে ধানখেত, সব কিছু যেন কার্তিকের হিমের পর্দার আড়ালে। টুলটুলি আবার চোখ বন্ধ করে আর বন্ধ চোখের ওপরও যেন কার্তিকের হিমের পর্দা কাঁপে। টুলটুলিকে একটা খুব জোরে নিশ্বাস টানতে হয়, এত জোরে যে তার ভেতরে ঢোকা পেটটা আরো ভেতরে ঢুকে যায়, যেন নিশ্বাস নেয়া তার শেষই হত না যদি নিশ্বাস নেয়ার দম তার ফুরিয়ে না যেত, যদি আরো ভেতরে ঢোকার মত জায়গা তার পেটের থাকত—

সাতদিন বাদে কুসু-কুসু খ্যাতত্ ধান পাকিবার পারে, খ্যাতখ্যাতুর জমিত্ না-ও পারে পাকিবার, একটা কুনো খ্যাতত্ ধান কাটিবার ধরিলেই যেন ভোখটা কনেক কমিবার পারে। দশদিনের বাদে ধান ভোখাবার পারি। অঘনে পেটি, পুষে চেউটি, মাঘে নারা, ফাগুনে কাড়া। অঘনে ধান কাটিবার ধরিলে ষোল আনা ধান, পুষমাসত বারআনি, মাঘত চার আনি ধান আর বারআনি পোয়াল, ফাগুনত পুরাটাই পোয়াল। এ্যালায় সারা খ্যাতত্ একটা মানষি নাই, মুই এইঠে একা-একা মরি যাছু, নদীপাড়ত মরি যাছু, মোর এই কচুবোন্দাখান আর ঘরত পৌছিবে না। আর মোটে সাতদিন আর দশদিনের বাদে সারা খ্যাতত্ শুধু মানষির মাথা, মানষির হাত, মানষির ভিড়।

মাথাটা ডান দিকে হেলে পড়ায় মাটির দেয়ালে হেলান দেয়া টুলটুলির শরীরটাই ডান দিকে হেলা, ডান হাতটা তেলো উল্টিয়ে সামনে মেলে ধরা, যেন বহু ওপরের আকাশ থেকে হাতটার ওপর আশীর্বাদ বৃষ্টি হবে। নীলাকাশের নীচে আরো একটা আকাশ টুলটুলির ওপরে—পাকা ধানখেতের সোনালি

আকাশ।

কখনো-বা টুলটুলির চোখ খোলা, কখনো বন্ধ, কিন্তু সব সময়ই তার চোখের সামনে কার্তিকের হিমের জালি পর্দা কাঁপে—

যেন ভোর হবার ধইচ্‌ছে, আতির আন্‌ধার সরি-সরি যাছে, এ্যালায় চারহো পাখ টলটলাসে, পুবত নাল টকটকি বোলখান আসি খাড়াইছে—যেন পুনিমার চাঁন্দ এ্যানং গোল, আর আকাশত যতলা মেঘ উমরার পাখত নাল ছটা নাগিছে, উত্তর পাখত যেইলা পাহাড়, পাহাড়ের মাথত বরফের টিপ, বরফের টিপত নাল অং গলিগলি যাছে, গলি গিয়া সোনার নাখান হলদিয়া হবে। পশ্চিমপাখে তালমা নদী বহি যাছে, এইটায় জল পরথম্‌ আলোতে টলটলাছে, কনেক জায়গায় হলদিয়া ছিটা, মাছ খিলখিলাছে—

টুলটুলির চোখের সামনে সত্যি তালমা নদী, সত্যি জল, সত্যি টলটলায়। তার চোখের পাপড়িগুলো বোধহয় জড়ানো, তাই সেই সত্য নদী আর সত্য জলের ওপরও কার্তিকের হিমের পর্দা কাঁপে। সেই পর্দায় কার্তিকের-অঘ্রানের একটা পুরাপেটি সকালের রঙের খেলা। এই তালমা নদী যখন সত্য, সেই রঙের খেলাও তখন সত্য। আর, সেই রঙের খেলা যদি সত্য, তাহলে টুলটুলির পেটটা যে পুরা, ভরা—প্যাটত যে কুন্‌ ভোক্‌ নাই, এক ফোঁটাও ভোক্‌ নাই, এটাও সত্য—প্যাট পুরা না থাকিলে কি কায়ও অঙের খেলা দেখিবার পারে? টুলটুলি কার্তিকের অঘ্রানের রঙময়, সুতরাং পেটভরা, সকালে চলে যায়, যখন, ধানখেতত্‌ আলো আসে আর মানষি আসে, হামাক্‌ এ্যানং নদীর চরে একা-একা মরিবার নাগিবে না। বেলা ঠাকুর উঠিবার আগত উঠি গোবরিয়া ঘোল আর নেথানি নিয়া তামান এগিনা (আঙিনা), চুলা, গোহালিয়া, ছানচাবাড়ি মুছি ফেলিবার নাগিবে। তামান্‌ বাড়িটা শুদ্ধ করিবার নাগিবে। সারাদিন ধরি ধান সিদ্ধ হবে, শুখা হবে, ভোখা হবে। ঘর অশুদ্ধ থাকিলে ধান জাই (নষ্ট) হয়া যাবে। চুয়াপাড়ত গিয়া ঢলঢল করি সব্ব অঙ্গে জল ঢালি স্নান করিবার নাগিবে, কুনো অঙ্গ অশুদ্ধ রাখিলে ধান জাই হয়া যাবে। তারপর আসি ভক্তি দিয়া চুলাত্‌ আগুন দিবার লাগিবে। মাটির বড় হাঁড়িত জল তুলি দিবার নাগিবে। জলের উপর আগত ভিজান ধান ছাড়ি দিবার নাগিবে। জলখান গরম হইবে, ধানখান গরম হইবে, এগিনাখান গরম হইবে, এগিনা শুখা হইবে, এগিনাত ধান ঢালি দিবার নাগিবে। তামান্‌ দিন অ্যানং করি ধানসিদ্ধ আর ধানশুখা, ধানসিদ্ধ আর ধানশুখা। খোয়ার তানে হালুয়ার ঘরের আসিবার টাইম হয়। হালুয়ার ঘর আসিলে—ছোয়াপোকার ঘর, হালুয়ার ঘর আর

চ্যারকেটুখান পান্তা নিয়া, খোকরা নিয়া এগিনাত খোয়ায় বসিবে। খোয়া হওয়ার বাদে হালুয়ার ঘর আর চ্যারকেটু চ্যাটং-চ্যাটং করি তামাকু টানি খেতত্ ফিরি যায়। হালুয়ার ঘর চলি গেলে টুলটুলি খোয়ায় বসে, পান্তা থাকিলে পান্তা, খোকরা। খোয়ার বাদে কনেক তামাকু টানে। তামাকু শেষ হইল্ কি না-হইল্ ধানভোখা শুরু। আষাঢ়র বউ কি আসিন্দিরের বউ আসে আর সামগাইনে ধান ভাঙে। ধান ভোখছে তো ভোখছে, আর তুষ উড়ি উড়ি যাছে, বাতাসত ভাসি-ভাসি যাছে, উড়ে, ভাসে, ফাল্গুন চৈতে অঙ (রং) খেলার তানে আমের বোল যেইনং বাতাসত উড়ি বেড়ায়, সেইনং তুষ উড়ি বেড়াছে, ঝুরঝুর করি ঘাড়ৎ, গলাৎ, মাথাৎ পড়ছে আর সুরসুরাছে, আর হাসি পাছে, তুষের জ্বালায় ভাল করি চাওয়া না যায়, চক্ষু ঢাকা দিবার নাগে আর ঢাকা চক্ষুতে সারা শরীর হিলহিল করি হাসিবার ধরে। সামগাইনে ধান ভোখাইতে-ভোখাইতে ঘাম ধরে, ঘাম ছাড়ে, মুখ সপ্‌সপা, ঘাড় সপ্‌সপা, বুক সপ্‌সপা, আর তুষ আসি উড়ি-উড়ি যেইখানটায় খালি অঙ্গ পায় সেইখানটায় বসি যায় আর শরীর সুরসুরায় আর হাসি পায়। তুষের হাসি আর তুষের আগুনের শ্যাষ নাই। আর সামগাইনে ধান ভোখাইতে মাঝে-মাঝে শুখাবার ধান পা দিয়া নাড়া দিবার নাগে। একবার বাঁ পা দিয়া টানো ডাইনে। আরেকবার ডাইনে পা দিয়া টানো বাঁয়ে। তারপর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে মারি ডাইন পায়ের ধান ঝারো। তারপর মাটিতে আসি দুই পায়ের ধান ঝারো। আবার ধান পাছুবার নাগে। ভোখা ধান কুলাত করি মাথার উপর ধরো আর ঝাঁকাও। সারা শরীর ঝাঁকে, কুলা-ও ঝাঁকে। তবে-না চাল সাফা হবা ধরে? কত নাচ নাচাবার ধরে এক ধান। তারপর ভাটিবেলায় খ্যাতত্ ছুটি যাবার নাগে। টুলটুলির ত আর গরুর গাড়ি নাই রো, আঁটি-আঁটি ধান মাথাত্ করি আনিবার নাগে। আঁটির পর আঁটি ধানে মাথাখান পর্বতের সমান করি ধানকাটা মাঠ দিয়া, হেই ধানকাটা গোড়াগুলির উপর পা দিয়া, হেই তামান্ মাঠখান পাড়ি দিয়া টুলটুলি ঘর চলিবার ধইচছে, ধানের আঁটির ভারত্ টুলটুলির শরীরখান ছকলবকল করে। আর সেইলায় বেলাঠাকুর অস্ত যাছেন। পচ্ছিম পাথের মেঘত্ আগুন ধরিছে কিবা এ্যানং দাউ-দাউ লাল। ধানের আঁটিত্ মুখচোখ ঢাকা, টুলটুলি বেলাঠাকুরক ভক্তি দিবার না পারে। কিন্তুক অস্ত যাছেন বেলাঠাকুর আর আগুনের মত টকটকা, আগুনখানের নাগান অঙ (রং) আনি টুলটুলির মুখত্, গলাত্ মাখি দিবার ধরসেন। টুলটুলির তানে বেলাঠাকুর অঙ খেলিবার ধরিসেন। সেই অঙ মুখত মাখি, আঁটি-আঁটি ধান

মাথায় নিয়া ধানের গোড়া মাড়াইয়া মাঠ-মাঠ পার হবার ধরিলে টুলটুলির গলাত্ গান আসিবার ধরে,

আয়না কিনার বায়না দিলাম, জলপাইগুড়ি শহরে
কাঁকই কিনা হইল না,

ধানের আঁটিত্ চাপা খাওয়া টুলটুলি আপন মনত হাসিবার ধরে, কায় আর দেখিবার যাছে হে,

ছোট্হ দাদা মোর বড় দাদাহ্,
অ, তর তানে নাগাল পাহু গে, মাঝ হাটতে,···
এক হালা মোক সস্তরা কিনি দে

আর দিন-সাত-দশের বাদে হালুয়ার ঘরনির আর শ্বাস ফেলিবার সময় থাকিবে না, ক্যানং করি আতি (রাত) পোহাইবে আর ক্যানং করি আতি আসিবে তা টেরও পোয়া না যাবে। কিন্তুক অ্যালায়, মরণকালে পরমাত্মা য্যানং নতুন দেহখান ধরিবার তানে পুরান্ দেহখান্ ছাড়ি দিয়া যাছেন, স্যানং এ্যালায় হেই তালমার পাড়ত্ তিনদিনের বাসি আর আট-দশদিনের আসিবা-ভোখত্ কাতর এই টুলটুলির দেহখান্ ছাড়ি দিয়া ঐলা ধানভোখা আর ধানশুখার নাচানি, ধান পাঁজির চং, গাইনখান্ মাথার উপর তুলিবার চক, ধান নাড়ি দিয়া পা-খান্ ঝাড়া, ধানের গোছা মাথাত্ করি ঘরত্ ফিরি আসা—সেই সগ্ চং-চক টুলটুলিক ছাড়ি চলি যাছে। কিন্তু অ্যালায় নিচ্চয় করি কহা যায়, টুলটুলি বাঁচুক আর মরুক আর সাতদিনের দশদিনের বাদে তামান্ জায়গায় এই কাজকামের চং-চক শুরু হবা পারিবে। আর টুলটুলি অ্যালায় তালমা নদীর পাড়ত মুচ্ছা যাছে,

টুলটুলি চোখটা খোলে কি খোলে না, তার চোখের পাতার পাপড়ি বোধ হয় জড়ানো, তাই হিমেল পর্দার ভেতর দিয়ে দেখে সামনে সত্যি নদী, সত্যি জল, সত্যি টলটলায়। এই নদীর জলে নেমে এখন তাকে মাছ ধরতে হবে। মাছ ধরে-ধরে ভাটিতে আর-এক কচুবনের দিকে চলে যেতে হবে। টুলটুলি এ-সব দেখলেও, ভাবলেও, একটুও নড়তে পারে না, তার এটা খেয়ালও হয় না সে কতক্ষণ এমন পড়ে আছে, বোধহয় তার চোখের পাতাও নড়ে না।

ছপছপ একটা শব্দ শোনা যায়, খুব মৃদু।—কুকুর হবা পারে, নদী পার হছে। সেই ছপছপ শব্দের পিছে-পিছে একটা খুব পাতলা বুড়ি ভটি থেকে বাঁক ঘুরে জলের ভেতর এসে দাঁড়ায়। মাছ খুঁজছে। বুড়ির শরীরের চামড়া পেঁয়াজের খোসার মত ফুরফুরার, যেন হাওয়ায় উড়ে যাবে—সেই

পোড়া কালো চামড়াটা হাড়গুলোর ওপর এতই আলগা। একটা পাতলা ত্যানায় বুড়ির কোমরটুকু ঘেরা। সেই ত্যানারই অন্য অংশ, যেটা বুকে থাকার কথা, বুড়ি জলের ভেতর ধরছে। তালমা নদীর জলের স্রোতহীনতাও ঐটুকু ছেঁড়া ত্যানার ভেতর বেগ পায়। দুই হাতে মেলে ত্যানাটাকে জল থেকে তুললে ঝরঝর জল নদীতে পড়ে যায়। জলহীন শূন্য ত্যানার শূন্যতা বুঝতে-বুঝতে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুড়ি আবার ছপছপ এগয়, আবার পিঠটা নোয়ায়, আবার পিঠটা সোজা করে—জলে ঝরঝর শব্দ হয়, আবার পিঠটা নোয়ায়, আবার ত্যানাভেজা শূন্যতার দিকে চেয়ে থাকে। আবার ছপছপ। বুড়ি টুলটুলির সামনের জায়গাটা পর্যন্ত আসে। সেখানে জলে আঁজলা পেতে ডাইনে একবার তাকিয়ে ঘাড়টা ত্যানার ওপর ফিরিয়ে নেয়। ত্যানাটা জল থেকে তোলার পর, সব জল ঝরে যাওয়ার পর, ত্যানার ওপর বুড়ির তাকিয়ে থাকা শেষ হওয়ার পর, আবার ছপছপ কয়েক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার পর, আবার জলে ত্যানা বিছানোর আগে পিঠ নোয়াতে-নোয়াতে ডান দিকে তাকালে বোঝা যায়, বুড়ি টুলটুলিকে দেখছে। ত্যানাটা জল থেকে তোলার পর, ত্যানার সব জল ঝরঝর ঝরে যাওয়ার পর, ত্যানার ওপর বুড়ির তাকিয়ে থাকা শেষ হওয়ার পর ডাইনে বেঁকে বুড়ি টুলটুলির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। টুলটুলির চোখ খোলা। দেখে হিমের পর্দাটাসহ নদীর ভেতর থেকে সেই সিনজাকাঠির নাখান (পাটকাঠির মতন) পাতলা, কালা বুড়িটা উঠি আসিছে। জলের পর খানিকটা কাদা, তারপর ঘেসো জমি। ছপ ছপ শব্দটা বদলে খসখস শব্দ ওঠে। বুড়িটা এসে টুলটুলির সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, শুধু ঘাড়টা নুইয়ে টুলটুলিকে দেখে। —বুড়িটা চক্ষু দুইটা জ্বলজ্বল করি তাকাছে। টুলটুলির চোখের সামনে থেকে হিমের পর্দাটা কিছুতেই সরছিল না। টুলটুলির চোখ খোলা অথচ পাতা পড়ে না।—বুড়িটা কনেক খাড়া থাকি একবার ঝুড়িটাক আর-একবার টুলটুলিক্ নজর করিবার ধরিছে জ্যান্ত না মরা। টুলটুলি সোজা হয়ে বসে পড়তে চায়, কিন্তু তার মনে সন্দেহ হয়, সে ত বসে-ই আছে, তাহলে কী করে আরো বসবে। টুলটুলি ডান হাতটা নাড়িয়ে ঝুড়ির ওপর ফেলতে চায়। কিন্তু যতটা চাইলে ডান হাতটা উঠবে ততটা যেন চাইতে পারে না।—হেই ভাতারখাগি ভাবিবার ধইচছে মোর মরণ হইছে। বুড়ি, তুই যদি মোর এই ঝুড়ির দুইটা শিকড়ত হাত দিস, বুড়ি, তক মুই খুন করি ফেলাম। এ্যালায় যদি না পারি, এ্যালায়ই যদি আমার মরণ হয়, পেত্নি হইয়া তর ঘাড় মটকাম, তর মাথা দিয়্যা ছ্যাকাপোড়া খাম। বুড়ি, খবরদার! বুড়িটা যেই নিচু হয়ে হাতটা ঝুড়িটার দিকে এগিয়েছে

টুলটুলির ডান হাতটা স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিকতায় বেগে উঠে এসে নিষ্প্রাণ বস্তুর বেগে ঝুড়িটার ওপর পড়ে। বুড়ি সোজা হয়ে যায়। তারপর আবার খসখস শব্দ তুলে ঘাস থেকে জলে নেমে, একবারও টুলটুলির দিকে ফিরে না তাকিয়ে উজানের দিকে সামনের বাঁকের আড়ালে চলে যায়।

চমকে টুলটুলি সোজা হয়। ঝুড়িটার ওপর পড়ে। একটা কচু আর একটা কেশরে ছোট ঝুড়িটা ভরা-ভরা লাগছে। টুলটুলি ডাইনে বাঁয়ে চায়।—কায়ও নাই। মুই কি স্বপন দেখিবার ধইচছু? মুই নিদ গেইছু? না কি মুই হাতাশ থাইছু? —টুলটুলি ঝুড়িটাকে কোলের কাছে টেনে এনে নদীর সোঁতার এদিক-ওদিক, ওপারে, তার লুপ্ত স্বপ্ন খোঁজে। বাঁকের আড়ালে ছপ-ছপ শব্দ মুহূ থেকে মুহূতর তুলে টুলটুলিকে সজন স্বপ্নভূমি থেকে নদীপাড়ে নির্জনতর রেখে বুড়ি বাঁকে উজানে চলে গেছে।

ঝুড়িটা নিয়ে পাড় থেকে খসখস নেমে টুলটুলি জলে ছপ-ছপ এগিয়ে যায়। দুই পা ফাঁক করে শিকড় দুটো শুদ্ধুই ঝুড়িটা জলে ডোবায়, তোলে। ঝুড়ি থেকে ঝরঝর জল ঝরে গেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। মাছ নেই। শিকড় দুটোর মাটি ধুয়ে গেছে শুধু। এই রকম শব্দ তুলে, নদীর জল ছেঁকে-ছেঁকে টুলটুলিকে তালমা নদীর ভাটিপথে বাঁকে নির্জনতর চলে যেতে হয়।

boiRboi.net

৫

গোহালি ঘরের পেছন থেকে আলিপথে নেমে আসার পর, কতক্ষণ হাঁটতে পারবে, কখনই-বা টলে পড়বে আর কখনই-বা পেটের আলসার ফেটে তার মুখ দিয়ে রক্ত বের হবে এ-সব অনিশ্চয়তায় খেতখেতু অত্যন্ত জরুরি প্রথম-কটি পদক্ষেপে নিজেকে নিয়ে, হাঁটার প্রধান বাধা খেতখেতুর এই শরীরটা নিয়ে, ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চ্যাঙা শরীরটা সামলাতে খেতখেতুকে টিঙটিঙে পা-দুটোর ওপর সমান ভর রাখতে হয়—শরীরটা যে কখন কোন দিকে হেলে পড়বে বা টলে যাবে বা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়বে! সমান ভর রেখে হাঁটতে গেলে দুলতে হয় একটু-একটু। কিন্তু দুলতে গেলে আবার কোনো একদিকে ঝুঁকে হেলে পড়তে পারে। তাই পোড়াকাঠের মত হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে শরীরের দোলানি সামলাতে হয়, দুই পায়ের পাতায় চোখটা আটকে রেখে এক-পা এক-পা করে চলতে হয়। যাতে ঘুরে না যায় সেজন্য মাথাটাকে সিধে রাখতে হয়। পেটের ভেতর শূলবেদনা, তিনদিন না-খাওয়া, যে-কোনো সময় আলসারিয়া (আলসার) ফেটে রক্ত বমি করতে পারে। হাঁটার সময় খেতখেতুর কোমরের নীচের বাঁ দিকের হাড়টা তাঁতের মাকুর মত যতটা নেমে ফের ওঠে, ডান দিকের হাড়টা ততটা নীচে নামার আগেই যেন উঠে পড়ে। ফলে ডান পা-টা পুরো না ফেলেই খেতখেতু একটুখানি হেঁচড়ে নিয়ে যায়। আলসারের ব্যথাটা তলপেটে ডান দিকে এত বেশি দানা পাকিয়ে যে হাঁটার তাল অনুযায়ী ডান পা-টা ওঠানামা করানো সম্ভবই হয় না। ব্যথাটা এমন তীব্র খোঁচায় যে নিজে না-জেনেই খেতখেতুকে হাঁটার এই ভঙ্গিটা নিতে হয়েছে—বাঁ পায়ের ওপর একটু বেশি ভর দিয়ে ডান পা-টাকে একটুখানি ল্যাংচানো। এতে ব্যথাটা যেন একটু কম বোধ করে, অন্তত সেই তীব্র আচমকা খোঁচাটা যেন একটু ঠেকানো যায়।

খেতখেতুকে দেখতে লাগে পাখি-তাড়ানোর জন্য ধানখেতে পোঁতা নজরকাঁটা যেন উদোম ন্যাংটো হয়ে হাঁটছে। কিন্তু উদোম ন্যাংটো হয়ে গ্রাম-শহরের সরকারি-বেসরকারি কোনো অফিসে বা জোতদারের বাড়িতে ফ্রি-রেশন বা ধানধার চাওয়া যায় না, তাই খেতখেতুর দুই পায়ের ফাঁকে তার

লজ্জাস্থানটুকুকে শুধু গোপন রেখে ত্যানার একটা নেংটি কোমরের দড়ির সঙ্গে ঝোলে—কেবল গুহ্যদেশটাকে গুহ্য রাখার জন্যই যেমন পাঁঠার লেজটা। নেংটিটা পেছনে চিমসনো পাছার ফাঁকের ভেতর ঢুকে গেছে। পেশি নয়, মাংস নয়, শুধু চামড়াটা চকচক করছে খেতখেতুর। হাঁটার তালে-তালে পাছার হাড়ের ওপর বা উরুর পেছনে সেই চামড়াটায় টান ধরে ও অংশবিশেষ চকচক করে ওঠে। দুই হাতের দোলানির সঙ্গতি রেখে পিঠের তেকোনা হাড়ের ওপরের চামড়াটা চমকে-চমকে ওঠে। মেরুদণ্ডের গিঁঠগুলো আর দুটো গিঁঠের মাঝখানের ফাঁকটাতে যথাক্রমে আলো আর ছায়া কেঁপে-কেঁপে ওঠে। হাঁটার তালে-তালে গোড়ালির পেছনের মোটা শিরাটার ওপর থেকে আলো চলকে দুপাশের গর্তে যায়। আর হাঁটুর পেছনের গর্তের চামড়ায় আলো ও ছায়া চলকাতে থাকে। কিন্তু ডান পা-টা বাঁ পায়ের মত ওঠানামা করে না বলে পায়ের গর্তে-গর্তে আলোছায়ার এই চলকানি ডান পায়ে অপেক্ষাকৃত কম।

এ-ভাবে নিজের হাঁটার ছন্দ ভেঙে-ভেঙে খেতখেতুকে এমন হাঁটতে হয় যে সে চোখটা একটু তুলে ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে পারে না—এই রাশি-রাশি ধানখেতে ঐ বাঁয়ে তার হাতে বোনা খেতের খানিকটা থাকা সত্ত্বেও, পারে না।

গোহালঘরের গা ঘেঁষেই ধানখেতটা খুব বড় একটা ঢেউয়ের মত ফুলে উঠে, ঢাল বেয়ে দিক-দিক ভরা ধানখেতে, গড়িয়ে গেছে। এই কার্তিকের সকালের শিরশির হাওয়া, দূর-দূর ধানখেত থেকে সমতল বয়ে এসে, এই জায়গাটির ঢাল বেয়ে-বেয়ে এমন উঠে আসে, যে এই একহাল-মত জমির, ধীরে-ধীরে ঢেউয়ের মত ফুলে ওঠা আর গড়িয়ে যাওয়াটা, চারদিকের ধানখেতগুলোর সঙ্গে মিশেও, আলাদা থেকে যায়—যেন এখান থেকেই, এই ঢেউ থেকেই, ধানখেতগুলো গড়িয়ে-গড়িয়ে চারদিকে বান ডাকিয়েছে। ধানে-ধানে সমস্তটাই এত একাকার, ওপর থেকে বোঝার উপায় নেই, সেই পাকা ধানের বিস্তারের তলায় আল ভাগ করা জমি আছে।

গোহালঘরের গা-ঘেঁষে আড়াই ডেসিমেল মত খেতখেতুর, তারপর ডেসিমেল সাত-আটেক আর-এক হালুয়ার—আগে খেতখেতুর হালেই ছিল কিন্তু খেতখেতুর এখনকার গিন্নির (মালিক) আগের গিন্নি বেচে দিয়েছে। তারপর আবার খেতখেতুর হালের বিঘে তিন, সেটাও একটানা নয়, মাঝে-মাঝেই অন্যের জমি ছড়ানো-ছিটানো। গোহালঘরের গা ঘেঁষে উত্তরের আড়াই ডেসিমেল মত জমিটার সঙ্গে দক্ষিণের বিঘে-তিন জমিটাকে যুক্ত করে হাত-দশ চওড়া উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটা ফালি আছে। সেই ফালিটাতে খেতখেতু

কাতার ধান বুনেছে, সেই ধানে শিষ গজিয়েছে। কিন্তু তিন দিন ধরে জমা খিদেতে খেতখেতুর পেটের আলসারের ব্যথা এত তীব্র যে তার কাছে গতকালের রোয়া চারা আর শিষ বেরনো গাছের ভেতর কোনো পার্থক্য নেই। হেলথ সেন্টারের ডাক্তার খেতখেতুকে বলেছিল পেটে ভোখ না রাখতে, সবসময় পেট ভরা রাখতে। পেটে ভোখ থাকলে আলসারিয়া ফেটে গলা দিয়ে রক্ত বেরবে, কাল-কাল পায়খানা হবে। তখন, খেতখেতু মরে যাবে। ডাক্তার বলেছিল। এখন, খেতখেতুর পেট থেকে শুধু জল বেরচ্ছে। ইচ্ছে করলেই খানিকটা জল খেতখেতু পেট থেকে মুখে আনতে পারে। এরপর বোধহয় রক্ত পড়বে। তখন, খেতখেতু ইচ্ছে না করলেও, রক্ত পেট থেকে মুখে উঠে আসবে। তখন, খেতখেতু মরবে। ডাক্তারবাবুর কাছে খেতখেতুর জানা হয় নি, 'আলসারিয়াফাটা মরণটা কেনং করি আসিবার পারে?' তখন শীতকাল, খেতখেতু বা তার পরিবারের কারো পেটে তখন ভোখ ছিল না। ভোখের কথা তাই খেতখেতুর মনে পড়ে নি। এখন খেতখেতুর পেটে তিনদিনের বাসি ভোখ, সামনে আরো ক-দিনের ভোখ জানে না।—বহুসের (বউ) প্যাটত ভোখ, ছাওয়া-ছোট ভাতিজা-নাতিজার প্যাটত ভোখ। —তিনদিনের পুরা ভোখ, সামনে কতদিনের না-জানা। এত ভোখে, এবার একজন কাউকে মরতেই হবে।—এমন তামান ভোখত সগায় বাঁচিবার পারিবে না, একজনকে মরিবার নাগিবেই। খেতখেতুর ভোখও আছে, আলসারিয়াও আছে। খেতখেতুক-ই মরিবার নাগিবে। —ভোখ আর ব্যথা খেতখেতুর শরীরটাকে এমন বদলে দিয়েছে যে, এই শরীর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে-নুইয়ে-বেঁকিয়ে রোয়া চারায় এখন ধানের শিষে পাক দেয়া সত্ত্বেও, সেদিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে শুধু নিজের শরীরটা সামলাতে পায়ের দিকে নজর আটকে রেখে টলে-টলে হাঁটতে হয়—আল থেকে গড়িয়ে নীচে যেন পড়ে না যায়।

খেতখেতু মোটা আল দিয়েই হাঁটছিল, কিন্তু মোটা আল পাওয়াই যায় না। আল মোটা রেখে জমি নষ্ট করতে কেউই চায় না। এদিককার জমির হালুয়া আল মোটা করে বাঁধলে ওদিককার হালুয়া আল কেটে জমি বাড়ায়। এখন ধান পাকতে শুরু করেছে, এখন মোটা আল দিয়ে চলার সুবিধে, বিশেষত খেতখেতুর। —মোটা আলি দিয়া চলিবার কালে মনত্ খায় সরকারি আস্তা দিয়া চলেছু আর সরু আলি দিয়া চলিবার টাইমত দুই পাকের পাকা ধানের শিষ অ্যানং আসি পাওৎ গাওৎ নাগিবার ধরে, মনত্ খায় কি এই আস্তা দিয়া চুরি করিয়া চলিবার ধইচছু। —অন্যের খেতের ধানের ছোঁয়ায় শরীরে একটা

boiRboi.net

অস্বস্তি আসে।

মোটা আল ধরে না-হেঁটে খেতখেতু যদি সিধে বেরিয়ে যেত, তাহলে কখনো পালান ভুঁইয়ে (খুব নিচু) গড়িয়ে, পালান ভুঁই থেকে ডাঙায় উঠে—এতক্ষণ কোনাকুনি আল মেরে-মেরে এই পাকা ধানের খেতের পর খেত ডিঙিয়ে সে বোর্ডের রাস্তায় উঠতে পারত, নরেন সরকারের বাড়ির সামনে। এই কার্তিক মাসে সে-রকম আল ভেঙে চলাটাই সহজ, মাঠের ভেতর খানাখন্দে যখন জল জমে নেই। কিন্তু একবার উঁচু, একবার নিচু, একবার মোটা, একবার সরু আলে-আলে আর জমিতে তাকে এই ল্যাংচানো শরীরের ঝোঁক বদলে-বদলে চলতে হলে, এই ধানখেত পেরনো দূরের কথা, এই খেতের ভেতরই কোথাও হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে, পড়ে যেত, পড়ে থাকতে হত। তাই ঐ ধানখেতের ভেতর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে খেতখেতুকে অনেক আল ছেড়ে দিয়ে মোটা চওড়া নিরাপদ আল বেছে নিতে হয়। কোথাও চারদিক থেকে আল এসে মিশে একটা চৌপত্তির মত, কোথাও তেমাথার মত, কোথাও আবার যে-আল বেয়ে খেতখেতু চলেছে সেটাই দু-ভাগ হয়ে উল্টোদিকে চলে গেছে। কোনোরকম ভাবনা-চিন্তা পছন্দ-অপছন্দ ছাড়াই খেতখেতু তার পক্ষে নিরাপদ মোটা আল ধরে-ধরে এগচ্ছিল। তাতে কখনো তাকে ডাইনে, কখনো বাঁয়ে ঘুরতে হয়, যেন ধানখেতটার ভেতর কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সে পাক দিয়ে বেড়াচ্ছে।

খেতখেতু প্রথমে ধানখেত উজিয়ে সোজা দক্ষিণে চলে। আর আলগুলো বেছে-বেছে কোন দিকে হাঁটবে ঠিক করার সময় পুব পাক ঘেঁষে বাছে। পশ্চিমে তখানিক দূরেই দ্বারিকামারির খাল। পুব পাকে বোর্ডের রাস্তা। কোথাও যদি যেতেই হয় বোর্ডের রাস্তাই ধরতে হবে। বোর্ডের রাস্তা ধরে সোজা দক্ষিণে গেলে পাকা রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে সোজা পুবে গেলে অঞ্চল অফিস, অঞ্চল অফিসে ফ্রি-রেশনের জন্য যাওয়ার একটা কথা খেতখেতুর মনে ছিল বটে কিন্তু ফ্রি-রেশনের জন্য দরখাস্ত চাই, সে-দরখাস্তে গ্রামসভার অধ্যক্ষের সই চাই। তার গ্রামসভার অধ্যক্ষ অমনীকান্ত পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের বাড়ি বোর্ডের রাস্তার উত্তরে, পুব পাকে। ঐ পুব পাকেই বোর্ডের রাস্তার পাশে নরেন সরকারের বাড়ি। পদ্মনাথের বাড়িও বোর্ডের রাস্তা দিয়েই যেতে হয়, কিন্তু সে আর-এক গ্রামসভায়, সাতখামারে। খেতখেতুদের এদিককার সব দরখাস্ত লিখে দেয় জমিরুদ্দি জোতদারের জোয়াই (জামাই) তবিবর। জোয়াইটা রোজ সাইকেল করে শহরে কলেজে যায়। জমিরুদ্দি জোতদারের বাড়ি এই ধানখেত পেরিয়ে ইস্কুল বাড়ি, ইস্কুল বাড়ি পেরিয়ে হাটখোলা,

হাটখোলা পেরিয়ে বরমডাঙা, বরমডাঙা পেরিয়ে জহুরি কলোনি—সেই জহুরি কলোনির আগে, পশ্চিমে। এখন, জমিরুদ্দি জোতদারের বাড়ি গিয়ে জোয়াইটাকে ধরে দরখাস্ত লিখিয়ে আবার উত্তরে পঞ্চায়েতের বাড়ি এসে সই নিয়ে, আবার দক্ষিণে গিয়ে পাকা রাস্তা ধরে অঞ্চল অফিসে গিয়ে ফ্রি-রেশনের তদবির করতে বেলা ত শেষ হবেই, খেতখেতুর আলসারটা ততক্ষণে আস্ত না-ও থাকতে পারে। আর আলসার না-ফাটলেও ব্যাপারটা যেন দাঁড়ায় তার জন্য ফ্রি-রেশনের পুরচি লিখে অঞ্চল অফিসে কেউ অপেক্ষা করছে, সে শুধু দরখাস্তটা দিলেই পুরচিটা পেয়ে যাবে। কিন্তু ফ্রি-রেশন ত সে আইনেই পাবে না, আধিয়ারকে ফ্রি-রেশন দেয়ার আইন নেই। একটা কিছু ভেবে না নিলে চলা যায় না বলে সে ফ্রি-রেশনের কথাটা একবার ভেবে রেখেছে।

জমিরুদ্দি জোতদারের বাড়ি গিয়ে ফ্রি-রেশনের দরখাস্ত লিখিয়ে নিতে-নিতে সে দু-চার কেজি ধান ধার চাইতে পারে। আবার হাতে একটা দরখাস্ত থাকলে সেটা দেখিয়ে অমনী পঞ্চায়েতকে বলতে পারে—হয় ফ্রি-রেশনের কাথা লিখি দেন, না-হয় হামাক দু-চার কেজি ধান ধার দাও কেনে।

হাতে একটা কাগজ থাকলে কথা বলার সুবিধে। শুধু কথা বলার জন্য খেতখেতু একজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় কী করে, যেমন সে তার ছোটবেলায় পারত—

কিন্তু জমিরুদ্দি জোতদার হামাক ধার দিবে কেনে। মুই উমরার টারির মানষি না-হই, মুই উমরার গাঁয়ের মানষি না হই, মুই উমরার আধিয়ার না-হই, মুই উমরার ধর্মের মানষি না-হই, সারা বছরের বাদে একবার-কি-দুইবার দেখা হয় কি না-হয়—জমিরুদ্দি জোতদার যাছে জহুরির হাটত আর খেতখেতু যাছে বনিজের হাটত—উমরাক কহাও যদি যায় হামাক ধার দাও, উমরায় দিবে কেনে—

বরং অমনী পঞ্চায়েতের কাছে গিয়ে তাও বলা যায়, মাঝেমধ্যে দেখা হয়, খেতখেতুর বাড়ির পশ্চিম পাকে তার খানিকটা জমিও আছে, খেতখেতুর গ্রাম-সভার অধ্যক্ষ—

কিন্তু উমরায়-বা দিবে কেনে? খেতখেতু উমরার আধিয়ার না-হয়। আর আধিয়ারক ধানখোয়াবার আইনই উঠি যাছে ত স্যালায় গ্রামের মানষিক খোয়াবে? তামান জোতদার-মানষিগিলা ব্যবসাই-মানষি হয়্যা যাছে আর খেতখেতুই খেতখেতু থাকি যাছে হে—

আগেকার সময় হলে, বছর কয়েক আগে হলেও, খেতখেতুকে চলে যেত হত

boiRboi.net

পদ্মনাথ রায়ের কাছে। খেতখেতুদের গিরি ছিল জলপাইগুড়ি শহরের এক উকিল বাবু। তাকে কখনো দেখেই নি প্রায় খেতখেতু, কি খেতখেতুর বড় বাপা-ও। তার ঠিকা ছিল পদ্মনাথের সঙ্গে। পদ্মনাথের সঙ্গে খেতখেতুর বড় বাপার ছিল আধি-বন্দবস্ত। 'হলদ-বিছন-খোয়া' সবই পদ্মনাথ দিত। জমি আইনের পরে পদ্মনাথ ঠিকা ছেড়ে দিল, সেই উকিলবাবু-গিরির কোনো এক মুহুরি বাবু এসে জমি দেখাশোনা করত। সেই সকালে এসে টিকটিক করে খেতখেতুর পেছনে ঘুরে বেড়াত। ধানকাটার সময় আবার গোছা গুনে রেখে যেত। মাড়াইয়ের সময় আন্দাজ করত কত মণ মাড়াই হল।—তা নাও কেনে, যত হিশাবই কষো কেনে, হালুয়া যদি চুরি করিবার মন করে, গিরির ঘর ধরিবা পারিবে? তারপর উকিল বাবু মরে গেল। উকিল বাবুর দুই ছেলের ভেতর জমি ভাগ হল। ছোট ছেলে জমি বেচে দিল। খেতখেতুও সঙ্গে-সঙ্গে বেচা হয়ে গেল এক সাইকেলঅলা গিরির কাছে। বড় বাপার হালে যা-জমি ছিল, সেটা বারবার হাত বদলে কমে-কমে তখন এক হালেরও কমে এসে দাঁড়িয়েছে, সাইকেলঅলা গিরি আগে ধান নিয়ে যাওয়ার সময় রিকসা নিয়ে আসত। তারপর—লেভি-টেভির হুটিশ যে-বছরঠে পাড়িবার ধরিল সেই বছরঠে বাজারের থলি করিত্ ধান নিগাবার ধরিল। আর নাকশালিয়া হাঙ্গাম শুরু হবার বাদে উমরায় প্রায় আসাই ছাড়ি দিল। হঠাৎ আসে। পকেটঠে একোটা থলি বাহির করে। খেতখেতু আস্তাত গিয়া থলিটা ভরি দেয়। বাবু একখান খবরের কাগজ দিয়া চাউলঠা ঢাকি নিয়া ফুড়ুৎ করি সাইকেলত চড়ি চলি যায়। খাড়িবার সাহস পায় না। তবে খেতখেতু তাকে ঠকায় নি। যখনই এসেছে তখনই থলি ভরে দিয়েছে। আবার এ কথাও ঠিক এই এতখানি বয়সের ভেতর—আজ ত খেতখেতু মরেও যেতে পারে, খিদেয়, আলসার ফেটে, রক্তবমি করে—এত বড়, এত না-খা ভোখত ত কাউকু মরিবার নাগিবেই, ঘরত্ সগায় কী করি বাঁচিবার পারে, বছরত্ একজনকু ত ভোখত্ মরিবার নাগিবেই—এক ঐ নাকশালিয়া কার্তিক মাসেই খেতখেতু সপরিবারে দুই বেলা ভাত খেয়েছে। কিন্তু নাকশালিয়া হাঙ্গামা শেষ হওয়ার পরই বাবুটি জমি বেচে দিল। তখন খেতখেতুর ভাগে থাকে বিঘে দশ। আর তখন আর তার গিরি নয়, গিরিনি।—গিরিনি রিকসাত ধরি আসে, পাটার টাইমে আর ধানার টাইমে। বেটিছোয়ার ঘরটা ইকসাত বসি থাকে। খেতখেতু য্যালায় নেংটিখান পরি গিয়া খাড়ায় গিরিনিখান আর-এক পাথে চাহি কাথা কহিবার ধরে, মিহি-মিহি কাথা, শুনা যায় কি না-যায়। অ্যালায় লজ্জাখান ভাঙিবার ধরিসে। কিন্তু সে ত গেলবার পর্যন্ত,

খেতখেতু জানে না এবারও সেই গিরিনি আছে কি না। সে যদি এর ভেতর জমি বেচে দিয়ে থাকে তাহলে ধান কাটার পর সেই নতুন গিরি হয়ত সাইকেল চড়ে এসে বলবে, 'ভাগা দাও।'—ধানকাটার টাইমে যেইলা আসি কহিবে মোক ভাগা দেও উমরাক ভাগা দিয়া দিবে।

যারই কাছে খেতখেতু ধার চাইবে, সেই-ই বলবে গিরির কাছে যাও। গিরি আর কোথায়! দশ বিঘে জমি কিনলেই ত আর গিরি হয় না। আর তার শহরের বাড়িও চেনে না খেতখেতু। চিনলেই বা হত কী? তার গিরিনিকেই এখন শহরে সাড়ে তিন-চার টাকা কে-জি চাল কিনতে হচ্ছে।

খেতখেতু বাঁয়ে ফেরে, বোর্ডের রাস্তাতেই উঠবে। অমনী পঞ্চায়েত ধার না দিলে নরেন সরকারের বাড়ি যেতে পারবে। নরেন সরকার না দিলে উজিয়ে পদ্মনাথের বাড়ি যেতে পারবে। পদ্মনাথ না দিলে সেখান থেকে প্রধানসাহেবের কাছে অঞ্চল অফিসে যেতে পারবে।

কিন্তু ধানকর্জের নামে খেতখেতু যদি সব বাড়িতেই একবার ঢোকে তাহলে সেটা ভিক্ষার মতন দেখায় না? খেতখেতু ত ভিক্ষুক নয়। তার আধির জমিতে ত তার রোয়া পাকা ধান দাঁড়িয়ে আছে।

এই জমিটাতে খেতখেতু চার পুরুষ আছে—তার বুড়া বাপা ছিল, তার বাপা ছিল, সে আছে, চ্যারকেটু আছে। গিরির জমিতে হলেও, তার বাড়ি চার পুরুষ ধরে ঐ একই জায়গায় আছে। চার পুরুষ ধরে একই গাঁয়ের একই জায়গায় থাকার পর এখন কি খেতখেতু ভিক্ষুক না-হয়ে কোনো বাড়িতে ঢুকতে পারবে না? —অ্যালায় মরিবার আগত কি হামাক ভিক্ষুক হওয়া ছাড়া কুনু গতিক নাই? পদ্মনাথ আছিল্ গিরি, হইছে অ্যালায় নিজচাষি। অমনীকান্ত আছিল্ পঞ্চায়েত, হইছে অ্যালায় মেম্বার। নরেন সরকার আছিল্ জোতদার, হইছে অ্যালায় এফ-সি-আই-এর এজেন্ট। এক মুই খেতখেতু খেতখেতুই আছো।

নিজের জমি পেরিয়ে এসে এখন এই চারপাশ ঘেরা ধানখেতের ভেতর বন্যার জলে সাঁতরানো পুকুরের মত এদিক-ওদিক তাকিয়ে খেতখেতুকে নিজের একটা ধান-চাওয়ার জায়গা খোঁজার চেষ্টা করতে হয়।

রমণী পঞ্চায়েতের বাড়িতে ঢোকার রাস্তাটা আগে ছিল দক্ষিণ দিয়ে। গেল সনের আগের সনে পঞ্চায়েত তার ভেতরবাড়ির ঘরটা পাকা বানাতে শুরু করে। বাঁশবাড়ির ভেতর দিয়ে ছিল বাড়িতে ঢোকার দক্ষিণের সাবেকি রাস্তাটা। ইট-সিমেন্টের ট্রাক ঢোকে না দেখে দক্ষিণ দিকের সেই রাস্তাটার বাঁশবাড়িসমেত বন্ধ করে উত্তরের এই নতুন রাস্তাটা তৈরি হয়। সিমেন্ট-ইট বোঝাই গাড়ি

বোর্ডের রাস্তা থেকে নেমে পঞ্চায়েতের বাইরের উঠোনে এসে উঠতে পারত। বোর্ডের অনেক কালের রাস্তাটার একটা শক্ত ভিত আছে—গরুর গাড়ির চাকায় আর বর্ষায় যতই-না-কেন ওপরের মাটি ধুয়ে যাক বা খেয়ে যাক। কিন্তু যে জায়গায় ট্রাকটা বোর্ড রাস্তা ছেড়ে রমণী পঞ্চায়েতের রাস্তাটা ধরার জন্য বেঁকে, প্রতিবারই সেখানকার কিছু মাটি বসে যায় বা ধসে যায়। ফলে, ট্রাক নামার সময় ট্রাকের পেছনে কুলিরা ও রমণী পঞ্চায়েতের হালুয়া-আধিয়াররা আর জুটে-যাওয়া মানুষ-জন, সবাই মিলে 'হেই হেই, হট হট, বাঁয়ে, ডাইনে, সোজা' এই সব আওয়াজ চালিয়ে যায়—কাদায়-পড়া গরুর গাড়ি তুলতে যে-আওয়াজগুলি অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

গাছপালা বাঁশবাড়ি হল বাড়ির ঢাকনা। রমণী পঞ্চায়েতের বাড়ির সেই ঢাকনাটা খুলে গেছে। পুরনো বাঁশবাড়ির বাঁশগুলোও পাকাবাড়ি তৈরির কাজে লেগেছে। ফলে বাড়িটা মাঠের মধ্যে একেবারে খোলামেলা পড়ে। এখন অবিশ্যি পাকা ধানের খেত, ডোবাটার অপর পাড় থেকে সেই বোর্ড রাস্তা, আবার পঞ্চায়েতের বাড়িতে ঢোকার রাস্তাটার দুদিক, ছাপিয়ে গেছে। তাই এখন বাড়িটাকে ঢাকা-ঢাকা মনে হয়, কিন্তু সে ত চারপাশের সমস্ত কিছুকেই ধানঢাকা মনে হয়, এখন।

বোর্ডের রাস্তায় দাঁড়ালে তার পাকা কুয়োর পাড় দেখা যায়। মাটিকাটা ডোবাটাকে কেটেকুটে একটা ছোটমত পুকুর বানিয়ে ফেলেছে পঞ্চায়েত। নতুন রাস্তাটার মাটি দুই সনেও বসে নি—বর্ষায় ভেঙে-ভেঙে যায় আবার শীতে মাটি ফেলা হয়। তখন শাদা বালিমাটি চকচকায়। রাস্তায় এখনো ঘাস গজাতে পারে নি। এই নতুন রাস্তার উত্তরে, বাড়ির উত্তর-পশ্চিমে নতুন বাঁশবাড়ি বানিয়েছে পঞ্চায়েত। পেকে উঠতে বাঁশগুলির অনেক দেরি। রোগা পাতলা বাঁশগুলি এখন ঝড়বাতাসের সময় নারকেল গাছের ডালের মত আছারি-পিছারি পড়ে। পাতলা-পাতলা নতুন বাঁশের সেই বন এখনো ঘনিয়ে ওঠে নি। তাই বোর্ডের রাস্তা থেকে পঞ্চায়েতের নতুন রাস্তায় কেউ নামলে পঞ্চায়েতের 'দারিঘর' থেকে দেখা যায়।

আর এতটা দূর থেকে দেখা যায় বলে, চারপাশে কোনো ঢাকঢাকনা নেই বলে, বোর্ডের রাস্তা থেকে এই নতুন রাস্তায় নেমে পঞ্চায়েতের বাড়ির দিকে যেতে খেতখেতুর বড় লজ্জা করে। পেটে প্রায় তিনদিন আগে ভাতের মাড় পড়েছিল, দেড়দিনেরও বেশি পেটে শুধুই জল, চ্যারকেটুটাকে হাটে পাঠিয়েছে গরুটা বেচতে, টুলটুলি কোথায় মাঠে বেরিয়েছে কচু-কন্দ খুঁড়তে, ছোয়াদুটোও তাদের

মায়ের সঙ্গ নিয়েছে, খেতখেতুর 'সালসার' (আলসারের) ব্যথা এত বেশি যে তাকে প্রায় লেংচে হাঁটতে হচ্ছে, সে বেরিয়েছে যদি এ রকম ঘুরে-ঘুরে কোথাও থেকে দু-মুঠো চাল জোগাড় করা যায় আর খেতখেতুর সব সময়ই ভয় আজকের রাতটা সে পার করতে পারবে না—তবু রমণী পঞ্চায়েতের বাড়ির এই একেবারে খোলামেলা নতুন রাস্তাটা দিয়ে চলতে খেতখেতুর লজ্জা করে পঞ্চায়েতের দাড়িঘর থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে একমাত্র এই কারণেই। আকাশ দিগন্ত ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যের সঙ্গে অদৃশ্য থেকে চাষ-আবাদে অভ্যস্ত খেতখেতু এতটা ফাঁকা রাস্তায় নিজেকে দৃশ্যমান করে চলতে লজ্জা পেয়ে যায়, আশিরনখর খিদে সত্ত্বেও। খেতখেতু নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটে—গত বর্ষায় রাস্তাটার বালি-মাটি ধুয়ে গিয়ে গর্ত-গর্ত মত হয়ে আছে—ধানকাটার পর পৌষ-মাঘ মাসে পঞ্চায়েত নিশ্চয়ই নতুন মাটি ঢালবে।

বাড়ি পাকা করার জন্যে পঞ্চায়েতের তিনপুরুষের বাড়িঘর এত ভাঙাভাঙি করতে হয়েছে যে দেখলে মনে হয় 'হু-ই প্লেইন ঘ'টির পাখে যায় কাঁটাকাঁঠালের বাগান করিবার ধইচ্ছে স্যানং কুনো মাড়োয়ারি এ্যালাই দুই নং দ্বারিকামারিত নূতন বাড়ি বান্ধিবার ধইচ্ছে। এ বাড়িখান তরণী পঞ্চায়েতের বেটা রমণী পঞ্চায়েতের না-হয়।' এই নতুন রাস্তাটা দিয়ে ট্রাক সোজা পঞ্চায়েতের বাহির এগিনায় ওঠে, ফলে উত্তর ভিটার দেওবাড়িখান (ঠাকুরঘর) ভাঙতে হয়েছে। আগে পঞ্চায়েতের দারিঘর ছিল বাহির এগিনার দক্ষিণে, সেটা এখন সিমেন্টের গুদাম। আগে যেটা ছিল ভিতরবাড়িতে পঞ্চায়েতের নিজের ঘর, পুবের ভিটায়, সেটাই এখন হয়েছে পশ্চিমের ভিটা, নতুন পাকা ঘরটা উঠছে তার পুবে। আর তার পুরনো ঘরের বারান্দাটায় একটা ছেঁচাবেড়া দিয়ে একটা চৌকি পেতে রেখেছে—বারান্দায় একটা চেয়ার আর একটা বেঞ্চি। এই বারান্দাটাই এখন দারিঘর। সামনে পরিষ্কার তকতকে কার্তিকের উঠোন, উত্তরে ইট আর দক্ষিণে সিমেন্টের গুদাম আর আঙিনার যে-অংশটা পুকুরের পাড়ে মিশেছে সেই অংশটায় বালির স্তূপ—একটা ব্যবহার করা হয়ে গেছে, বালির স্তূপের অবশেষটুকু মাটির সঙ্গে প্রায় মিশেই আছে একটু উচ্চতা নিয়ে, দু-চারটে ঘাস বালির স্তূপের ভেতর থেকে শিষ তুলেছে। আর-একটা স্তূপ বেশ উঁচু ঝুরঝুরে, জলে জমে নি। আর দিন কয়েকের ভেতর ধান কাটা শুরু, পঞ্চায়েত বাইরের আঙিনা তকতকে ঝকঝকে করে রেখেছে—দরকার হলে বাড়ি তৈরিও এখন বন্ধ থাকবে। উঠোনের ধারে পুকুরের পাড়ে পর-পর তিনটি গোয়ালের বিরাট উঁচু পাঁজা, এই কার্তিকেও যে-পাঁজাগুলি উঁচু ঠেকে আর বছর ধরে খাওয়া পাঁজাগুলির তলা থেকে খড়

নেয়া হয়েছে বলে দেখায় যেন গোয়ালঘরের মত। সেই পোয়ালের পাঁজার সামনে গাড়া বাঁশের খুঁটিতে-খুঁটিতে আড়াআড়ি বাঁশ বাঁধা—পাট শুকোবার, কাপড় মেলার বাঁশ। তিনটে লম্বা বাঁশে পুকুরের পাড়টা ছাপিয়ে গেছে—দুটো বাশে ধানের পোকার ওষুধের মত শাদা গুঁড়োগুঁড়ো লেগে।

উঠোনে উঠে খেতখেতু দাঁড়িয়ে তার বসার একটা যোগ্য জায়গা খোঁজে—পাট শুকোবার বাঁশের গায়ে হেলান দিয়ে বসা যায়, কিন্তু এখন এই বাইরের আঙিনায় যখন কোনো লোক নেই, তখন মাটিতে বাঁশের গায়ে হেলান দিয়ে উঁচু হয়ে বসার অর্থ দাঁড়ায় সে কিছু চাইতে এসেছে। খেতখেতু নিশ্চয়ই বারান্দায় গিয়ে বসতে পারে, যখন মান্যগণ্য লোক নেই কেউ এখানে এখন, তখন, বারান্দায় বেঞ্চিটাতেও বসতে পারে, খেতখেতু, তিন পুরুষের আধিয়ার একই জমিতে—তা হোক না কেন তার আধির জমি বিক্রি হয়ে-হয়ে প্রতি সনেই ছোট থেকে আরো ছোট, আর নাই জানুক সে তার এখনকার গিরির নাম, কিন্তু 'ই কথাটা ত ঠিকোই আছে, সে খেতখেতু রায়, স্যানং-স্যানং টাইমত খেতখেতু রায় বর্মন, নিজের এক ডেসিমেল জমি নাই, কিন্তুক তিন পুরুষের আধিয়ারি আছে, এ্যালায় প্রতি সনত ক্ষয় হবা ধরিছে, তবু ত আছে।' কিন্তু খেতখেতু যেমন পাটের বাঁশের খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে মাটির ওপর বসে না, তেমনি বেঞ্চিটাতেও গিয়ে বসে না। বসে, পঞ্চায়েতের সিমেন্ট বাঁধানো মেঝের ওপর খুঁটিটাতে হেলান দিয়ে। তাও আবার বারান্দায় ওঠার সিঁড়িটার মাথায় বসে না। বসে, বারান্দায় একেবারে দক্ষিণ সীমানার খুঁটিটাতে। দুই হাঁটু উঁচু করে, খুঁটিতে হেলান দিয়ে উবু হয়ে কনুই দুটো হাঁটুর ওপর রেখে হাতের পাতা দুটো নাকচোখের কাছ পর্যন্ত তুলে আনলে খেতখেতুর মুখ আড়ালে পড়ে যায়।

যতক্ষণ না পঞ্চায়েত বাড়ি থেকে বেরয়, এখানে এসে দাঁড়ায়, ততক্ষণ পর্যন্ত খেতখেতু এখানে এমনি বসেই থাকবে। এমন-কি, এমনি চুপচাপ বসে থাকতে-থাকতে হঠাৎ তেমন জরুরি কিছু মনে পড়লে খেতখেতু উঠেও যেতে পারে—পঞ্চায়েতের সঙ্গে দেখাটুকু না সেরেই। এখন খেতখেতুকে বসে-বসে ভাবতে হয়, কথাটা সে কী ভাবে পাড়বে। প্রথমেই ত আর বলা যায় না, 'ধান কর্জ দেন কেনে।' বলা যাবে না কেন, বলা যায়, বলা যেত, যদি পঞ্চায়েত তার গিরি হত বা পঞ্চায়েতের কোনো জমিতে খেতখেতু বা চ্যারকেটু আধিয়ারি করত। বা, এমন-কি আগের মত ব্যাপার হলে, ধানকাটার সময় একদিন খেটে দেবে বলেও কর্জ চাওয়া যেত। কিন্তু আজকাল আধিয়ারিই উঠে যাচ্ছে

আর রমণী পঞ্চায়েতের ত সবই নিজ চাষ। চাষের সময় গ্রামের লোককে দিয়েই কাটাতে হবে তারও কোনো মানে নেই। বাইরে থেকে ঠিকা বন্দবস্তে একদল বিহারী মজুর এনে দিন তিন-চারের ভেতর খেতের ধান গোলায় তুলে তারপর নিজের লোকজন দিয়ে মাড়াই করতেও পারে। পঞ্চায়েত বের হয়ে এসে যদি তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে তাহলে খেতখেতু সময়ও নিতে পারে, সুযোগও খুঁজতে পারে—কখন বললে কথাটা পঞ্চায়েত ফেলতে পারবে না। কিন্তু পঞ্চায়েত বেরিয়ে এসে যদি তাকে সরাসরি প্রশ্ন করে, 'কী রে খেতখেতু', তখন খেতখেতু বলবেটা কী। তখন ত আর সে সময় নিতে পারবে না, একটা কিছু ত তাকে বলতেই হবে।

পায়ের শব্দ পেয়ে খেতখেতু চোখটা একটু তোলে—কেউ আসছে, পঞ্চায়েত নয়। পঞ্চায়েতের পায়ে খড়ম, এটা ত হাওয়াই স্যাণ্ডেলের শব্দ। পঞ্চায়েতের ছেলে নবীন বাইরে আসে। লুঙিপরা, স্নান সেরেছে। ভেজা কাপড় বাঁশটার ওপর মেলে দিতে-দিতে ঘাড় ঘুরিয়ে খেতখেতুর দিকে তাকিয়ে হাসে। পঞ্চায়েতের একই ছেলে, হাটে-হাটে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে, রিক্সা আছে, রিক্সায় হাট থেকে হাটে যায়।

"হে তালই, তোমরা মিছিলত্ না গেলেন ?"

খেতখেতুর উত্তর দেয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু নিজের গলার ভেতরে একটা ঘরঘর শব্দ শুনতে পেয়ে থেমে যায়। তার উত্তর দেয়ার সময়টা পেরিয়ে গেলে নবীন স্বাস্থ্যবান হাসে—তার শাদা দাঁত ঝকঝক, হাসির কুঞ্চন গালে। খেতখেতু ভাবে, নবীনের স্নান হয়্যা গেইসে, এ্যালায় ভাত খাবার বসিবে, নবীন এ্যালায় ভাত খাইবে, এ্যালায় ভাত খাইবে নবীন।

"হে-ই তালই, তোমরালা না-জানো, আজি সব পার্টি শহরত মিছিল নিগাবার ধইচছে ? বটতলা গরম। যাও কেনে একখান পাট্টি ধরি, যাও কেনে"—নবীনের কাপড় মেলা শেষ হয়ে গেলেও সে দাঁড়িয়েই থাকে।

গলায় খেঁকারি দিয়ে কফ তুলে মুখ বের করে পাশে ফেলে, মুখটা মুছে খেতখেতুকে বলতে হয়, "তুই যাছিস নাকি মিছিলত্ ? কোন্ পাট্টি ধরলু রে ?"

"মুই না যাও", নবীন হাতদুটো জড়ো করে শীত কাটাবার ভঙ্গিতে মুখের কাছে তোলে, "বলো কেনে, বাবা আসিছে।"

কিন্তু আর-একবার কফে গলা বন্ধ হওয়ার আগে খেতখেতুকে পরিষ্কৃত গলার সুযোগে বলতেই হয়, "মিছিলত্ যাবি না ত এত সকালত্ স্নান সারি

যাছিস কুনঠে ?"

ভেতরে যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে নবীন বলে, "শিলিগুড়ি যাছি, মহাজনের গদিত্ মাল আনিবার নাগিবে।"

নবীন ত হাটে-হাটে ঘোরে, ওর সঙ্গেই দেখা হয় বেশি, দেখা হলেই হেসে-হেসে কথা বলে, বেশ ছেলেটা। নবীন বা রমণী পঞ্চায়েত যে কেন মিছিলে যাবে না সেটা খেতখেতু জানে। রমণী পঞ্চায়েত কংগ্রেসের ঘর না-হয়। আর এ্যালায় ত মিছিল ধরিলেই কংগ্রেসের মিছিল। সেই দুই নম্বরি ভোটঠে, যুক্তফ্রন্টের আগতকালঠে পঞ্চায়েত যুক্তফ্রন্টের মানষি। তামান এলাকার একা জোতদার আছিল্, যায় জোড়া-বলদ করে নাই।

খেতখেতু পেছনে তাকিয়ে দেখে পঞ্চায়েত দাঁড়িয়ে। পরনে ধুতি, গায়ে আসামী তুশের চাদর, পায়ে খড়ম—রমণী পঞ্চায়েত। হাত দুটো পেছনে নিয়ে ডোবাটার ওপর দিয়ে হু-ই বোর্ড রাস্তার দিকে তাকিয়ে, সারাটা চোখমুখ কোঁচকানো যেন বোর্ড রাস্তা দিয়ে কে যাচ্ছে তাকে এখান থেকে চিনবার চেষ্টা করছে।

পঞ্চায়েতকে দেখবার জন্য খেতখেতু পেছন ফিরে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় বটে, কিন্তু শরীরটা ঘুরিয়ে পঞ্চায়েতের দিকে মুখ করা তার পক্ষে চট করে সম্ভব হয় না। পেটে যাতে টান না লাগে—খেতখেতু প্রথমে তার বাঁ পা-টা বারান্দা থেকে নামায়। তারপর পাছাটা মেঝেতে ঠেকিয়ে ডান পা-টা বারান্দার ওপরই রেখে খুঁটিটা ধরলেই চলে না, হাতের ওপর জোর দিতে হয়। ডান পা-টা বারান্দার ওপর থাকায় তলপেটটার ডানদিকে একটু ঠেকনা দেয়া, টান লাগে না, যেন তাতে পেটে আচমকা টান লাগার আশঙ্কা কম। পঞ্চায়েত খেতখেতুর গিরি নয়, আর পঞ্চায়েতের কাছে যে-সব কারণে লোকজনের আসা-যাওয়া সে-সব কোনো কারণই খেতখেতুর নেই। তাই পঞ্চায়েতের সামনে তার দাঁড়াবার বা বসার কোনো একটা ভঙ্গি নির্দিষ্ট নেই। কিন্তু রমণী পঞ্চায়েত গ্রামসভায় অধ্যক্ষ—তার কাছে নানা দরকারেই লোকজনকে আসতে হয়, আধিয়ার বা সাগাই-কুটুম না হয়েও। তাই তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে পাবলিকের একটা ধরন আছে, যেমন পাবলিকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে তারও একটা ধরন তৈরি হয়ে গেছে। কিন্তু বারান্দায় এক পা আর মাটিতে এক পা রেখে কথা বলাটা ত ভঙ্গিই নয়। সুতরাং খুঁটিটায় হাতের ভরে শরীর সামলে খেতখেতুকে ডান পা-টা নামাতে হয়। কিন্তু নামালেও মাটির ওপর ডান পা-টা টানটান করে দেয় না, ডান পায়ের ওপর শরীরের ভরও দেয় না, পায়ের আঙুল

মাটিতে ঠেকিয়ে একটু ভাঁজ করে রাখে—কুঁচকিতে যাতে টান না লাগে। ফলে খেতখেতুর ভঙ্গিটা এমন হয়ে পড়ে যেন সে তক্ষুনি পঞ্চায়েতকে কিছু বলতে চায় অথচ পঞ্চায়েতকে কী ভাবে কথাটা বলবে সেটা তখনো সে ভেবে উঠতে পারে না। পাওয়া যাবে না জেনেও ফ্রি-রেশনের স্লিপের কথা তুলবে, নাকি, পাওয়া যাবে না জেনেও ধান কর্জ দেয়ার কথা বলবে। ফ্রি-রেশনের স্লিপ না পেয়ে ধান কর্জ চাইলে, কর্জ চাইবার জোরটা থাকে না। আবার কর্জ চেয়ে না পেয়ে ফ্রি-রেশনের স্লিপ চাইতে গেলে ফ্রি-রেশন চাইবার জোরটা থাকে না। যাই চাক, সে ত এতটা এ কারণে হেঁটে আসে নি যে সে চাইবে, পঞ্চায়েত 'না' করে দেবে আর সে উঠে চলে যাবে। সুতরাং খুঁটিটা বেয়ে তার হাত সরসর নেমে যেতে থাকে আর তার কোমর বেঁকে যায়, তারপর সে ধপ করে বারান্দার ওপর বসে পড়ে—এবার পা দুটো মাটির ওপর রেখে।

রমণী পঞ্চায়েত খেতখেতুর দিকে একবারও তাকায় না—যেমন বোর্ড রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল, তেমনি তাকিয়ে থাকে। পঞ্চায়েত তিন পুরুষের জোতদার—এই গাঁয়ের। খেতখেতু তিন পুরুষের আধিয়ার—এই গাঁয়ের। রাতদিন গ্রামসভা, অঞ্চল অফিস আর ব্লক অফিস করতে-করতে পঞ্চায়েত এত ব্যস্ত যে খেতখেতুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎই হয় না। দেখাসাক্ষাৎ না-হলে আর বলার কথা আসে কোত্থেকে।

হাত দুটো খেতখেতু একবার হাঁটুর ওপর রাখে, একবার খুঁটির গায়ে রাখে, শেষে ডান পাটা মাটি থেকে বারান্দার ওপর তুলে সেই হাঁটুটা দুই হাতে জড়িয়ে হাঁটুর গায়ে লাগিয়ে মুখটা নিচু করে রাখে। পেটের ভেতরটা কলকল করে। ভেতরের বেগটা ওপরের দিকে ঠেলে ওঠে। বুকের চাপটা হালকা করতে পিঠটা টানটান করে সোজা হলে সেই চাপটা আরো ওপরে উঠে আসে—তখন উদ্গার তুলতে খেতখেতুকে গলাটা লম্বা করে ঘাড়টা হেলাতে হয়। উদ্গারের মত একটা চাপ গলায় দিতেই খানিকটা টক আর নোনতা জল উঠে আসে, মুখটা ভরে যায়। খেতখেতু মুখটা নিচু করে, ভাবে, জলটা আবার গিলে ফেলে কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই খেতখেতুর সন্দেহ হয় যে যদি তার 'সালসাটা' (আলসারটা) ফেটে থাকে, যদি তার মুখটা রক্তে ভরে উঠে থাকে, তা হলে এখন রক্তবমি শুরু হয়ে যাবে। মুখের ভেতর টক-নোনতা জলটা নাড়িয়ে খেতখেতু একবার আন্দাজের চেষ্টা করে, মুখের ভেতর জল না রক্ত। হেল্‌থ সেন্টারের ডাক্তার বলে দিয়েছিল, প্যাটত ভোথ যেন না থাকে, ভোথ থাকিলে সালসা ফাটি যাবে, সালসা ফাটি গেলে রক্ত হাগা হবা ধরিবে, রক্ত হাগার অং (রং) নাকি আবার

কালা কটকটা, আর রক্ত বমি হবা ধরিবে, রক্ত বমির রং নাকি লাল টকটকা। স্যানং হলি আর বাঁচিবার না হয়—।

খেতখেতু মুখের ভেতরের তরল পদার্থটা জিভ দিয়ে নাড়ায়। কোনো স্বাদ পায় না। আগে যে টক-টক আর নোনতা স্বাদ পাচ্ছিল সেটাও এখন পায় না। ভাবে, একটু গিললে বোধহয় স্বাদটা পাওয়া যেত। কিন্তু তরল পদার্থে মুখের ভেতরটা ভরে যাওয়ায় গিলতেও পারে না।

মুখের ভেতরের সেই অনিশ্চিত স্বাদ নিয়ে খেতখেতুর বড় আশা হয়, তার মুখের ভেতরে যদি এখন রক্ত জমা হয়ে থাকে, এ-রকম মুখভর্তি রক্ত যা ফেললে 'কার্তিকা মাসের এই ঠনঠনা এগিনা (আঙিনা)-খান-এর এইখানটা এক্কারে লাল হইয়া যাইবে', তাহলে রমণী পঞ্চায়েত আর চুপ করে থাকতে পারবে না, "হে খেতখেতু হে খেতখেতু বলি উঠাবার নাগবে" যাতে খেতখেতু, মরা বা পড়ে থাকা, যা করার রাস্তায় গিয়ে করে। কিন্তু মুখের ভেতরে এখন রক্তই যদি জমা হয়ে থাকে খেতখেতুর আর, সে যদি সেটা এই কার্তিকা মাসের এগিনাতে ফেলতেই পারে, তাহলে রমণী পঞ্চায়েত যতই তাকে ওঠানোর চেষ্টা করুক সে কিছুতেই উঠবে না, এই বারান্দায় শুয়ে পড়ে বলবে, 'এ্যালায় মোক পাঁচ কেজি-দশ কেজি ধান কর্জ দাও, মুই এইঠে উঠি যাছ', তাহলে রমণী পঞ্চায়েত তাড়া-তাড়ি যতটা পারে ধান এনে বলবে, 'হেই নে, হেই নে, ধান নে,ধান নে, উঠ্ কেনে, এ্যালায় উঠ্, উঠো বাবা খেতখেতু হে, আস্তায় (রাস্তায়) চলি যা।' খেতখেতু ধানটা নিয়ে তবে উঠবে। যতই রক্তবমি হোক, ধানটুকু নিয়ে সে বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারবে ঠিক।

মুখের ভেতরের তরল পদার্থটা আবার জিভ দিয়ে নাড়ায়। যেন জল কেটে গেছে, কোনো স্বাদ পাচ্ছে না। কিন্তু মুখভর্তি এত রক্ত যদি জমা হয় তাহলে স্বাদটা কেমন লাগে। রক্তের স্বাদ নোনতা, ঘামের মত। আঙুল-টাঙুল কেটে গেলে ঠোঁটে নিয়ে চুষেছে খেতখেতু—তখন ঘামের মত নোনতাই লাগে বটে। কিন্তু সে ত দুই-এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লে শুষে যায়। এ-রকম মুখভর্তি রক্তের স্বাদ কী রকম হতে পারে, যে-রক্ত মাটিতে পড়লে মাটিও শুষে নিতে পারে না—আলসার-ফাটা সেই তপ্ত ও গলগল রক্তের স্বাদ কী রকম, খেতখেতু জিভ দিয়ে ভেতরের তরল পদার্থটা একবার নেড়ে ভাবে।

রক্তবমিটা যদি সে এখন করে ফেলতে পারে, তাহলে, পাঁচ-দশ কেজি ধান সে আদায় করতে পারে। খুব ভরসায় মুখটা বাঁ দিকে সরিয়ে এনে খেতখেতু ঠোঁটটা একটু ফাঁক করে পিচকিরির মত ছিটয়, একটু জল, হা। খেতখেতু

BanglaBook.org

হাঁ করে মুখভর্তি শাদা শ্লেষ্মাসহ তরল জলটা ফেলে দেয়, লালের সামান্য ছিটেও নেই। সবটা জল পড়ে যাওয়ার পর মাকড়সার জালের মত শ্লেষ্মার শাদা একটা সুতো ঠোঁট থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে থাকে। খেতখেতু বাঁ হাত দিয়ে সেটা মাঝখান থেকে কেটে দেয়। না, এখনো জলই পড়ছে। "না, এ্যালায় জলই পড়োছে।"

খেতখেতু যে আশা করেছিল তার মুখ দিয়ে রক্তই উঠবে, অথচ রক্তটা উঠল না, উঠল জল, তাতে খেতখেতু যেন একটু হতাশই হয়। রক্তটা যদি নেহাৎ উঠেই আসত, তা হলে কী করে রমণী পঞ্চায়েতের কাছে কথাটা পাড়বে—কোনো লাভ নেই জেনেও ক-দিন একদানা ভাত পেটে না পড়লে কথাটা পাড়তে হয় বলেই পাড়া—সেই অত্যন্ত কঠিন চিন্তার দায় থেকে খেতখেতু ছাড় পেত। মুখ দিয়ে গলগল করে পড়া রক্ত, এই ঠনঠনে উঠোনের ওপর লাল টকটকে রক্ত, এই ধান-মাড়াইয়ের জন্য তৈরি জায়গাটায় তাজা রক্ত অবস্থাটাকে এত দ্রুত পাল্টে দিত যে তখন খেতখেতুকে ভাবতেও হত না, কথা বলতেও হত না—রমণী পঞ্চায়েতকেই যা করার করতে হত। হয়ত ধান দিত। হয়ত 'নবীনকৃ সাইকেলধরি উত্তর পাখে মোহিতনগর সরকারি ফার্মঠে বা দক্ষিণে পাঙ্গা পেলেন ঘাঁটিঠে এম্‌বুলেন্সের তানে একখান ফোন করিবার তানে পাঠিবার ধরিত।' যাই করুক, রমণী পঞ্চায়েতকেই করতে হত। এ-রকম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে ত আর পারত না। নিজের পেটের অনিবার্য খিদের জন্য ধান জোগানোর দায়িত্ব নিজের মাথার ওপর থেকে রমণী পঞ্চায়েতের মাথায় চালান করতে এতই কাতর খেতখেতু যে অগত্যা নিজেকে সান্ত্বনা দিতে তাকে ভাবতে হয়, ধানকাটার আগে কার্তিকমাসের এই পাঁচ-দশ দিন ধান বা চাল এতই দুর্লভ যে গলা দিয়ে রক্ত তোলা খেতখেতুকে এই বারান্দা থেকে সরাবার দরকারটাও ধান বা চালের তুলনায় তুচ্ছ হয়ে যেত কি না। "অক্ত না পড়িছে ত ভালই হছে। অক্তখানও পড়ি গেইল, ধানও না-জুটিল, স্যালায় বড় ক্ষতি।'

রমণী পঞ্চায়েত একবারের জন্যে জিজ্ঞাসা করে না, 'কী রে খেতখেতু, ক্যানং আছিস?' পঞ্চায়েতের বাড়ি ত 'দশের ঘর', মানুষ সব সময়ই নানা কাজে আসা-যাওয়া করে। যার যা বলার, সেই বলে। পঞ্চায়েত কাউকেই কিছু শুধয় না।

যেমন বসে ছিল, খেতখেতু তেমনি বসে থাকে। যেমন দাঁড়িয়েছিল রমণী পঞ্চায়েত তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে। দুজনেরই চোখের সামনে ছড়ানো থাকে

boiRboi.net

ডোবা, ডোবার পাড়ে ধানি জমি, ধানি জমির পাড়ে বোর্ড রাস্তা, বোর্ড রাস্তার পরে আবারও ধানি জমি, পঞ্চায়েতের বাড়িতে ঢোকার নতুন রাস্তা, এখনো কঞ্চি এমন বাঁশবন। খেতখেতুর এই সব দেখার কথা নয়; রমণী পঞ্চায়েত দেখে কি না বোঝা যায় না, তার চোখের কুঞ্চন এখন এতই স্বাভাবিক। এই রকম করে কিছু সময় কেটে যায়—যে-সময় ধরে খেতখেতুর মাথা থেকে পঞ্চায়েতের কাছে কথাটা কী করে পাড়বে সেই দুর্ভাবনাটাও কেটে যায়। যেমন পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, যেমন সাগাইকুটুমের বাড়িতে সাগাই-কুটুম আসে, তেমনি স্বাভাবিক আর সহজ হয়ে উঠতে চায় যেন পঞ্চায়েতের কাছে খেতখেতুর এই আসা, পঞ্চায়েতের বারান্দায় খেতখেতুর এই বসে থাকা।

পঞ্চায়েতের দিকে মুখ না ঘুরিয়ে, থামের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে, ডান হাঁটুর ওপর কনুইয়ের ভরে হাত দিয়ে মুখ আড়ালে রেখে খেতখেতু আপন মনে বলে, 'এই বাড়িখান কেনং আউলভাউল হয়্যা গেইসে। বাঁশবাড়ি নাই, লতাগাছ নাই, বাড়িত্ ঢুকিবার আস্তাখানত্ ঘাস নাই, বালি চিকচিকাছে, মনত্ খায় কি তিস্তার বানাভাসি মানষি ঘর ভাঙি উঠি আসিছে।'

খেতখেতুর এই বিবরণের সবটাই কেমন মিথ্যা ঠেকত—এখন ত খেত-খেত ভরা ধানে-ধানে বাড়িটা ঢাকাই ঠেকে—যদ্দি-না, ধানকাটা শুরু করার অপেক্ষায় ব্যস্ত রমণী পঞ্চায়েত আর খেতখেতু, দুইজনই, এই ধানভরা মাঠে, ধানকাটা মাঠের অতি-নিকট আগামী শূন্যতাই সর্বক্ষণ দেখত।

একটু পর পঞ্চায়েত দমকে-দমকে কেশে ওঠে—কথা বলতে গিয়েই কেশে ওঠে। যতক্ষণ কফ না ওঠে ততক্ষণ কেশেই চলে। দলা কফ উঠে এলে সেটাকে, দাঁড়িয়ে থেকেই, ছুঁড়ে ফেলে বাকিটা চেটে আস্বাদ করে আবার দূরে ফেলে, কথা বলে।

'নতুন বাড়ি বান্ধিবার তানে ত কনেক এ্যানং হবাই নাগিবে রে খেতখেতু।' পঞ্চায়েতের গলা সব সময়ই কফে ঘরঘর করে, কিন্তু কফ ফেলে কথা বলতে শুরু করেছে বলে গলাটা বেশ তীক্ষ্ণ শোনায়। কথাটা শেষ হবার মুখে আবার শ্লেষ্মাজড়িত হয়ে যায়—'আর-দুই বর্ষায় বাঁশবাড়িখান খাড়া হয়্যা উঠিবে।'

খেতখেতু কোনো উত্তর করে না। আবার সেই ডোবা, ধানখেত, বোর্ড, রাস্তা, ধানখেত এইগুলো দু-জনের চোখের সামনে স্থির থেকে যায়। সেই স্থিরতায় পঞ্চায়েতের কথাটা একেবারে মিশে, হারিয়ে গেল প্রায়, খেতখেতু যেন নতুন করে বলে, পঞ্চায়েতের দিকে না তাকিয়েই বলে যায়, 'এই ডোবাটাক্

boiRboi.net

ত পুকুর বানিবার ধরিছেন। এ্যানং বিশালিয়া পুকুরের পাড়ত্ কি কুনো বাড়ি ঢাকা যায়।'

'পরের সনত্ পুকুরের ঐ পাড়ত্ বাঁশবাড়ি বানাবার ধরিম। স্যালায় তিন বর্ষায় বাঁশবাড়িটা খাড়া হয়্যা যাবে। স্যালায় পুকুরটাও ঢাকা পড়ি যাবে। বাড়িখানও ঢাকা পড়ি যাবে।'

'এ্যান্ং বিশালিয়া পুকুর কাটিবার ধরিছেন···' খেতখেতু এমন বলে যেন কথাটা শেষ হয় না। খুব ধীর স্বরটা টানা থেকে যায়।

'মাছ চাষ করিম।'

কথাটা ঠাহর করতে একটু সময় নেয় খেতখেতু, তারপর বলতে পারে, 'এইঠে?'

'হয় হয়। মাছ চাষ করিম। এইঠে।'

'সিংগি-মাগুর', খেতখেতুর কথার মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকে না, যেন পঞ্চায়েতের কথাটাই সে শেষ করে দেয়।

'সিংগি-মাগুর আবার চাষ করিবার নাগে নাকি রে? রুই-কাতলা, তেলাপিয়া। তেলাপিয়া জানিস?'

'না জানি।'

'আমেরিকান কই মাছ, কই মাছের নাগান, সাইপরাস রুই, সব বিলাতি মাছ।'

'এত মাছ খাবেন কায়, তোমরালা ত চারটা মানষি।'

'খোয়ার তানে না হয় রে, বেচার তানে। বেচাম। মাছ ধরিম। বেচাম।'

অনেকক্ষণের নীরবতা জুড়ে খেতখেতুর ভেতর প্রশ্নটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু নিজের পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে যখন বলে, 'তোমরালা হাটত মাছ বেচিবেন', তখন প্রশ্নের সামান্যতম ভঙ্গিও থাকে না, সবটাই হয়ে ওঠে বিবরণ, যেন সাইনবোর্ডে লেখা—রমণী পঞ্চায়েতের এখানে মাছ পাওয়া যায়। খেতখেতু সে-বিবরণ কাউকে শোনাচ্ছে না, নিজের কাছে বলে নিজের কাছেই পরিষ্কার করে নিচ্ছে। রমণী বলে, 'বেচিম ত।' কিন্তু রমণী যেন কোনো জবাবই দেয় নি, স্বরের এমন অপরিবর্তিত ধারাবাহিকতায় খেতখেতু বলে যায়, 'বেচিবেন ত, তোমরালা মাছ বেচিবেন···'।

রমণী পঞ্চায়েত চুপ করে যায়। সেই নীরবতায় খেতখেতুর কাছে পঞ্চায়েতের কথাগুলোর মানে ধীরে-ধীরে পরিষ্কার ধরা পড়তে থাকে যেন।

সারাজীবন বাড়ির ডোবাগুলোতে সিংগি-মাগুর দেখে আসতে-আসতে এখন রমণী পঞ্চায়েত বুড়োর মুখে বাড়ির সামনে রুই-কাতলা চাষের পরিকল্পনাটা বুঝতে খেতখেতুর যতটা সময় লাগার কথা, ততটা সময় জুড়ে ধীরে-ধীরে বোঝে খেতখেতু। সেই বোঝা শেষ হলে বলে, 'এ্যালায় তোমরালা পচ্চিমে পুকুর কাটিবার ধইচ্ছেন, পুবে পাছবাড়ি বানাছেন, মাছ চাষ ধরিবেন, চাষ-আবাদ ছাড়ি দিবেন—' খেতখেতুর কথাটা শেষ হয় না, সে এক সময় থেমে যায়। আর অনেকক্ষণ থেমে থাকার পরও নতুন করে কথা না-বলায় বোঝা যায় তার আর-কিছু বলার নেই, কথাটা শেষ হয়ে গেছে। অথচ তার বাক্যগুলো পরপর এমন বেরিয়ে আসছিল যেন একটা সিদ্ধান্ত আছে। কিন্তু খেতখেতু কথাটা সম্পূর্ণ করতে পারে না, তার মানসিকতার পরিধিতে হয়ত কথাটা সম্পূর্ণতা পেতে পারে না। টানা স্বরে একটা বিবৃতি থাকে যেমন, তেমনি তার কথার অসম্পূর্ণতায় দীর্ঘশ্বাসের বাতাসও থেকে যায়। ঐ দীর্ঘশ্বাসকে শব্দে সাজাতে পারলে বাক্যটা খেতখেতু শেষ করতে পারত।

রাজবংশী সমাজের বাড়ি তৈরির চিরকালীন ধারায় পুবে হাঁস, পচ্চিমে বাঁশ, দক্ষিণে ধুয়া, উত্তরে গুয়া অর্থাৎ পুবে ডোবা, পশ্চিমে বাঁশবন, দক্ষিণে মাঠ আর উত্তরে সুপুরি বাগান রাখার কথা—বাহির 'এগিনায়' দারিঘর ও ঠাকুরবাড়ি (তুলসীতলা), ভেতর এগিনার ভিটাপিছু যে যা পারে ঘর তুলে নেয়। এই ধারার ভেতরই টানা টিনের ঘর, আলকাতরা-লাগানো মুলি বাঁশের বেড়া, পাকা মেঝে দিয়ে বড় জোতদার, আর এইগুলোর কোনো-কোনোটা দিয়ে মাঝারি জোতদার, চেনা যেত। পাকাবাড়ি কেউ করত না। গত দুই-তিন সন ধরে পাকাবাড়ির হুজুগ পড়েছে। প্রথম বানায় দশ-নম্বর নগর-বেরুবাড়ির নীলমণি। নীলমণি নিজেই ডাকাত, বন্দুক আছে আর বর্ডারে মালপাচারের ব্যবসা। এদিককার গরু নিয়ে ওদিকে বেচে। তারপর গড়ালবাড়ির জয়চন্দ—একটা ভিটার ঘর পাকা করে। পরের বছর বাহাদুরে একসঙ্গে শুরু করে দ্বারিকামারির রমণী পঞ্চায়েত আর গাঠিয়াপাড়ার ভবানী। ভবানীর বাড়িটার বাইরের দেয়ালে পলেস্তারা পড়ার আগেই ডাকাত পড়ে। নতুন ঘরের না-বাঁধানো মেঝের ওপর ডাকাতরা ভবানীকে মেরে রেখে গেল। সকলের ভেতর সেই দশনম্বরের নীলমণি আর এই দ্বারিকামারির রমণী পঞ্চায়েত পুরোপুরি পাকাবাড়ি বানিয়েছে—একেবারে হাতঅলা, থামঅলা পাকা বাড়ি। আর দোতলা দালান বাড়ির ব্যবস্থায় এই মাঠের ভেতর কী-বা দক্ষিণ, কী-বা পশ্চিম। সব দিকই সমান।

খুব বড় জোতদার থেকে শুরু করে খেতখেতুর মত তিন পুরুষের আধিয়ার—যাকে 'গিরি'-ই বাড়ি তৈরির জমি দিয়ে রেখেছে, সবারই বাড়ি তৈরির সাবেকি ব্যবস্থাটা যে পালটে যায় আর তারই ফলে রমণী পঞ্চায়েতের বাড়িটা যে এমন 'ডং ডং করি ন্যাংটা হয়্যা থাকে' সেইটাই খেতখেতুর গভীর ক্ষোভের কারণ। ক্ষোভ মাত্র সেইটুকুই, যেটুকু তিনপুরুষের আধিয়ারির সূত্রে একই জমিতে একই বাড়িতে থাকার ফলে খেতখেতুর মনে জমতে পারে আর মাত্র সেইটুকুই গভীর, তিনদিনের না-খাওয়া শরীরে, পেটে আলসারের ব্যথা নিয়ে মেঝের ওপর এক পা তুলে পেটের ব্যথা সারাবার চেষ্টা করতে-করতে, যতটুকু গভীর হওয়া সম্ভব। আজকালকার নতুন 'গিরি' তার নতুন আধিয়ারকে বাড়ির তৈরির জমি দেয় না, প্রতি সনে তার বাড়ি বদলাতে হয়—পাছে একটা কোনো জমিতে কয়েক বছর বাড়ি থাকলে আধিয়ারের দখল কায়েম হয়ে যায় আইনে—

রমণী পঞ্চায়েত জোরে একটা কথা শুরু করতে যাওয়ায় তার একটা কাশির দমক ওঠে। কাশতে-কাশতে শ্লেষ্মা উঠে এলে যখন মনে হয় যে কাশিটা বোধ-হয় থামল, তখন কাশির এমন হঠাৎ দমক আসে যেন পঞ্চায়েতের দমই আটকে যাবে। শ্লেষ্মাটা ফেলার পরও ওয়াক-ওয়াক দিয়ে আরো খানিকটা শ্লেষ্মা তুলে, ওয়্যা-ক দীর্ঘ তুলে, থু থু থু থু বার কয়েক করে জিভমুখ পরিষ্কারের পর চাদর দিয়ে চোখের জল, ঠোঁটের কোনা আর নীচের ঠোঁটের তলাটা মুছে পঞ্চায়েত চিৎকার করেই বলে, বলার জন্যে প্রথম চিৎকারটা তুলেই গলাটা আটকে যাওয়ায় আবার গলাটা পরিষ্কার করে নিতে হয়, 'মুই কি করিম, মোক কছিস কেনে? জোত-জমি ভেস্ট হবার ধরিল। তার বাদে আইন-টাইন দেখি নিজের জমিটা ঠিকঠাক করিবার ধইছু, স্যালায় তোর যুক্তফ্রন্টের আইন জারি হইল, জমির উপর আধিয়ারের নাকি দখল কায়েম হবা নাগিবে। আরে হামার আধিয়ার। রাখিম কি রাখিম না, সেইটা মুই ঠিক করিম। সরকারের কী কহিবার আছে? ত আবার তোর কবে যুক্তফ্রন্ট হয়, কি নাকশালিয়া হয়, কায় জানে—এ্যালায় মোর জমিরও কাম নাই, আধিয়ারেরও কাম নাই। নবীনক ত কাটা কাপড়ের দোকানি বানাইছু, এ্যালায় মুই আলু চাষ করিম, মাছ চাষ করিম, পাটা করিম, গম করিম, ধান করিম—নগদা পয়সার কাম, কাম করিলে পাইসা, কাম না করিলে পাইসা নাই। মুইও ব্যাপারি হবা ধইচছু রে, মাছের ব্যাপারি ত মাছের ব্যাপারি। হে—এ, ঐ সব গিরি-আধিয়ারি আর নাই বাপা হে-এ।'

পঞ্চায়েত এত চেঁচিয়ে, এত জোর দিয়ে-দিয়ে, এই কথাগুলি একটানা বলে চলে আর এই বলার শুরুতেই তাকে এমন একটা কষ্টদায়ক কাশির দমকে ভুগতে

BanglaBook.org

হয়, যেন এই সব কথা নিয়ে পঞ্চায়েতের ভেতরে-ভেতরে চলা মারামারি লড়ালড়ি থেকেই কথাগুলি ছিটকে-ছিটকে আসে, দুই মোষের মারামারি থেকে যেমন কাদা ছিটকয়।

কী পঞ্চায়েতের লম্বা একটানা দমবন্ধ করা কাশি আর কী পঞ্চায়েতের লম্বা একটানা দমবন্ধ করা কথা, কোনো সময়ই খেতখেতু ঘাড় ঘুরিয়ে পঞ্চায়েতের দিকে ফিরে তাকায় নি। তার কারণ অবশ্য পেটের খিদে ও আলসারের ব্যথা নিয়ে এমন একটা ভঙ্গিতে খেতখেতু পৌঁছে আছে যে সামান্যতম পরিবর্তনেই তার শরীরের সমস্ত সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে খেতখেতু কথাও বলে, যেন কথা সে বলছে না, তার ঠোঁট থেকে কথাগুলো গড়িয়ে-গড়িয়ে যাচ্ছে—যেমন গাছের গা বেয়ে রস গড়ায়। ফলে যে-পঞ্চায়েত খেতখেতুর দিকে ফিরেও তাকায় নি এতক্ষণ, সেই পঞ্চায়েতকে তার দিকে পেছন ফেরা খেতখেতুর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে কথাগুলো বলে যেতে হয়, কাশতে হয়, আবার কথা শুরু করতে হয়, যেন খেতখেতুর এই ফেরানো মুখ, মাথা আর শরীরটার কাছে রমণী পঞ্চায়েতের এত কৈফিয়তই দেবার থাকে।

সেই ডোবা, ধাতখেত, বোর্ডরাস্তা, ধানখেত, বাঁশবাড়ি, ধানখেত, পোয়ালের বর্ণহীন পাঁজা আর শরৎ-হেমন্তের নির্মল রোদ আর শিরশির হাওয়ার হঠাৎ দমক তাদের চারপাশের এই সবের সঙ্গে মিলেমিশে পঞ্চায়েতের কথাগুলি প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়, যেন সেই কথাগুলি কোনোদিনই বলা হয় নি আর সেই বোর্ড রাস্তা দিয়ে শহরে মিছিলে যাওয়ার জন্য গ্রামের লোক যায়, চার-পাঁচজন মিলে বা একা-একা বা বাচ্চা নিয়ে। হাটবার ছাড়া বোর্ড রাস্তায় এত ভিড় থাকে না।

খেতখেতুর ঠোঁট দিয়ে কথা গড়ায়, 'তোমরালা হামাক শোনাছেন, যুক্ত ফরনট। এই তামান এলাকায় যেইলা কায়ও যুক্ত ফরনটের নামও শোনে নাই স্যালায় তোমরালা যুক্ত ফরনট করিছেন। এই তামান এলাকায় তোমরালাই ত এক যুক্ত-ফরনটের জোতদার।'

পাকিস্তানের দিনাজপুরে নাকি পঞ্চায়েতের বড় ভাই-এর শ্বশুরবাড়ি, সে সেখানেই থাকত, জোতজমি ছিল। তখন নবীন ত হয়ই নি, পঞ্চায়েতের বাবা জীবিত। পঞ্চায়েতের বড় ভাইকে নাকি পাকিস্তানের জেলে আটকে রেখেছিল ও সে জেলেই মারা যায়। তাই, তখন থেকেই রমণী পঞ্চায়েত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বিরুদ্ধে হলেও কোনো একটা পার্টির সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। ভোটের সময় সে নিজে তার বাড়িঘরের লোকজন, হালুয়া-আধিয়ারদের নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিত। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যদি

একাধিক প্রার্থী থাকত তাহলে পঞ্চায়েত যাকে চেনে বা চিনে নিতে পারত তাকে ভোট দিত। বায়ান্ন, সাতান্ন, বাষট্টি সব ভোটেই পঞ্চায়েত তাই করেছে। সেই একমাত্র জোতদার যে বরাবর 'কংগ্রেসের বিপাকে'।

তখন পঞ্চায়েতের নামই ছিল 'বিপাকিয়া জোতদার'। সাতষট্টিতে যুক্তফ্রন্টের সরকার হওয়ার পর পঞ্চায়েতের নাম হয় 'যুক্তফ্রন্টের জোতদার'। যুক্তফ্রন্টের সরকার হওয়ার পর রমণী পঞ্চায়েতকে নিয়ে একবার অঞ্চল অফিসে, আরেকবার জিলা পরিষদ অফিসে, আরেকবার জে-এল-আর অফিসে টানাটানি। আসলে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ত ভারভারিক্কি লোক ছিল না কেউ। তাই রমণী পঞ্চায়েতের ডাক পড়ত সব জায়গায়।

এই রকম একটা মিটিং হচ্ছিল বনিজের হাটে। জিলার ডি-সি, যুক্তফ্রন্টের বড় নেতারা সব ছিল। নতুন লেভি আইন বোঝানো হচ্ছিল। ডি-সিই সরকারের আইন বোঝাচ্ছিল। রমণী পঞ্চায়েত ছিল সভাপতি। ডি-সি বার-বার করে আধিয়ারের দখল আর ফসলের ভাগের কথা বলছিল—জমি জোতদারের হলেও আধিয়ার, যে চাষ করে, চাষ করার দখল তার। গেল সনে যে চাষ করেছে এ সনে তাকেই চাষ করতে দিতে হবে, সেই চাষ করবে। আধিয়ার উচ্ছেদ বে-আইনি আর জোতদার ধানের যে-ভাগ পাবে তার জন্যে রসিদ দিতে হবে, আর আধিয়ার ধানের যে-ভাগ দেবে তার জন্য রসিদ নেবে। এই সময়, ডি-সি-র বক্তৃতার মাঝখানেই রমণী পঞ্চায়েত সভাপতির চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে মাইকের সামনে দাঁড়ানো ডি-সিকে জোড় হাতে বলে 'সার, সার'। ডি-সি তাড়াতাড়ি থেমে বলে, 'বসুন, বসুন। বসে বলুন, বসুন।' রমণী দাঁড়িয়েই জোড়হাতে কথা শুরুর চেষ্টা করলে যুক্তফ্রন্টের জেলা নেতাদের একজন ছুটে এসে তার পেছন থেকে কানে-কানে কিছু বলে। কিন্তু রমণী তাকে প্রায় ধমকই দেয়, 'হামার কাথা হামাক কহিবার দেন'। তারপর জোড়হাতে ডি-সিকে বলে, 'সার, সার।' ডি-সি একটু হেসে বলে, 'বসুন-না বসুন, বসে-বসে বলুন।' 'না, সার, আপনাকে একটা কথা পুছিবার চাহি।' 'বলুন-না বলুন' বলে ডি-সি রমণী পঞ্চায়েতের দিকে তাকিয়ে থাকে। রমণী পঞ্চায়েত ঘরঘরে গলায় তার চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে জোড়হাতে কথা বলতে শুরু করে। তার সামনে মাইক ছিল না। তাই তার কথা শোনার জন্য ভিড়টা জট পাকিয়ে যায়, কেউ-কেউ এগিয়ে আসে। হাত জোড় রেখে পঞ্চায়েত বলে গিয়েছিল, 'সার, ধর কেনে, মোর দ্বারিকামারি খালের পুব পাকের জমির আধিয়ার ভাদুরা। গেল সনত্ আমার একখান বলদ বেচি দিছে। এই সনত্ কুনো চাষ-আবাদের কাম করে

নাই। এই বছর উমরাক মুই জমিত্ আর চাষ দিবার না দিম। ভাদুরা বলি বেড়াছে আধিয়ারক্ উচ্ছেদ নাই। তা আধিয়ারটাক্ মুই খাওয়াম বাঁচাম, আধিয়ার মোর জমিটাও মোর, আর সরকার আইন করিবেন যে আধিয়ারক্ উচ্ছেদ নাই ? ভাদুরাক্ মুই জমিত্ হাল দিবার না দিম।'

ডি-সি মাইকে বলে, 'তাকে বোঝাতে হবে, সে কেন চাষ দেবে না, চাষ না দিলে ত তারও ক্ষতি, সেটা বুঝতে হবে।' পঞ্চয়েত চেয়ার ছেড়ে পাশে এসে বলে, তখন আর হাত জোড়া ছিল না, 'কাক্ বুঝাবেন ? উমরাক ? ঐ বলদ ভাদুরাখান্—'। ভাদুরা মিটিঙে ছিল, সে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই দেউনিয়া, গালি না দেন।' পঞ্চায়েত ডি-সিকে বলে যায়, 'উমরায় দ্বিতীয় বিয়া বসিছে। উমরার দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরের জমি আছে এইঠে কুকুরজানত্, এই কাথা সগায় জানে। উমরায় কুকুরজানের জমিটা বসি-বসি খাবে আর মোর জমিটাও ছাড়িবে-না', বলতে-বলতে রমণী পঞ্চায়েত এগিয়ে যায়, প্রায় ডি-সিকে ছাড়িয়ে। ডি-সি বলে, 'আপনি বসুন, বসুন।' যুক্তফ্রন্টের জিলা নেতাদের একজন ছুটে এসে রমণী পঞ্চায়েতকে ধরে বলে, 'আপনি সভাপতি, আপনি সভা ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন।' রমণী পঞ্চায়েত হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ধমকে ওঠে, 'ছাড়ো কেনে সভাপতি। পার্টির কাম পার্টি করো—ভোটাভুটি, আইন-কোর্ট, ডি-সি, এস-ডি-ও এই সব করো। চাষ-আবাদের কাম চাষিক ছাড়ি দাও, হাল-বলদ-বিছন, গিরি-আধিয়ার—এই সব কামে পার্টি-পুটি কোটত্ আসে হে। এ্যাঁ ? মুই সভাপতি না হও।' রমণী পঞ্চায়েত দ্রুত বেগে সরে গিয়ে ভিড়ের পিছনে দাঁড়ায়, যেন সে এ-সভায় শ্রোতামাত্র। ডি-সি হাসিহাসি মুখে যুক্তফ্রন্টের নেতাদের দিকে তাকিয়ে দুই হাত উল্টোয়। যুক্তফ্রন্টের নেতারা নিজেদের ভেতর কানাকানি করে। তাদের ভেতর একজন ডানহাতটা মাথার ওপর তুলে একটু নাড়ায়। সেটা দেখে ডি-সি হাসি-হাসি মুখে আবার বক্তৃতা শুরু করে। তারপর থেকে ডি-সির মুখের হাসিটা আর বন্ধ হয় নি। এরপর রমণী কোনো মিটিং-মিছিলে যেত না। ভাদুরা তার জমিটুকু একদিন কয়েক-জনকে নিয়ে ঝাণ্ডা পুঁতে দখল করে নেয়। যুক্তফ্রন্টের সরকার চলে যাওয়ার পর দু-দুটো ভোট হয়েছে, সে-দুটো ভোটেও রমণী পঞ্চায়েত কংগ্রেসের বিপক্ষেই খেটেছে। যুক্তফ্রন্ট ভেঙে গেছে, আবার কংগ্রেসের সরকার হয়েছে। রমণী পঞ্চায়েতের নাম কিন্তু 'যুক্তফ্রন্টের জোতদার'-ই থেকে গেছে। তাকে 'বিপাকিয়া জোতদার' বলে আর-কেউ ডাকে না।

'আসলে কি জানিস খেতখেতু, হামরালার আগতই এই নিজচাষি বন্দবস্তয়

চলি যাবার দরকার আছিল্' বলে পঞ্চায়েত খেতখেতুর কাছ থেকে একটা জবাবের আশায় চুপ করে। খেতি-জমি ইত্যাদির ব্যাপার বলেই তিনপুরুষের আধিয়ার খেতখেতুর সঙ্গে পঞ্চায়েতের যেন একটা মত-বিনিময় চলতে পারে। খেতখেতু জিজ্ঞাসা করে 'কেনে ?'

'ধর কেনে, জমিদারি আইন হইল। কী ? না, মাথাপিছু পঁচিশ একর রাখিবার পারিবেন। হামরালা সগায় বাড়ির মানষিগুলার আলাদা-আলাদা জোত ধরি দিছু। ক কেনে, দিছু কি দেই নাই ?'

'হয় হয়, দিবা পারেন।'

'তার বাদে যুক্তফ্রন্টের আইন হইল, কি, না বেনামা জমি আর লুকানা জমিন হাসিল কর।'

'হয় হয়, আইন হইল। আইন ত হইল কিন্তক মোর আধির জমিই ত কমি যাবার ধরিল।'

'আরে, আগত আইনে মোক বলি দিবার ধরিল জমিটা একোটা নামত না রাখি ছড়ি দাও কেনে, নানা নামে রাখি দাও, নামে-নামে ছড়ি দাও, নাম কাটাও, জমি রাখি দাও।'

'হয়। রাখি দাও।'

'তাহা হইলে আর জমিটা লুকানা হইল কুনঠে ?'

'হয়। হয়। কিন্তক জমিনটা তো আর দারিঘরত সিন্ধাবে না।'

'হয়। হয়। জমিনটা ত আর দারিঘরত সিন্ধাবে না, ত, লুকাম কুনঠেরে ? হায় হায় জমিন কি লুকান যায় ?'

'হায় হায় জমিন ত লুকান না যায়, পঞ্চায়েত, কিন্তক মোর আধি জমিখান বছর-বছর কমি যাবার ধরিল কেনে।'

'তোর জমির কাথা ছাড়ি দে, উতো আধি জমি। এত কেনাবিচা হছে। যায় কিনিছে স্যায় খানিক বেচাবার ধরিছে। আর তোর আধি কমি যাছে। মুই ত আধিজমির কাথা কহিবার ধরি নাই খেতখেতু, মুই জোতজমির কাথা কহিবার ধইরছি।'

'হয় হয়, তুমি ত জোতজমির কথাটা কহিলেন। কহ কেনে।'

'ত জমি ত আর লুকানা না চলে। হয়। বেনামা চলিবার পারে। ত সরকারই ত আইন বানাইয়া কহি দিলা, হয়, জমি বেনামাত রাখো হে।'

'হয় হয়, কহি দিল ত সরকার।'

'ত এ্যালায় আবার আইন বানাবার ধইরছে, কি, না, বাড়িপিছু পনর

একর—'

'হয় । ত গিরির ঘরের সব মানষিই ত আলাদা-আলাদা ঘর —'

'হয়। কী কহিছিস ?'

'না। কহিছি কি, তুমি আর নবীন ত আলাদা ঘর। আইনত্।'

'হয়। আলাদা।'

'শুনিছু কি, কুকুরজানত জোতদার প্রধান মিয়া আছিল্ না ?'

'হয়। আছিল্।'

'উমরার ত তিন বিবি।'

'হয়। তিনবিবি।'

'তিনবিবির তিন না দুই-কম এককুড়ি-ছাওয়া-ছোট।'

'হয়। হবা পারে।'

'বড়বিবির আবার নাতির ঘর হবা ধরিছে।'

'হয়। ধরিবার পারে। পারে।'

'তা ধরো কেনে প্রধান মিয়ার ঘর হয়া গেইল তিন-না-পাঁচ বেশি এক-কুড়ি।'

'হয়। হবা পারে। পারে।'

'তা ধরো কেনে, তিন-না-পাঁচ-বেশি এককুড়ি ঘরত্ যদি ঘর পাছত্ পয়তা-লিশ বিঘার বেশি জমি থাকে, তয় সগায় মিলি কয় বিঘা হইল্। কও কেনে। মুই হিশাব জানো না।'

'তা ধর হইল তর অনেক জমি। তুই বুঝিবার না পারিস।'

'তা ধরো এতত্ জমিখান, যায় মুই না বোঝো ?'

'হয়। অনেক জমি।'

'ত ধরো কেনে ঐ জমিদারি আইনখান বানাইবার ধইচছে কোন সনত ? বলো কেনে, কোন সনত ?'

'বাংলা তেরশ ষাট সন।'

'সেইঠে যায় জন্মাইছে, আজি তার বয়স কত হইল ?'

'ধরো কেনে, এক ব্যাটার বাপা হবা পারে। তিন-কি-পাঁচ বেশি এককুড়ি।'

'য্যালায় মাথাপিছু পঁচাত্তর বিঘা আইন আছিলেক স্যালায় ব্যাটাখান তোমার ঘরত্ আছিল্। ধরো কেনে নবীন। য্যালায় ব্যাটাখান জুয়ান হবার ধরিল, ধরো কেনে নবীন, স্যালায় তোমার পঁয়তালিশ বিঘা, আর ব্যাটাখানের পঁয়তালিশ বিঘা। যোগত্ কত হয় কও কেনে। মুই হিশাব জানো না।'

boiRboi.net

'তা ধর, হইল তর অনেক জমি। তুমি বুঝিবার না পারিস।'

'হয় হয়। মুই বুঝিবার না পারো। অনেক জমি। তা তোমার ব্যাটাও বাড়ে, জমিও বাড়ে।'

'হয় হয়। তুই কহিবার ধইচছিস কী? মোর ত একখান ব্যাটা।'

'হয় হয়। তবে ধরো কেনে, যেইলা মাথা-পাছত সিলিং, সেইলা তোমার ঘরত মাথা বেশি।'

'হয় হয়। সেইটা তা আইনের বিধান।'

'আর যেইলা ঘর পাছত সিলিং, সেইলা তোমার ঘর বেশি।'

'হয় হয়। সেইটাও তো আইনের বিধান।'

'মাথা হক, ঘর হক, গিরির জমি কমিবে না।'

'হয় হয়। তুই কহিবার ধইরছিস কী?'

'মুই যেইলা ছোট ছিলো, হাল ধরো, বাপা আছিল্, সেইলা হামরালার আধি জমি আছিল, ধরো কেনে, পঞ্চাশ বিঘা।'

'সব জমিতে চাষ আছিল্?'

'না হয়, না হয়, পতিত আছিল্। কিন্তুক আছিল্ ত পঞ্চাশ বিঘা।'

'বেশ। আছিল্।'

'আর এ্যালায় মোর ভাইব্যাটা চ্যারকেটু যেইলা জুয়ান, আর মোর বড় বেটাখান বৈশাখু, ধরো কেনে, তিন সনের বাদে হাল ধরিবার পারিবে, অ্যালায়, মোর আধিত আছে, ধরো, বড় জোর এক হাল্।'

'তা তোর গিরি উকিলবাবু মরি যাবার বাদে উমরার ব্যাটার ঘর জমি বেচি দিবার ধরিল যে। যায় কিনিবার ধরিল উমরায়ও বেচি দিল। তোর জমিত্ গিরি বাড়িলে ত তোর জমি কমিবেই রে খেতখেতু।'

'জমি ত গিরির, উমরায় বেচাবার চাহে ত বেচাক কেনে। জমি বেচাবার তানে তো জমিনের কুনো সম্বন্ধ নাই রো। টাকা দিয়া রেজিস্টারি অফিসত যাও কেনে, জমি বেচাকেনা কর। জমির বাদে জমি। বেচাকেনার বাদে বেচাকেনা। কিন্তুক জমির পাথে তো আধিয়ারটাকও কিনিবার নাগিবে। না, সগায় কহিবার ধরে যে নিজচাষ করিবেন।'

'এ্যালায় ত তোর শহরিয়া চাকুরিয়া মানষিলা সগায় জোতদার হবা ধরিছেন হে। আধিয়ার পুষিবার ঝামেলা নাই, চাষের সময় আর ধানকাটার সময় পাইসা দিয়া মানষিক লাগাও, কাম শেষ, মানষি বিদায়। আর মোক আধিয়ার পুষিবার নাগিবে, উমরাক ঘরবাড়ি দিবার নাগিবে, উমরাক খোয়াবার

boiRboi.net

নাগিবে। কায় অত ঝামেলা করিবে হে।'

'ত গিরিও নাই, আধিয়ারও নাই, জমিটা চষিবার ধরিবে কায় হে?'

'হয় হয়রে খেতখেতু, গিরিও নাই, আধিয়ারও নাই, চাষাবাদও নাই। এ্যালায় মুই ধান করিম, গম করিম—এফ্‌সি-আই আসি মোরঠে কিনি নিয়া যাবে। পাটা করিম—পাটার অফিস আসি কিনি নিয়া যাবে। মাছ করিম—মাছার এজেণ্ট আসি কিনি নিয়া যাবে।'

'মুই, খেতখেতু, কোটত যাম?'

'তুই ত নাই রো খেতখেতু, তুই নাই রো। মুই ছিলোঁ জোতদার, হয় ব্যাপারি—ধানা-পাটা-মাছার ব্যাপারি। তুই ছিলো আধিয়ার হবি মানষি—ধানা-পাটা-মাছার নগদ পাইসার মানষি। কাম করবু—পাইসা নিবু।'

'মোর বাড়িখান-টাড়িখান?'

'তোর ত গিরির বাড়ি হে, গিরির টাড়ি হয় হে, গিরি কহিলে চলি যাবার নাগিবে। এই সনত্‌ না যাস, পরের সনত্‌ যাবি। পরের সনত্‌ না যাস, তার পরের সনত্‌ যাবি। কিন্তুক যাবা তোর নাগিবেই। বুঝিলু খেতখেতু, যাবা তোর নাগিবেই।'

পঞ্চায়েতের কথায় সুর ছিল টানা, যেন, ধানখেত, বাঁশবাড়ি, বোর্ডরাস্তা, ধানখেত, বাঁশবাড়ি, ডোবা, ধানখেত, এই সবের দিকে তাকিয়ে সে কথাগুলি বলে, যেমন, খেতখেতু, পঞ্চায়েতকে বলছিল বাড়িঘরের কথা, ডোবাপুকুরের কথা, মাছচাষের কথা। আর এতক্ষণ কথা হচ্ছিল পরস্পরের দিকে না তাকিয়ে। খেতখেতু সেই খুঁটিতে হেলান দিয়ে, হাঁটুর ওপর হাতের কনুই ঠেকিয়ে, মুখ ঢেকে—আর পঞ্চায়েত তার পেছনে আসামি মুগা-চাদরে শরীর ঢেকে, খড়ম পায়ে। ঐ ধানখেত, বাঁশবাড়ি, ডোবা আর বোর্ডরাস্তাটাকে সামনে রেখেই যে যার কথাগুলি বলে, জবাব দেয়, রাগ করে বা রসিকতাও। পঞ্চায়েতের শেষ কথার কোনো জবাব খেতখেতু দেয় না। ধীরে-ধীরে নীরবতা দানা বাঁধতে থাকে।

সেই নীরবতার ভেতর খেতখেতু খুব ধীরে-ধীরে দুই পা মাটিতে নামায়। দুই হাতে খুঁটিটা জড়ানোই ছিল। একটু দম নিয়ে খুঁটিটার ওপর শরীরের সব জোর দিয়ে খেতখেতু প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে ত তার বেশ কিছু সময় লাগেই। প্রায় সোজা হয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে-সঙ্গেই খেতখেতুর পেটে একটা খোঁচা লাগে আর খেতখেতু সঙ্গে-সঙ্গে কোমরটা ভেঙে দেয়। আস্তে-আস্তে ডান পা-টা বারান্দার ওপর তুলে দেয়। ফলে পেটের ডান দিকের

boiRboi.net

পেশিটা একটু সংকুচিত হয়ে যায়। খেতখেতু পঞ্চায়েতের মুখোমুখি বটে কিন্তু পঞ্চায়েত তার দিকে ফিরেও তাকায় না। যেন এখন খেতখেতু স্বচ্ছন্দে বলতে পারে, 'মুই আষাঢ়ু হও' বা 'মুই জমিরুদ্দি হও'। পঞ্চায়েত যেন জানেই না, তার দিকে পাশ ফিরে এতক্ষণ খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বা নিজের হাঁটু জড়িয়ে কে বসে। বা, সেটা জানলেও তার মনে রাখার কথা নয়।

খেতখেতু দাঁড়ায় কেন, সেটা তার নিজের কাছেই খুব স্পষ্ট হয় না। এক হতে পারত অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকতে-থাকতে তার হাতে-পায়ে ঝিম ধরেছে। সেটা হতে পারে না, কারণ ঝিম ধরা বুঝতে হাতে-পায়ে যে-সাড়াটুকু থাকা দরকার গত দু-দিন ধরেই তার শরীরে সে-সাড়া নেই, এখন হাঁটলে বা দাঁড়ালেও ঝিম লেগেই থাকে। বা, সে-বিষয়ে খেতখেতুর কোনো জ্ঞান কাজ করে না। আর, হতে পারে এতক্ষণ খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে বসে-বসে কথাগুলি বলার ভেতর কেমন একটা অবিনয় আছে যেটা খেতখেতুকে হঠাৎ প্ররোচনা দিয়েছে—দাঁড়িয়ে পড়তে, হাজার হোক পঞ্চায়েত বলে কথা। কিন্তু খেতখেতুর শরীর মনের এমন সঙ্গতি বেশ কিছুদিনই ত নেই যাতে তার মনে কোথাও এই অসঙ্গতির বোধ জেগে উঠতে পারে। আর হতে পারে, পঞ্চায়েত তাকে কোনো-না-কোনোদিন জমি ছেড়ে যেতে হবে বলায় তার চলে যাওয়ার কথা মনে এসেছে। আবার, এও হতে পারে যে এখন সে সরাসরি পঞ্চায়েতের কাছে ধান কর্জ বা ফ্রি রেশনের পুরচি চাইবে। পঞ্চায়েত তখন বোর্ড রাস্তার দিকে তাকিয়ে, সেখানে তখনো মানুষজন চলেছে—শহরের মিটিঙে-মিছিলে। খেতখেতু সেই রাস্তার দিকে একবার তাকাতেই পঞ্চায়েত সেই ফাঁকে তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরালা যুক্তফ্রন্টের টাইমে কুনো পার্টি ধরো নাই কেনে হে?'

'ধরিবার তো চাহিছিল। ধরিবার পারো নাই।'

'চ্যারকেটুক কুনো পার্টি ধরি দাও নাই কেনে হে?'

'দিন কতক ত পার্টি ধরি ঘুরিবার ধরিছিল চ্যারকেটু। আজি এই পার্টি। কালি আরেক পার্টি। কিন্তুক ধরি থাকিবার পারে নাই।'

'স্যালায় জমি দখল কর নাই কেনে হে।'

'জমি তো কনেক আধিত্ আছিল্। আর দখল করিলেও তো রাখিবার না হইত, পঞ্চায়েত। যায় যায় দখল নিবার রইচ্ ছিল, স্যালায় ত দখল ছাড়ি দিছে। চাষ করিবার বলদ নাই, বিছন নাই, হাল নাই।'

'ঐ তানেই তো কহিবার রইচছুরে খেতখেতু, সেই জমিদারি আইন যেইলা টাইমত্ পাশ হইল, সেইলা টাইমত নিজচাষ শুরু করিবার কাম আছিল্।'

'কেনে পঞ্চায়েত, স্যালায় ত জোতদারি-আধিয়ারি ঠিকো আছিল্।'

'হয় হয় ঠিকো আছিল্। শুন কেনে। হিশাব বুঝ। হিশাব বুঝিস?'

'ছোট হিশাব বুঝিবার পার, বড় হিশাব না-পার।'

'ভবে শুন কেনে। জমিদারি আইন যেইলা পাশ হয়্যা গেইল সেইলা ত ঠিকাজমি সিকাজমি সগায় ছাড়ি দিবার ধরলে হে। যে-যার জমিজমা খাশখত্তিয়ান খণ্ডখত্তিয়ান করি রাখি দিল ত হে।'

'রাখি দিল ত।'

'তার বাদে যুক্তফ্রণ্ট আসি এই আধিয়ারক খেপি দিবার ধরলে।'

'ধরলে।'

'তার বাদে নাকশালিয়া আসি এই ধর কেনে মানষি-মজুরগুলোকে খেপি দিবার ধরলে।'

'ধরলে।'

'ব্যাস। তার বাদে এলায়, এখন গিরি আধিয়ার মজুর মানষি এই সব গোলমাল হইয়া গেল ত।'

'গেল ত।'

'এ্যালায়, এখন, সেই সব গোলমালের নিকাশের বাদে সগায় ঘরপাছত জমি ভাগা করিবার ধইচছে আর সগায় জমি নিজচাষত আনিবার ধইচছে আর আধিয়ার-মজুরমানষি গাঁও ছাড়ি চলি যাবার ধইচছে।'

'ধইচছে।'

'স্যালায় মোর মনত থায় কি, সেই হুই জমিদারি-উচ্ছেদ আইনের টাইমত এইলা কাথা কুথাও ঠিকঠাক আছিল যে পঁচিশ বছর বাদত্ জমিটা নিজ চাষে নিবার নাগিবে, আর আধিয়ারি চলিবে না।'

'চলিবে না।'

'ত যেলায় পঁচিশ বছরের আগত জমিটা নিজচাষে নিবার পারিত, স্যালার এত্ত হুড়হাংগাম কুছু হবার হইত না।'

'হইত না।'

'তাই কহিছুরে খেতখেতু, মোর আগত নিজ চাষ শুরু করার কাম আছিল্ আর তোক জমি ছাড়িবার নাগিবে। এই সনত ত এই সনত, না ত এর পরের সনত। না ত তার পরের সনত।'

'মোক্ যাবা নাগিবেই?'

'হয়। হয়। নাগিবেই।'

boiboi.net

'জমি ছাড়ি চলি যাবার নাগিবে ?'

'জমি ছাড়িবার নাগিবে।'

'বাড়ি ছাড়ি চলি যাবার নাগিবে ?'

'বাড়ি ছাড়িবার নাগিবে—বাড়ি ত গিরির।'

'টাড়ি ছাড়িবার নাগিবে ?'

'নিজের বাড়ি না থাকিলে কি আর টাড়ি থাকে রে খেতখেতু।'

'তা মুই অধবাবিধবার নাখান হয়্যা যাম।'

'তা কহিবার পারিস, যার বাড়ি-টাড়ি নাই স্যায় ত অথবা-বিধবা বটেই।'

'মুই অধবা বিধবা হম।'

বলে খেতখেতু থেমে যায়। কিন্তু খুঁটি থেকে তার হাত সরায় না। ডান কুঁচকির ওপরে একটা ভাঁজ ফেলে রাখে। এই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার ভেতর কোথাও কোনো প্রক্রিয়া ঘটে থাকে, যাতে খেতখেতু ডাকে, 'পঞ্চায়েত।'

'ক কেনে, ক।'

'মুই ত অধবা বিধবার নাখান।'

'তা কহিবার পারিস বটে হে খেতখেতু, তুই ত অধবা-বিধবা নাখান, বাড়িটাড়ি থাকিবে না।'

'তা তোমার অঞ্চল অফিসং ত অধবা-বিধবার তানে ফ্রি রেশন। মোক ফ্রি রেশনের একখান পুরচি দাও।'

পঞ্চায়েত চিৎকার করে ওঠে, 'তুই জানিস না খেতখেতু ফ্রি রেশন মুই না দিবার পারো। এক অধবাবিধবাক টুটাএকটা দিবার ক্যাপাসিটি মোর আছে। কিন্তুক সে কোটা তো শেষ।'

'কিসের কোটা ?'

'কয়টা ফ্রি-রেশন মুই দিবা পারি।'

'কয়টা অধবাবিধবার ভোখ পাবে, কতখান করি ভোখ পাবে তাও তোমার কোটা আছে নাকি, পঞ্চায়েত হে ?'

'আছে, আছে, সরকারের সগায় কোটা আছে হে। তুমি একখান জ্যান্ত আধিয়ায়—তোমার বেলায়ও ত নিয়ম খাটে।'

'এ্যালায় না আপনি কহিলেন মুই অধবা-বিধবা।'

'কিন্তুক তুই ত আধিয়ার। আধিয়ারক ফ্রি রেশন দিবার নিয়ম

নাই রো।'

'মুই আধিয়ার ?'

'ঐ হইল্, হছিস, একটা কিছু।'

'মুই আধিয়ায় ত মোক ধানকর্জ দাও।'

'হয়-হয়, কী কহছিসরে খেতখেতু, কী দিম ?'

'কর্জ দাও কেনে।'

'তুই কি মোর আধিয়ার।'

'মুই এই সনত্ কার আধিয়ার জানো নাই। আমি আধিয়ার। তুমি গাঁওয়ের জোতদার। তুমি হামাক, হামাক কর্জ দাও।'

'তোক কর্জ দিবার উপায় নাই রো। তোক মুই কর্জ দিম না। তুই মোর অধিয়ার না হছিস, কার আধিয়ার মুই জানো না। তোক কর্জ দিম না।'

'মুই আধিয়ার ত মোক কর্জ দাও। মুই অধবাবিধবা ত মোক ফ্রি রেশন দাও।'

'ত যা কেনে, অঞ্চল অফিসৎ যা। বুঝিসুঝি বল। বলি-কওয়া করি দেখ কেনে, একখান ফ্রি রেশন পাস কি না-পাস।'

'তুমি পুরচিখান না দিলে ত মোর কাথা অঞ্চল অফিসৎ কায়ও শুনিবে না।'

'যেইলা এইঠে কহিছিস, ঐলা ঐঠে ক কেনে, সগায় শুনিবে।'

খেতখেতু যেন হঠাৎই থামটা থেকে হাত সরিয়ে নেয় ও সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে গিয়ে হাঁটতে শুরু করে। হয়ত পেছনে ঘুরেছিল বলেই হাতটা খসে গিয়েছিল। তারপর তরতর করে রমণী পঞ্চায়েতের বানানো উঁচু রাস্তা দিয়ে বোর্ড রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়। যেন সেই মুহূর্তে তার পেটে আলসারের ব্যথা ছিল না। বা তার পেটে দু-তিনদিনের খিদে ছিল না। এমন-কি, সে যেন রমণী পঞ্চায়েতের কাছে কর্জ ধান বা ফ্রি রেশনের জন্যেও আসে নি। এমন-কি যেন, সে, খেতখেতু, তিনপুরুষের আধিয়ার, তিনপুরুষ ধরেই তার একটাই বসত ভিটে, তিনপুরুষ ধরেই সে এই এলাকার জমিতে কখন চাষ দিতে হয়, রোয়া গাড়তে হয় আর আজকাল সার ছিটতে হয়—সে জানে, এমন-কি সে জানে, পাকা ধান খেতে টিয়া পাখির ঝাঁক কার্তিক-অঘ্রানের প্রথম শুক্লপক্ষে আসে, যদি ধান পাকা থেকে কাটাটা কৃষ্ণপক্ষেই হয়ে যায় তাহলে আর টিয়ার ঝাঁকের ভয় নেই, নইলে রাতদিন পাহারা দিয়ে পাখি তাড়াতে হয়, এমন-কি, ধানকাটার পরের দিন ধানকাটা নাড়া মাঠ দিয়ে যখন সে লম্বালম্বি পা ফেলে কোনাকুনি রাস্তা

boiRboi.net

ধরে দূরের কোনো আল ধরার জন্য—তখন রমণী পঞ্চায়েত, জমিরুদ্দিন জোতদার, নরেন সরকার আর তার হাঁটার কোনো পার্থক্যই থাকে না—যেন দশ-বিশতলা বাড়ি তৈরি করার সময় আলসে দিয়ে হেলাভরে রাজমিস্ত্রির হেঁটে যাওয়া, শূন্যতা মাড়িয়ে হাঁটা মনে হয়, কিছু চাইতেই আসলে আসে নি এখানে রমণী পঞ্চায়েতের কাছে, তার খিদেও নেই, আলসারও নেই, বরং আসলে রমণী পঞ্চায়েতই তার কাছে প্রার্থী হয়ে যায় তখন, জোতদারি ছেড়ে মাছচাষ আলুচাষের সমর্থন চায়, কখন ভূমি আইনের মারপ্যাঁচে খেতখেতুই উচ্ছেদ হবে সে কথা বলে, আর শেষে খেতখেতুকে ধানকর্জ ত দিতেই পারে না, এমন-কি কোটা শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ফ্রি রেশনের নেহাতই একটা পুরচিও দিতে পারে না, পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের বাড়ি ছেড়ে সেই নতুন রাস্তা বেয়ে যখন সে এগয় তখন রাস্তাটাকে তার খালি-খালিও মনে হয় না কারণ তখন তার সামনে বোর্ড রাস্তা আর বোর্ড রাস্তা দিয়ে আলগা-আলগা মানুষজন চলেছে বটতলিতে—সেখানে শহরের মিছিলে-মিটিঙে নিয়ে যাবার জন্য শহরের বাবুরা এসেছে ট্রাক নিয়ে। বোর্ড রাস্তায় উঠে খেতখেতু যাবে ডাইনে বেঁকে। বাঁয়ে বটতলি। চ্যারকেটু সেদিকে গেছে। আর তা ছাড়াও খেতখেতু যাবে অঞ্চল অফিসে, সাহেব বাড়িতে, করন সাহেবের বাড়িতে। খানিকটা হাঁটলেই নাউয়া-পাড়া।

কালকেটুর বাড়ির বাইরে কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভেতর থেকে খরবরু মাষ্টার চেঁচিয়ে ডাকে, 'হে কাকা, কাকা হে, শুনো কেনে, শুনো।' খরবরুর ডাক শুনেও খেতখেতু দাঁড়ায় না। খরবরু তাকেই ডাকছে কি না এ-বিষয়ে সন্দেহের চাইতেও খেতখেতুর আসল সমস্যা ছিল নিজের চলার বেগটা সামলানো। খরবরু রাস্তার ওপর উঠে আসে, 'হে কাকা, কাকা হে, আরে থামো না কেনে, শুনো, কাকা।' খেতখেতু ধীরে-ধীরে তার হাঁটার গতিটা সামলায়, 'হে কাকা কাকা হে, শুনো-না কেনে', খরবরু খেতখেতুর দিকে এগিয়ে যায়। খেতখেতু ততক্ষণে থামতে পারে। সে ঘুরে দাঁড়াবার আগেই খরবরু তার পাশে এসে দাঁড়ায়, 'কোটত চলেছু এ্যানং ঘোড়ায় চড়ি।' খেতখেতু কিছু একটা জবাব ভাবার আগেই খরবরু আবার বলে, 'চলো কেনে, বাহে বাবু আসিছেন মিছিল নিগাবার তানে, চলো কেনে মিছিল ধরি।'

কোথায় যাচ্ছে সেই কৈফিয়ত দেবার দায় থেকে বেঁচে খেতখেতু বলে, 'মুই না যাও।'

'কেনে কাকা, হামরালা সগায় যাছি, তুমিও চলো কেনে।'

'তোরা যা কেনে। মুই না যাও।'

'কেনে, তোমরালা বাহে বাবুর পার্টি না হছেন?'

'মুই পার্টি পুটি না হই। মুই না যাও।'

এইবার খরবরু মাস্টার একগাল হাসে, 'ও হো নেংটি পিদ্ধি আছ বলি নাজ নাগিছে', বলেও যখন খরবরু হাসে তখন খেতখেতুর সন্দেহ হয় আসলে খরবরু তাকে খেপাবার জন্যই ডেকেছে। সন্দেহটা মনে আসতেই সে আরো নিশ্চিত হয়, নিশ্চয়ই তাই, নইলে তাকে মিছিলে নেয়ার জন্য খরবরু মাস্টারের কোনো মাথাব্যথা হওয়ার কারণ নেই।

'মুই না যাও', বলে খেতখেতু আবার হাঁটা শুরু কতেই খরবরু মাস্টার হো হো করে হেসে ওঠে, আর সঙ্গে-সঙ্গে কালকেটুর বাড়ির বাইরে যারা জমা হয়েছিল তারাও খরবরুর সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয়। ফলে, খেতখেতুর চলার পেছনে একটা ঠাট্টা সমবেত হাসিতে সেই গ্রাম্য রাস্তার বঙ্কিমতা, সেই পাকা ধান খেতের বিস্তার, আর সাহেববাড়ি পর্যন্ত খেতখেতুর যাত্রাপথের দীর্ঘতা জুড়ে যেন বেজে যায়। খেতখেতুর পেটের ব্যথাটা খোঁচায়। সে ডান পা-টা টেনে-টেনে চলা শুরু করে, থামে না। খরবরু তার গলা যতটা উঁচুতে তোলা যায় ততটা উঁচুতে তুলে শেষবারের মত চেঁচায়, "হে কাকা, তুমি কি নাচিবার ধরিছ হে—" আর তার পরই আবার সেই সমবেত হাসি ওঠে।

খেতখেতু ভাবে খরবরু ভারি সেয়ানা, এ্যালায় মোক খেপাবার ধরিছে। কিন্তুক মানষিগিলাও তো মোক খেপাবার ধরিছে। মোক কি পাগলাছাগলা নাখান নাগিবার ধরিছে? কেনে? প্যাটের সালসার তানে ন্যাংচাবার ধইরছু হে—সেই তানে? কেনে? মোক পাগলা লাগিছে কেনে? পাগলা লাগিছে কেনে?

খেতখেতু হাঁটতে-হাঁটতে ভাবে 'খরবরুখান এ্যানং হাসিবার পারে ক্যানং। ওর প্যাটত ভোখ নাই? খরবরু মাস্টার ত প্রাইমারি ইশকুলের মাস্টার, রোজ সকালবেলাত সাইকেল ধরি ইশকুলত যায়, কায় জানে কুনঠে। এইঠে ওর জমি আছে। যেইঠে ইশকুল, সেইঠেও জমি কিনিবার পারে। ধান মজুত করে। পাটার দালালি করে। ওর প্যাটত এই কাতিকা মাসত ভোখ নাই রো, ভোখ নাই।' খরবরুর কাছে ত সে ধান কর্জ চাইতে পারত! খেতখেতু হাঁটার গতিটা একটু শিথিল করে। না, পেছনে না-শোনা যায় খরবরুর গলা, না-শোনা যায় সেই হাসির হল্লা। পেছনে না ফিরেও, না দেখেও খেতখেতু বুঝে যায় খরবরুর কাছে আর ধান কর্জ চাওয়া যায় না শুধু এইটুকু কারণেই যে

তার আর খরবরুর মাঝখানে এখন রাস্তার দূরত্বটা বেড়ে গেছে। খেতখেতু আবার ল্যাংচাতে শুরু করে।

আলসারের ব্যাথাটা খেতখেতু ভুলতে পারছিল না বটে কিন্তু রমণী পঞ্চায়েতের বাড়ি যাবার সময়ও রমণী পঞ্চায়েতের বাড়িতে পেটের আলসারটা তাকে যে-রকম খোঁচাচ্ছিল—এখন তেমন খোঁচায় না। আবার হতে পারে, তখন খোঁচানোটা শুরু হয়েছিল বলে অত ব্যথা পাচ্ছিল, এখন খোঁচানোটাই সয়ে গেছে—ব্যথা তাই বোধ হচ্ছে না—যদিও পেটের পেশিগুলোকে সামলাতে কুঁচকিতে টান এড়াতে ডান পা-টা সে লেংচেই হাঁটে। লেংচে হাঁটার জন্য ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের বাঁ পাশটা আর গোড়ালির বাঁ দিকটা ছেঁচড়ে যাচ্ছে। খেতখেতু জানে ছেঁচড়াবে, বড় জোর একটু ছড়ে যেতে পারে, কাটবে না—ধান কাটার সময় শক্ত মাটিতে বসে-বসে পা হেঁচড়ে চলতে-চলতে, কত দিন ধরে এ-রকম চলছে তার হিশেব আর খেতখেতু করতে পারবে না, দিনগুলো এতই প্রাচীন। দুই পায়ের ভেতরের পাশটার বুড়ো আঙুল আর তার তলার ফোলা অংশটা আর গোড়ালি ও গোড়ালির ভেতরের দিকটা ফোস্কায়, কড়ায়, রক্ত-পাতে বিক্ষত আবার কড়া এমন লোহার মত শক্ত হয়েছে মাত্র মাইলটাক রাস্তা হেঁচড়ালে সে-পা দিয়ে রক্ত পড়বে না। আসলে সালসাটাও তো স্যানং। শরীরত যেইলা প্রথম খোঁচা লাগাছে স্যালায় চিত করি ফেলাছে। তারপর ধীরত-ধীরত উমরার খোঁচাখানার মতলব বুঝি নিছু। বুঝি নিবার নাগে, তাই বুঝি নিছু। অ্যালায় খোঁচার আগত টের পাই কুথন খোঁচাখান আসিবে।

খেতখেতু কীচকের ভিটার মোড়ে ডান হাত ভুরুর ওপর রেখে একটু দাঁড়িয়ে রাস্তাটা ভেবে নিচ্ছে। সোজা গেলে বরমডাঙা পার হয়ে জহুরির মোড়—সেখানে বাঁ হাতিতে বিরাট মাঠের মধ্যে মোষের উপর মোষ চড়িলে স্যানং উঁচা হবা ধরে স্যানং উঁচা-উঁচা, পঞ্চপাণ্ডবের নাখান, ট্রাক্টর, মরিচা ধরা, আছে, পড়ি আছে। সে আজ কতদিন তার কোনো হিশেব-নিকেশ খেতখেতু করতে পারবে না। হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হওয়ার পর-পরই, সেই প্রথম ভোটের পর জহুরিতে শহরের একদল বাবু এসে কো-অপারেটিভ তৈরি করে, যে যার জমি নিয়ে কো-অপারেটিভের মেম্বার হবে, সব জমি একজায়গায় আনতে হবে, তারপর ট্রাক্টার দিয়ে জমিচাষ করা হবে। বিরাট টিনের চালা তৈরি হল, শহরের দু-এক ঘর বাবু এখানেই থেকে গেল, দুই-এক ঘর বাবু রোজ শহর থেকে যাতায়াত করত। টাকা-পয়সা নিশ্চয় উঠল, জমি-জিরেত মাপামাপি

BanglaBook.org

হল, তারপর একদিন একসঙ্গে তিন-তিনটা ট্র্যাক্টর ট্রাকে করে এসে হাজির। এ হে, ক্যানং গর্জন। ধরো কেনে, পাঙ্গার ব্রিজের উপর দিয়া য্যালায় একা একটা ট্রাক আসিবার ধইচছে হুই চাউলহাটিত্ শব্দ শুনা গেইছে। ত লরি তিনখান তো আসি গেইল। তার বাদে সেই লড়িঠে ঐ ট্র্যাকটর তিনখান মাটিত নামানো হইল্। কী সে গঙ্গা-অবতরণ হে। তামান এলাকার মানষি আসি জমা হইছে। য্যান একখান মেলা বসি গেইছে। একবেলায় তিনখান্ ট্র্যাকটর ত নামান্ না-গেইল—একখান্ ট্রাক থাকি গেইল্ আর বাকিখানঠে পরদিন সকালত্ অবতরণ শুরু হইল্। কী সে অবতরণ হে। কী সে নামানো। তিনখান ট্রাক্টর যেইলা ঐ মাঠখানত নামি গেইল্, আর ভলানটিয়াররা সগায় মানষিগিলাক সরি-সরি দিবার নাগিল্, ঝ্যান রাজবাড়ির মনসা পূজার মেলা, আর ঐ তিনখান ট্রাক্টর ঐ মাঠৎ ফাঁকা হইয়া খাড়ি রহিল্, আর বাবুর ঘর ঘুরি বেড়াবার ধরিল্, স্যালায় মন্ত খায় কী, না পঞ্চপাণ্ডব আসি কুরুক্ষেত্রৎ খাড়ি হই গিছে—ছোট দুই ভাই কনেক আধেক ঘুরিব্যার গিছে। কয়েক দিনের বাদে নকুল-সহদেব আসি হাজির। আবার তামান এলাকায় মানষি আসি ভাঙি পড়ে। মেলা বসিবার ধরে। আর, পুরাপুরি পঞ্চপাণ্ডব দেখি মুই বাপাক্ পুঁছো, কী, না, 'বাপা হে এ্যানং বিশালিয়া-বিশালিয়া এঞ্জিন হামরালার বর্ষায় ভিজা নরম জমিৎ নামিবার ধরিলে জমি ভাঙি যাবু না? বসি যাবু না?' বাবা কহিল কি, 'চুপ যা কেনে। চুপ যা।' কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবক আর জমিত নামিবার হয় নাই। ট্রাক্টরগুলো ঐ মাঠেই ছিল। বাবুদের ভেতরই কোন গোলমাল নাকি জমিই পাওয়া গেল না, নাকি অন্য কিছু, কে জানত, একদিন শোনা গেল কো-অপারেটিভ উঠে গেছে। তারপর এতগুলো বছর ধরে কো-অপারেটিভের সেই লম্বা টিনের চালা থেকে টিন চুরি হয়েছে, খুঁটি চুরি হয়েছে। এখন পড়ে আছে লোহার কঙ্কাল আর পঞ্চপাণ্ডব। এখন ঘাসবনে অত বড়-বড় ঢাকা পর্যন্ত ঢেকে আছে। যে জানে না, রাস্তা থেকে দেখলে, তার মনে হতে পারে, আসলে ঘাস বনের মধ্যে পাঁচটা টিনের চালা কারণ তাদের চোখে ট্রাক্টরের মাথার চাকনিটাই শুধু চোখে পড়ে আর কখনো কদাচ স্টিয়ারিংটা। 'পঞ্চপাণ্ডব আসিল্, যুদ্ধ করিবার, আর করিবার ধইচছে বনবাস।'

খেতখেতু ভাবে সে সোজা সেই পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসের রাস্তা দিয়েই পাকা রাস্তায় উঠবে নাকি বাঁদিকে মোড় নিয়ে পদ্মনাথের খোলানের পাশ দিয়ে, প্রধান পাড়ার মধ্যে দিয়ে পাঙ্গার সেই আনারস খেতের বেড়ার পাশ দিয়ে কোনাকুনি পেরিয়ে পাকা রাস্তা ধরবে। প্রথম রাস্তাটা ভাল কিন্তু লম্বা। আর

দ্বিতীয়টার শেষদিকটাতে কোনো রাস্তা প্রায় নেই, ফলে খেত পেরিয়ে নালা ডিঙিয়ে যেতে হবে কিন্তু পথটা ছোট। খেতখেতু বাঁদিকে ঘুরে সেই ছোট রাস্তাই ধরে।

রাস্তাটা ধরে লেংচে-লেংচে হাঁটতে-হাঁটতে খেতখেতু আবার তার ভুরু জোড়ার ওপর হাত রাখে—এবার যেন বেলাটা বুঝতে, 'য়্যান, বেলাটা কুনো নতুন মানষি, পরখ করি দেখিবার নাগে। সূর্য ওঠার পরে তার গায়ের চামড়ায় রোদের তাপে তারতম্য ঘটতে থাকে। আর চামড়ায় সেই তারতম্য খেতখেতুকে বেলা সম্পর্কে প্রায় নির্ভুল অবহিত রাখে—সে পিঠ-বাঁকানো রোয়াগাড়াই হোক আর হাঁটুগাড়া ধানকাটাই হোক। শরীরে যেমন রোদের তাপ লাগে, তেমনি আবার 'বাও' লাগে। সকালের বাও এক রকম, দুপুরের 'বাও' আরেক রকম। সুতরাং শুধুমাত্র বেলা বুঝবার তাগিদে খেতখেতু ভুরুর ওপর তার হাত তুলতে পারে না।

'বেলা বুঝিবার তানে খেতখেতুর চক্ষু খুলার দরকার না হয়, গাওত বেলার তাপা বুঝি বলি দিবার পারে টাইম কত হইল। গাওত বাওয়ের ছোঁয়া পাইয়া বলি দিবার পারে বেলাখান কত হইল।

আর যদি তাপা কি বাও না বুঝিবার দেন ত গন্ধ শুঁকি বলি দিবার পারে বেলাখান কত হইল। সকালে মাটি থেকে যে গন্ধটা বেরয় সেটা ভেজামাটিয়া। তারপর বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে মাটি শুকোয় আর গন্ধ বদলায়। ভেজা মাটির গন্ধটা সোঁদা। আর শুখা মাটির গন্ধটা পাতলা ঝুরঝুরা। বেলা যখন পড়া শুরু করে তখন ঝুরঝুরা গন্ধটা আবার একটু থিতয়। সন্ধ্যা বেলার হিম যেমন দেখা যায় না কিন্তু ঘাসগুলো ভিজে যায় তেমনি বিকেলের দিকে মাটির গন্ধটা একটু থিকথিকে হয়ে ওঠে। অবিশ্যি 'চাদিনা' (ঢালু) বা 'পালান' জমিতে গন্ধটা যত গাঢ় হয়, বালি জমিতে তত হয় না। কাল মাটির গন্ধ পাতলা। রাত্রিবেলায় আর মাটির গন্ধ পাওয়া যায় না। তখন সবখানেই 'ওমের' কুয়াশার গন্ধ, মরচের গন্ধের মতন, ঠাণ্ডা অথচ শুখা, গলা দিয়ে জল নেমে গেলে যেমন শুখাটা নরম ঠেকে সেই মত, কোনো সময়ই নিশ্বাসটা ভারী হয় না, জ্বালা ধরেনা—তামাক খেত দিয়ে হেঁটে এলে হাতে একটা গন্ধ হয় যেমন, টনটনা রোদে ভেজা কাপড় শুকোলে কাপড়ে একটা গন্ধ হয় যেমন।

বেলা বোঝার জন্য খেতখেতুর কপালে হাত ঠেকাবার দরকার নেই। গায়ের চামড়া আছে, চোখ বেঁধে রাখলেও তাপ বুঝে বেলা ধরবে। বাতাস আছে, তাপ না পেলে বাতাস বুঝে বেলা ঠাহর করবে। নাক আছে, বাতাস না পেলে গন্ধ

দিয়ে বেলা ঠিক করবে।

কান আছে গন্ধ না পেলে শব্দ দিয়ে বেলা মাপবে। রাতের অন্ধকার পাতলা হলে বাইরে প্রথম শুরু হয় ঘাসপাখিদের ডাকাডাকি। তাদের গলা বেশিদূর ওঠে না। ঘাসের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। মোরগ ডেকে ওঠে রেলগাড়ির মত ঠিক-ঠিক সময়ে। আর দুটো-একটা গরুও ডাক দিতে পারে। খেতখেতুদের টাড়ির পশ্চিম পাথে মৈমুদ্দির গরুটা রাতশেষের ডাক দেয়। ওর বাছুরটা গত ঈদে কোরবানি হয়েছে। খেতখেতুর কানচাবাড়িতে একটা চিলিমিলি পাখি এসে বসে, মনে হয়, খেতখেতুকে বা আর-সবাইকে ডাকছে, বাড়ির বুড়ির মত বা বাড়ির সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটার মত, চিলমিল চিলমিল শব্দ তোলে, কাঁচা শালপাতার ওপর পাতলা বৃষ্টি পড়লে এ-শব্দ হয় একেবারে বাচ্চা ছেলের গলার শব্দের মত—যখন গলা দিয়ে কথা বেরয় না, কিন্তু আওয়াজ বেরয়, দিকে বলতে পারে না। চিলিমিলি পাখিটা এসে ডাকাডাকি করতে-করতেই, হয় ইস্কুল বাড়ির পেছনের আধা-খাওয়া গাব গাছ থেকে, বা নরেন সরকারের বাড়ির বেলগাছের মাথা থেকে, সেই পাখিটা গম্ভীর গলায় হাটুরা ডাক দেয়—'গোপাল ঠাকুর ওঠো, ওঠো।' পাখ-পাখালির ডাক, ঠিক যেন আলো। প্রথমে কানের ভেতরে কটকট করে, তারপর চালের ওপরে আর তারপরেই সারা এলাকায় একটা পাখির ডাকই শোনা যায়। বেলা বাড়ে আর পাখির ডাক, গরুর ডাক, খাসির ডাক, বাছুরের ডাক বেড়ে-বেড়ে ওঠে খেতময়। তারপর কোন্ এক সময় সব যেন থেমে যায়। তখন খেতে কাজ করলে শোনা যায় ধান বা পাট খেতের ভেতরে-ভেতরে, গাছগুলোর পাতার ছায়ায়-ছায়ায় ফর্‌র্‌র্‌ ফর্‌র্‌র্‌ আওয়াজ। ফড়িঙের মত ছোট-ছোট পাখিগুলো ধানগাছের বা ঘাসের ছায়ায়-ছায়ায় উড়ে বেড়ায় ধীরে-ধীরে। সেই সব পাখিরা ডাকতে থাকে যাদের বাসা বড়-বড় গাছের মাথায়। পাতার ছায়ায়-ছায়ায় বসে অনেকদূর পর্যন্ত তাকিয়ে-তাকিয়ে সেই সব পাখিরা টানা সুরে ডাকে। পুরা তিন প্রহর এই সব পাখিদের টানা-টানা, থামা-থামা ডাকের সঙ্গে চিলের চিৎকার ওঠে 'চি-র-রো-অ-অ।' তিন প্রহরের পর চিল আর ডাকে না। তখন পারোরা ক্ষেতে নেমে যায় আর বকম্ বকম্ করে ধান খুঁটতে শুরু করে। বিকেল যখন আবার সকালের মতন হয় তখন সেই সকালের পাখিগুলো আবার নেমে আসে। সেগুলোর গলা ঘাসের সঙ্গেই মিশে থাকে। আর 'বেলাঠাকুর যেইলা পাটত শরীরখান্ মেলি দিলেন' তখন ঝাঁক বাঁধা পাখিরা আকাশ জুড়ে ঘুরে ফেরে, তখন মাটিতে বা গাছে পাখিদের কোনো ডাক থাকে না, সব ডাক আকাশে। ঝাঁকের পর ঝাঁক টিয়ার টি-টি স্বর, ধানখেত আর

আকাশের গা বেয়ে বকের ঝাঁক—তাদের কোনো আওয়াজ নেই, শুধু পাখার শব্দ তোলে মানিকজোড়া। গলায় শব্দ হোক বা না হোক ঐ সব পাখিদের পাখার ঝাপটায় বাতাসে ঢেউ ওঠে আর সেই ঢেউ খেতখেতুর শরীরে এসে লাগে। টেলিগ্রাফের থামে কান দিলে তেমন সাঁ সাঁ সাঁ শব্দ ভেসে আসে তেমনি বিকেলে খেতখেতুর বুকে কান পাতলে আকাশ-বাতাস থেকে পাখিদের ওড়ার ধ্বনি, পাখার ধ্বনি, বায়ুস্পন্দনের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যাবে। ঐ পাখিরা মাটি থেকেই আকাশে ওড়ে, আকাশ থেকেই মাটিতে নামে, আকাশ আর মাটি জুড়ে থাকে বাতাস আর সেই বাতাস মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত শরীরে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, খেতখেতু রায়; তেমন-তেমন ক্ষেত্রে খেতখেতু রায় বর্মন, রেডিয়োর বাঁশের নাথান, বাতাসের কুনো শব্দ যেন পার না পায়, সগ্ শব্দগুলাক্ ধরি ফেলাও, হইনা মুই পাঁচবিঘা জমির আধিয়ার, পাঁচবিঘা জমিত্ ভাই-ব্যাটার বত্রিশ আনি মেহনতের ছয় সিকাই জাই যায় ত যাক তবু খেতখেতু রায় তেমন-তেমন ক্ষেত্রে খেতখেতু রায় বর্মন, 'চক্ষু-বুজি গাওত তাপ বুঝি কহি দিবার পারি বেলাখান কত হইল্, গন্ধ শুকি কহি দিবার পারি বেলাখান্ কত হইল, সেই খেতখেতুক অ্যালায় কপালত হাত ঠেকাইয়া দেখিবার নাগে বেলাখান কত হইল?'

কিন্তু রমণী পঞ্চায়েত বলে দিয়েছে, 'খেতখেতুক জমি ছাড়ি যাবার নাগিবে। আর জমি ছাড়িলে ত বাড়ি ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবেই। আর বাড়ি ছাড়িলে ত টাড়ি ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবে। আর টাড়ি ছাড়িলে ত গ্রাম ছাড়িবার নাগিবে নাগিবেই। আর গ্রাম ছাড়িলে ত অঞ্চল ছাড়িবার নাগিবেই নাগিবে। আর অঞ্চল ছাড়িলে ত এই ভুবনই ছাড়ি যাবার নাগে,' খেতখেতুর এই সনাতন ভুবন দেখতে বা এই ভুবন ছেড়ে চলে যাওয়া মানে আসলে কত দূরত্ব চলে যাওয়া সেটার ঠাহর একবার নিতে তাকে এখন ভুরু ঢাকতে হয়।

খেতখেতুর ত কখনো দূরত্বের হিশেব কষে হাঁটা স্বভাব নয়—স্বভাব হাঁটতে-হাঁটতে দূরত্বে পৌঁছে যাওয়া। খেতখেতু বলতে পারে না তার ঘর থেকে অঞ্চল অফিসের দূরত্ব কত। এই বনিজের হাট, বনিজের হাটের পরে বরমডাঙা, বরমডাঙার পরে জহুরিকলোনি, তারপর বাসরাস্তা, বাসরাস্তায় প্লেনঘাঁটি, তারপর সাহেববাড়ি, করনসাহেবের বাড়ি অঞ্চল অফিস। বা এই কীচকের ভিটে, এই পদ্মনাথের খোলান, এই প্রধানপাড়া, আনারস বাগান, প্লেনঘাঁটি, তারপর সাহেব বাড়ি, করন-সাহেবের বাড়ি, অঞ্চল অফিস। যেতে-আসতে একবেলা। আর প্রধান সাহোবর কাছে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে সেটা হিশেবের বাইরে।

BanglaBook.org

এখন কার্তিকের পুরো মাস, হিমে ধানগুলো সারারাত নেতিয়ে থাকে, আলের ওপরও। সকালে রোদে হাওয়ায় ধীরে-ধীরে হিম শুকিয়ে যায়, ধান-খেতটা দেখতে-দেখতে ঝরঝরে হয়ে ওঠে, আর রোদটা একটু চড়া হলে ও বাতাসটা একটু-আধটু জোরালো হলে, সারাটা ধানখেত একেবারে ফুরফুরে হয়ে ওঠে, কোথাও কোনো ভার নেই। কিন্তু হিম-শুকনো ঝরঝরে ফুরফুরে কার্তিকা ধানখেতের ওপর দিয়ে চোখটা মেলতেই খেতখেতুকে বুঝে নিতে হয় ভার একটা আছেও বটে, ভার একটা হয়েছে। ধানখেতটার স্বর্ণবর্ণ হলুদে একটু কালচে ছোপ লেগেছে, বৈশালী (বর্ষার) মাসগুলোতে গাছপালার রঙের সবুজ যেমন ঘোর হয়ে ওঠে, যেন এই ধানখেতের হলুদটা একটু বাসি, একটু থিতনো, একটু জমাট। এটা দেখানোও যায় না, বোঝানোও যায় না। রোজ এই বিকেল থেকে হিম পড়ে-পড়ে আর শেষরাত থেকে কুয়াশায় কুয়াশায় যে-খেতের ওপর-কার সমস্ত ধুলোময়লা ধুয়ে যায় আর রোজ সকালের খটখটে রোদে যে-ধানখেত ফটফটে ঝিরঝিরে হয়ে ওঠে সেখানেই কোথায় হলুদের জলন্ত আভা একটু মলিন দেখায়—তা দেখানো যায় না, বোঝানো যায় না, কিন্তু নির্ভুল দেখা যায়, বোঝা যায়। দেখা যায়, খেতের ওপর নজর না রেখেও, না খুঁজেও—ধানখেতের ওপর প্রতিফলিত হয়ে যে-আলো চোখে এসে লাগে সেই আলোতেই টের পাওয়া যাওয়া যায়, ধানের শিষ দেখা দিয়েছে আর দিনে-দিনে সেই শিষ কাল হচ্ছে। আর এখন ত খেতখেতু এই ধানখেতটার ভেতর কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে ভেসে চলেছে। সে দেখতে না-চাইলেও কালচে ধানের শিষ তার গায়ে এসে লাগে, আলের ওপর পড়ে। আর সেই গোছা-গোছা ধানের শিষের কালচে রঙ ধান-খেতটার ওপরের জলজলে হলুদের ভেতরে-ভেতরে প্রধান হয়ে উঠেছে। যখন শিষ বেরয় তখন শিষের রঙটা ধানখেতের সঙ্গে মিশে থাকে—সবটাই স্বর্ণহলুদ। কিন্তু তারপর অতি দ্রুত রঙ বদলায়। শিষ দেখা দেয়া মানেই ধানের ভেতরে দুধ এসেছে। চার-পাচ দিন ধরে এই পাতলা দুধ ধানের ভেতরে প্রায় টলটল করে। তখনই ধীরে-ধীরে ধানের শিষের হলুদের উজ্জ্বলতা মরে আসে। চার-পাঁচদিন পর থেকে দুধটা থিকথিকে হয়ে আসে। আর আরও চার-পাঁচদিন গেলে দুধটা শক্ত হয়ে ওঠে। শিষ দেখা দেওয়ার দশদিনের মাথায় ধানের চাল শক্ত হয়ে যায়। শিষ দেখা দেওয়ার বিশদিনের ভেতর ধান কাটতেই হবে, নইলে চাল তুষ হয়ে যায়। আর ধান কেটে ফেলার পর ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ মাত্র দশদিনের ভেতর শেষ করতেই হবে। ধানের দুধ শক্ত হয়ে উঠতে শুরু করলে, ধানখেতের হলুদের ভেতরে কালচে ভাব ধরা পড়ে যায়। ধান-

খেতটার ওপর দিয়ে খেতখেতু ত অগত্যা তাকিয়েছে—সে তাকাতে চায় না। কিন্তু না তাকিয়ে তার আর গতি কী? সে যায় কোথায়? সে যে খেতখেতু এটা বুঝে নেয়ার জন্যই একবার তাকিয়ে তাকে জন্মান্তরের পরিচিত এই ধান-খেত দেখে নিতে হয়—এখন ধান খেতের ওপরে হলুদাভা কিন্তু ভেতরে মাটির ওপরে তাকালে কালচে দেখাবে কারণ চালের ভারে ধানের শিষ নীচের দিকে ঝুলে যায়। খেতখেতু চোখ তুলেই বুঝতে পারে আরো অন্তত দিন-আটের ভেতর এই ধানে হাত দেওয়া যাবে না। কিন্তু তাকানোর সেই প্রথম মুহূর্তে এই আট-দশদিন সময়টা খেতখেতুর কাছে প্রধান ঠেকে না, আট-দশদিন সময়টার সঙ্গে তার কোনো ব্যক্তিগত যোগ নেই যেন—তাকানোমাত্র তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে এই ধানখেতগুলোতে আগামী আট-দশদিন পর থেকে যে-কাজকর্ম শুরু হবে, আর যে-কাজকর্ম চলতে থাকবে আগামী মাস দুই ধরে। অনিশ্চিত ক্ষুধা নিয়ে, আলসারের ব্যথা নিয়ে, যে-কোনো সময় মুখ দিয়ে রক্ত গড়াবার আশঙ্কা নিয়ে খেতখেতু কিছু সময় অন্তত এই আগামী কার্যক্রমের এক-জন অংশী হিশেবে থেকে যেতে পারে আর ভুলে যেতে পারে যে সে কোথায় চালের খোঁজে যাচ্ছে।

কিন্তু সেই ধানখেতের ওপর দিয়ে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে ধীরে-ধীরে তার মুখের ভেতরটা জলে ভরে উঠতে থাকে। মুখের ভেতরে কোথাও রসক্ষরণ হয়, একটু টকটক লাগে, সেটাও সে প্রায় বুঝতে পারে না। কিন্তু সেই টক জল গলার ভেতর দিয়ে নামতে গেলে পেটের ভেতর থেকে একটা ওয়াক উঠে আসে আর ওয়াকটা গেলবার আগেই তার প্রায় সম্পূর্ণ খালি পেট কুঁচকে ওঠে আর আলসারের ব্যথাটা তীব্র খোঁচা দেয়। দুই হাতে, পেটটা চেপে ধরে খেতখেতু গলাটা বাড়িয়ে দেয়। তার কোনো চেষ্টা ছাড়াই ভেতর থেকে টক জল ওপরে উঠে এসে মুখের ভেতরটা ভরে তোলে। তবু খেতখেতু মুখটা হাঁ করে না। হয়ত তার আলসারটা ফাটল, এখন তার মুখ রক্তে ভরে যাচ্ছে হয়ত, হাঁ করলেই নিজের রক্ত নিজেকে উগরতে হবে। ক্রমে ভরে ওঠা মুখবিবরের জিভ-তালু-মাড়ি দিয়ে সেই টক স্বাদটাকে বুঝে নিতে চায় খেতখেতু, এটাই কি রক্তের স্বাদ? রক্তের স্বাদ নোনতা সেটা সে জানে, কিন্তু সে-নোনতা কি টক জলে মেশানো নোনতার মত? খেতখেতু একবার অনুমানের চেষ্টা করে নোনতা আর টক স্বাদের পার্থক্যটা কী, আর সেই অস্পষ্ট অনুমানের সঙ্গে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে ভেতরের মুখভর্তি জলের স্বাদটা কি নোনতা না টক, গত রাত, গত রাত থেকে মাঝেমধ্যেই সে যে-রকম জল বমি করছে—এবারের

জলের স্বাদটা কি সেই রকমই, না একটু অন্যরকম ? তিনদিন ধরে পেটে কিছু নেই খেতখেতুর, মাঝেমধ্যে শুধু জল খেয়েছে। এত বমি উঠে আসে কোত্থেকে ? পেটের ভেতরে শরীরে যত জল আছে সবই কি বমি হয়ে বেরিয়ে আসছে ? আর যখন সেই জল আর থাকবে না, তখনই কি আলসারটা ফাটবে এবং তখন শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে যেতে শুরু করবে ? তারপর শুকনো খটখটে মড়া হয়ে খেতখেতু পড়ে থাকবে—ভেতরে একটুও জল নেই। খেতখেতু মুখের ভেতরের বমিটাকে, সে জলই হোক আর রক্তই হোক, গিলে ফেলতে চেষ্টা করতেই গলনালীর দুপাশ থেকে উল্টো চাপ আসে, চোয়ালে একটা চাপ পড়ে আর নিজের অজ্ঞাতেই খেতখেতু হাঁ করে ফেলে ওয়াক দেয়। একটু আশ্বস্ত হয়ে দেখে, রক্ত নয়, তার মুখ থেকে শ্লেষ্মা-মেশানো জল উগরে বেরিয়ে পাকা ধানগাছগুলোর ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে, শ্লেষ্মাগুলো ধীরে ধীরে সুতোর মতো ধানগাছের শিষ ও পাতা থেকে শূন্যতায় ঝুলে যাচ্ছে। বমিটা থামে, খেতখেতু মুখ মোছে না, তার ঠোঁটে, থুতনিতে, বুকের ওপর শ্লেষ্মার সুতো শরতের কাশফুলের আঁশের মত লেগে থাকে আর বাতাসে একটু-একটু দোলে। শূন্য পেটের ভেতর-ভেতর এত রস থাকে ? দুই হাতে পেটটা চেপে ধরা ছিল, হাতটা না সরিয়েই খেতখেতু আবার চোখ তুলে সেই ধানখেতগুলোর ওপর দিয়েই তাকায়—কুনঠে যাম ! কুনঠে যাম ? এ্যানং ভোখ নিয়া মুই কুনঠে যাম ? পদ্মনাথ আছিল্ গিরি, হইছে নিজচাষি। অমনি আছিল্ পঞ্চায়েত, হইছে অমনী মেম্বার। নরেন সরকার আছিল্, জোতদার হইছে এজেন্ট। মুই ছিল খেতখেতু, খেতখেতুই আছো।

এই ধানখেত আর অন্তত আটদিনের আগে কাটবার মত হবে না। আটদিন মানে—আজি মঙ্গল আর একোটা বণিজের হাট, একোটা জহুরির হাট, একোটা তালমা হাট আর একোটা গৌরী হাট। এই চার-চারটে হাটে খেতখেতুর কিছুই কেনার বা বেচার নেই। কিছুই কেনাবেচার না-থাকার মানে তার তিন সাবালক আর তিন নাবালকের সংসারে—কায়ও-কায়ও মরি যাবা পারে। ছোট ছোয়াগুলো মরিবে না, উমরা ঘাটে মাঠে, মাঠে নদীতে, পোকা মাকড়ের নাখান ঘুরি-ঘুরি উড়ি-উড়ি আটোটা দিন কাটি দিবার পারিবে। যেইলা এই ধানখ্যাতত ফড়িংগা আর আতি বেলাত বাদুড় উড়ি বেড়ায়, যেনং এই তালমা নদীত্ মাছ ভাসি বেড়ায়, স্যানং করি ছাওয়া-ছোটর ঘর এই মাঠঘাট ধানখেতত্ ঘুরি বেড়াবার ধরিবে আর আটোটা দিন বাঁচি যাবে। এক খেতেশ্বরীখান ত এক্কারে ছোট, উমরায় অ্যানং করি ঘুরিবার পারিবে না,

উমরায় মরি যাবা পারে। চ্যারকেটুখান বাঁচি যাবে—উমরার বয়স কম, জোয়ান শরীর। টুলটুলি হুই সকালত বেরাছে। সারাদিন মাঠঘাট ঘুরি-ঘুরি উমরার কিছু পাবা পারে—উমরা বাঁচি যাবে। কিন্তু মুই মরিম, নিচ্চয় মরিম। আরো আটোদিনের কাথা ছাড়ি দাও কেনে, মুই আজিকার দিনটা বাঁচিম কিনা কায় জানে। একে আলসারিয়া, তায় ভোট। ডাক্তার কহিছে, ভোথ প্যাটত থাকিবেন না। অ্যালায় প্যাটত ভোথ ছাড়া কিছু নাই। বমি করিছু, জল বাহির করিছু, এর বাদে অক্ত (রক্ত) বমি করিম। কালা পিচের নাখান হাগিম। তার বাদে মরি যাম। দিগন্তজোড়া যে-ধানখেতের কিছু অংশ সেও নিজের হাতে চষেছে, ও কিছু ধান সে নিজের হাতে রুয়েছে, সেই ধানখেতকে খেতখেতু বলে—মুই যাছি হে, মরিবার যাছি।

কথাটা বলার পর হাঁটা শুরু করে, নিজের দু-পায়ে দু-চোখ আটকে। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই তাকে থেমে আবার ধানখেতের ওপর চোখ বোলাতে হয়—ধানখেতটা কেমন বদলে গেছে। আগে, এই দুপুরবেলার বাতাস উঠতে না-উঠতেই সমস্ত ধানখেতটা দুলে উঠত। ধানগাছের নোয়ানো মাথা দেখে বলে দেয়া যেত কোথা থেকে কোন বাতাস উঠছে, কোন দিকে কোন বাতাস যাচ্ছে, মাঠ-মাঠময় এই বাতাসগুলির হদিশ কী। আশ্বিন ও কার্তিক মাসে ধানখেতে মনে হয় বাতাসের বুঝি শরীর আছে। ধানখেতের পর ধানখেতে কোথা থেকে কোন বাতাস শরীর ছমছমিয়ে বয়ে-বয়ে যায়। কিন্তু এখন যেন ধানখেত আর তত পাতলা নেই, কোথায় যেন একটু থম ধরেছে। গায়ে লাগে-কি-লাগে-না বাতাসেও ধানখেতে যেমন তুফান উঠত, তা যেন ওঠে না। এখন বাতাসে খেতখেতুর গায়ে লাগছে কিন্তু ধানখেতে তেমন উথাল-পাতাল নেই। খেতখেতু একটু যেন হাসেই।—খ্যাতটা বদলি গেইসে। অ্যালায় ধানের শিষ ভারী হবা ধরিছে। শিষের গোছাটা খুলি গেইছে। চারিপাশে থ্যামথ্যামা ভাব ধরিছে। ধানখেত তা-ও দুলিছে—কিন্তু দুলিবার তানে আর ছিলিক-মিলিক নাই, ভারী দোলানি। খেতখেতুর যেন মনে হয়, এইমাত্রই ব্যাপারটা ঘটল, যেন এই মুহূর্তে সারাটা ধানখেত হঠাৎ ধানের ভেতর দুধের ভারটা বুঝতে পেরেছে, যেন এই মুহূর্তে বাতাস এসে ধানখেতের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কিন্তু শরীর পাচ্ছে না। আর ঠিক তখনই ধানখেতের বহু দূরবর্তী সেই দক্ষিণের কোণ থেকে একটা বড় মেঘের বৃহত্তর ছায়া ধানখেতটার ওপর দিয়ে হু হু ছুটে আসে আর খেতখেতুকে ঢেকে ফেলে আর-এক কোণের দিকে ছুটে চলে যেতে থাকে।

সেই মাঠময় মেঘচ্ছায়ায় খেতখেতু তাকিয়ে দেখে, তার সামনে আনীমায়

খাল (রানীমা-র খাল), গভীর সবুজ জল টলটলায়, রোদ্দুর চলকে-চলকে যায়, খেতখেতু তার বাপার সঙ্গে এই খালে সাঁতার শিখেছে। বেটিছোওয়ার ঘর গা ধুয়েছে, ছাওয়াছোটর ঘর সাঁতার শিখেছে, দিনের শেষে হালুয়ার ঘর স্নান সেরেছে। রানীমার খালটা ছিল বৃষ্টির জলের খাল, পাশাপাশি সব উঁচু জমি থেকে বৃষ্টির জল গড়িয়ে পড়ত, খালটা ভরে থাকত। আরো পশ্চিমে তালমা নদীর একটা সোঁতা বেরিয়েছে—দ্বারিকামারির খাল। দ্বারিকামারির খালটার সঙ্গে রানীমার খালটার একটা যোগ ছিল। একটু বৃষ্টি হলেই তালমার জল দ্বারিকামারির খাল দিয়ে রানীমার খালে এসে পড়ত। এই রানীমার খালটা ছিল খালের খাল, সোঁতার সোঁতা।

মেঘের ছায়াটা সরে যায়, আর পেছনে-পেছনে তীব্র রোদ ধাওয়া করে এসে খেতখেতুকে চমকে দিয়ে চলে যায়, আর খেতখেতু দেখে সামনে রানীমার খাল নয়, আসিন্দিরের পালান (নিচ) বাড়ি (জমি)—নদীর পাড়ের মত ধাদিনা (ঢাল) জমি গড়িয়ে নদীখাত পর্যন্ত গেছে আর ধাদিনা বেয়ে ওপরে উঠেছে। শুখা খালের খাদ। ছিল বৈকণ্ঠপুর এস্টেটের রানীর খাল, এখন হয়েছে পদ্মনাথের জোয়াই আসিন্দিরের পালান বাড়ি। ভেস্টেড জমি। আসিন্দিরটা দখল রেখে চাষ করে। শুকনো ধানগাছগুলো ক্রমেই নীচে গড়িয়ে গেছে বলে খেতখেতু একেবারে মাটি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। বছর কয়েক আগে আসিন্দির যখন চাষ শুরু করে তখন রটিয়েছিল 'ডিসপুট' জমি। কে জানে মামলা আছে কী নেই। আগেও কেউ এসে বলে নি এটা আমার খাল, পরেও কেউ এসে বলে নি, এটা আমার খাল। মাঝখান থেকে আসিন্দির আধি দিয়ে চাষ শুরু করে। বছর সাত আগে এই পালান বাড়ির 'হালুয়া মানষিগিলার' জন্য পাট্টা নেয়ার খুব গোলমাল শুরু হয়। আসিন্দির এই শুখা খালে যাদের আধি দিয়েছিল তারা রোজ মিটিং-মিছিল শুরু করে আর বি-ডি-ও অফিসে যায়। পরে জানা গেল, এটা সত্যি সত্যি 'ডিসপুট' জমি, পাট্টা পাওয়া যাবে না। যারা আধিয়ার ছিল তারা বলদ-বিছনের অভাবে অন্যের জমিতে খাটতে চলে গেল। তার পরের বছর আসিন্দির সম্পূর্ণ নিজচাষে লোক লাগিয়ে হাই-ইল্ডিং করল। কোনো আধি বন্দবস্ত নেই, ধানের ভাগ নেই, নগদ পয়সার কাম। 'রানীমার খাল' পাকাপাকিভাবে হল 'আসিন্দিরের পালান বাড়ি।'

এই বিভ্রমে খেতখেতু চমকে একবার চারপাশে তাকায়, তার পক্ষে যতটা চমকানো সম্ভব। এখন, এই দুই প্রহর বেলায়, এই—নিধুয়া ধানখেত ছ্যাম-ছ্যামা, কোনো জনমনিষ্যি নাইরো, আকাশে চিলও না ডাকে—খেতখেতুর পা

কেঁপে ওঠে, বুকটা ধড়ফড়ায়, পেটটা কোঁচকায়। কিন্তু সে আলের ওপর বসে পড়ে না। খেতখেতু জানে, এই আলটার ওপর একবার বসে পড়লে সে আর উঠতে পারবে না। এখন দাঁড়িয়ে থাকলেও সে টলে পড়ে যাবে। সুতরাং তাকে হাঁটতেই হবে, টলে-টলে কেঁপে-কেঁপে হলেও হাঁটতে হবে, হেঁটে কোনো-রকমে এই ধানখেতটা পেরিয়ে বোর্ডের রাস্তায় উঠতে হবে। খেতখেতু মরবে নিশ্চয়। কিন্তু এই পাকা ধানখেতের ভেতরে মরা ভাল নয়। এই পাকা ধানখেতে এখন থম ধরেছে, বাতাস—'বাও'—খেলতে পারছে না, তাই বাওদেও-এর রাগ হতে পারে। খেতখেতুর সারা শরীর বমিত্ 'ছুচিয়া', সারা শরীর বমিতে চটচটাচ্ছে, মুখের ভেতরে সবুজ পিত্তের তেতো, আর—ছ্যাম-ছ্যামা ধানখেত, শুনশুনা আলি—এই সময়ই ত ভুলা মাসান এসে পথ ভোলায়। খেতখেতুর সন্দেহ হয়, সে কেন মেঘের ছায়ায় আচ্ছন্ন আসিন্দিরের পালান বাড়িকে ভাবল রানীমা-র খাল-ই, এ-রকম ভাবেই ভুলা মাসান পথ ভোলায়, তখন এই ধানখেতের ভেতর পাক দিয়ে-দিয়ে ঘুরতে হবে, পথ পাওয়া যাবে না আর একবার পেছনে তাকালে বা পেছন থেকে কোনো ডাকে সাড়া দিলে সঙ্গে-সঙ্গে ভুলা মাসান এসে ঘাড় মটকে ফেলে রেখে যাবে। খেতখেতু পুব পাকে নরেন সরকারের গাবগাছটা আর দক্ষিণে ইস্কুল বাড়িটা দেখে দিক ঠিক করে টলে-টলে হাঁটতে শুরু করে। খেতখেতুর মনে হয়, পিছিয়ে গিয়ে একবার বমির জায়গাটা দেখে আসে, সে একই আলে আছে কি না। হাঁটার গতিটা একটু কমিয়ে আনলে খেতখেতু থামে না। হঠাৎ তার মনে হয়, ভুলা মাসান তার পেছনে ইতিমধ্যে এসে থাকতে পারে, এখন বুঝতে দেবে না, আলের বাঁকে-বাঁকে, ধান গাছের আড়ালে-আড়ালে পেছন-পেছন আসবে। আসলে পরীক্ষা করবে, খেতখেতু এই জায়গার লোক কি না। যদি এই জায়গার লোক বলে বোঝে তাহলে কোনো-এক সময় পেছন থেকে সরে যাবে, নিজের জায়গার লোককে মাসান কিছু বলে না। কিন্তু যদি বোঝে 'পরদেশী' তাহলে আর রক্ষা নেই ; আড়ালে-আড়ালে মাসান ঠিক চলতে থাকবে। তারপর যেই সেই লোকটি ভুল পথে পা দেবে, বা একটা ভুল বাঁক নেবে, বা যে-পথ পেরিয়ে এসেছে ঘুরে আবার সেই পথের দিকে ফিরবে, সঙ্গে-সঙ্গে মাসান একেবারে তার পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে। লোকটা বুঝতে পারবে পেছনে-পেছনে কেউ আসছে, পেছনে থেকে মাসান ডাকতেও পারে—খুব চেনা কারো গলা নকল করে, আর পেছনে পায়ের শব্দ শুনে বা কারো ডাক শুনে লোকটা থমকে গেলে বা পেছন ফিরলে দেখবে কোথাও কেউ নেই, সবদিক থমথম করছে। লোকটা তখন ভয় পাবে,

boiRboi.net

যত ভয় পাবে মাসান তত তার গা ঘেঁষে চলবে, যত ভয় পাবে লোকটার ঘাড়ে মাসানের নিশ্বাস ঠেকবে, যত ভয় পাবে লোকটা তাড়াতাড়ি চলবে, শেষ পর্যন্ত দৌড়বে, আর তখনই তার অবধারিত মৃত্যু। এই ধানখেতের ভেতর পাক খেতে-খেতে, পাক খেতে-খেতে এক সময় লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে, মাটির ওপর চেপে যাওয়া নাকটা সরাতেও পারে না, দম আটকে বা দম ফেটে মারা যায়। কখনো-কখনো দেখা যায় ঘাড়টা মটকানো। সুতরাং মাসান তাড়া করলে বা মাসানের নজরে পড়লে মাসান যেন কিছুতেই বুঝতে না পারে যে তার শিকার টের পেয়েছে। মাসানের নজরে পড়লে হাঁটতে-হাঁটতে থমকে থামা চলবে না, হঠাৎ পেছন ফিরে তাকানো চলবে না, পেছন থেকে কেউ ডাকলেও ঘাড় ঘোরানো চলবে না, ঘাড়ের ওপর মাসানের নিশ্বাস পড়লেও দৌড়নো চলবে না। মাসানের নজরে পড়লে যেমন গতিতে মানুষ সাধারণত হাঁটে তেমনি গতিতে দু-পাশে তাকাতে-তাকাতে হাঁটতে হবে—যেন নিজের জমিদারি, সামনের বা পাশের দিকে তাকিয়ে মুখ খারাপ করতে হবে, পেছন থেকে খুব চেনা কোনো মানুষের গলায় কেউ ডাকলে বা মুখ খারাপ করলে সামনের দিকে মুখ রেখে, পথ চলতে-চলতেই পাল্টা কথা বা মুখ খারাপ করতে হবে। মুহূর্তের জন্যও যেন মনে না হয় যে সে পরদেশী।

এইসব মনে রেখে হাঁটতে থাকে খেতখেতু। চারদিকের যে-ধানখেত এতক্ষণ দিগদিগন্তব্যাপী প্রান্তর ভরে রেখেছিল, সেই ধানখেত এখন সেই প্রান্তরব্যাপী শূন্যতার অংশ। কোথাও কোনো মানুষ বা পাখি নেই। আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত একটা থম ধরা ভাব। খেতখেতুর গা-টা শিউরে ওঠে। তাহলে কি সত্যি তার পেছনে-পেছনে মাসান আসছে, ভুলা মাসান, নইলে এমন কি পিঁপড়েরাও পথে নেই কেন?

খেতখেতুর একে আলসার, তাতে ভোখ, তাতে আবার এখন মাসান। —'অ্যালায় মোর বাঁচিবার আর কুন্থ আশা নেই। এই তিনোটার কোনো একটার হাতত, মোক মরিবা নাগিবেই।' কিন্তু বিপদটা হল, তার আলসারের ব্যথার জন্য খেতখেতুকে মোটা আল বেছে ঘুরে-ঘুরে চলতে হচ্ছে—তাতে যদি পেছন থেকে মাসান ভাবে সে 'পরদেশী' এখানকার পথঘাট চেনে না?

খেতখেতু আবার ঘাড় তুলে বোর্ডের রাস্তায় নরেন সরকারের গাবগাছ আর ইস্কুল বাড়ির গেছনে সেই আধা-খাউয়াহয়া বটগাছ দুটো দেখে নেয়—এই দুটো যেন সবসময় তার বাঁয়ে ও সামনে বা সামনে ও ডাইনে থাকে। কিন্তু এমন বার-বার দিক ঠিক করতে গেলে পেছন থেকে মাসান আরো নিশ্চিত হয়ে যাবে সে

পরদেশী। খেতখেতু আবার দু-চোখ পায়ে আটকে হাঁটতে থাকে। মাথাটা ঝুলে থাকায় তার ভঙ্গিতেই একটা নিশ্চিন্তির ভাব আসে, যেন এই পুরো জায়গাটা তার পায়ের তলার এত চেনা যে চোখ বেঁধে দিলেও হাঁটতে পারবে। কিন্তু এত চেনা লোক যেমন ধানখেত উজিয়ে ছোট আল দিয়ে সোজা চলে যাবে—খেতখেতু ত তা যেতে পারছে না!

খেতখেতুর সামনে এখন ধানখেত অনেকখানি ঢাল বেয়ে উঠে তারপর আবার প্রসারিত হয়ে সে-ই দিগন্তে গিয়ে ঠেকে। ফলে দেখায়, ধানখেতটা যেন ঢাল বেয়ে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। সেই দিগন্ত, আকাশ ও ধানখেতের দিকে তাকিয়ে খেতখেতু উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে, 'মুই খেতখেতু রায়, স্থানং টাইমত খেতখেতু রায় বর্মন, বাপার নাম কান্দুরা, বুড়া বাপার নাম ভাদুরা, গ্রামসভা দ্বারিকামারি, অঞ্চল বাহাদুর, মৌজা বাহাদুর, পদ্মনাথের আধিয়ার আছিলো, ধর কেনে চারি পুরুষ, এ্যালায় মোর গিরি, গিরি না হয় গিরিনি, অ্যালায় মোর গিরিনির নাম···'হঠাৎ-ই থেমে যায় খেতখেতু, যেন তাকে থামিয়ে দেয়া হল, সে ত তার গিরিনির নাম জানে না। তা হলে, খেতখেতু যে এত বুদ্ধি করে আগেভাগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে রাখতে চাইল—সে চার পুরুষ ধরে এখানকারই লোক, যাতে মাসান মিছিমিছি আর তার পেছনে না ঘোরে—তাতে ত তার বিপদ আরো বাড়ল। নিজের গিরির নাম জানে না, সে কেমন আধিয়ার, আর যদি-বা জানত, সেটা ত এ-বছর বদলে যেতেও পার, 'কায় জানে ঐ গিরিনিখান্ জমিটা বেচি দিছে কি না'। খেতখেতু কথাটা বলেছিল একটু চেঁচিয়ে, যতটা চেঁচিয়ে হালের বলদকে সে ধমকায়, ফলে তার অসম্পূর্ণ আত্মপরিচয় সামনের সেই ঢালের গায়ে লেগে প্রতিধ্বনিত ফিরে আসে আর অপ্রস্তুত খেতখেতুকে ঘিরে ঘুরে, ঘিরে-ঘুরে, ক্রমোচ্চ গ্রামে আকাশ-মাঠময় শূন্যতা ভরে তোলে, অবশেষে করতালির বিলীয়মান শব্দে, মাথা নুইয়ে হেঁটে চলা খেতখেতুকে শূন্যতরতায় ফেলে রেখে আকাশে মিশে যায় বা ধানখেতে। আপনমনে হাঁটার ভঙ্গি অপরিবর্তিত রেখে খেতখেতু একটু তাড়াতাড়ি হাঁটে, যেন সে তার পরিচয়ের ভুলটা থেকে পালাতে চায়। একটু দূর থেকেই খেতখেতু আভাস পায় সামনেই আলটা হঠাৎ সরু হয়ে সোজা চলে চলে গেছে আর একটা মোটা আল বাঁয়ে ঘুরেছে। খুব নিশ্চিত পায়ে খেতখেতু সেই মোটা আল ধরে এগয়। ধানগাছের আড়াল থেকে আগে বোঝা যায় নি, মোটা আলটা থেকে ডাইনে বাঁয়ে নানা সরু আল বেরিয়েছে, তারপর আলটা আবার ডাইনে মোড় নিয়েছে, খেতখেতু চোখ তুলে সেই ইস্কুল বাড়ির

পেছনের বটগাছটার আভাস নেয়, আবার খানিকটা এগিয়ে বাঁয়ে ফেরে আর দেখে, সেই মোটা আলটা দুটো ধাপে উঠে প্রায় রাস্তার মত হয়ে সোজা চলে গেছে। খেতখেতু খুব আস্তে-আস্তে একটা ধাপের ওপর বাঁ পা-টা তোলে, তারপর ধাপটার ওপর উঠতে গেলে পেটে খোঁচা লাগে, বাঁ পা-টা ধাপের ওপর রেখে নেমে আসে। দ্বিতীয় বার খুব আস্তে-আস্তে বাঁ পায়ের ওপর চাপ দিয়ে ডান পা-টাকে খুব ধীরে-ধীরে টেনে তোলে। তাতেও পেটে ব্যথা করে ওঠে, কিন্তু খোঁচাটা লাগে না। দ্বিতীয় ধাপটা আরো উঁচু। পায়ের চাপ দিয়ে খেতখেতু উঠতেই পারবে না। সে ধাপটার ওপর দু-হাতের ভরে খানিকটা এগিয়ে যায়, তারপর আস্তে-আস্তে একে-একে দুটো হাঁটু তুলতে থাকে। ফলে অনেকক্ষণ সেই উঁচু ধাপটায় দুই হাতের দুই পাতার ওপরে ভর দিয়ে খেত-খেতুকে সেই লম্বা, খিটখিটে, কুচকুচে, চিকচিকে শরীর নিয়ে একটা জন্তুর মত উপুড় হয়ে থাকতে হয়। প্রথমে বাঁ হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ডান হাঁটুটা হিঁচড়ে ধাপটার ওপর আনে বটে কিন্তু তার ওপর কোনো চাপ দিতে পারে না। ভরটা বাঁ হাঁটুর ওপর রেখে ডান হাঁটুটা হেঁচড়ে সামনে নিয়ে আসে। বাঁ আর ডান হাঁটু দুটো যখন পাশাপাশি তখন খেতখেতুর সমস্যা হয় সে এখন বসে দাঁড়াবে কী করে। বহুদিনের অভ্যেস নেই বলে যেন হামাগুড়ি থেকে বসা আর দাঁড়ানো সে ভুলে গেছে। প্রথমে ডান হাঁটুটা তুলে পাতাটা পাতে, ফলে ডান হাতটাও মাটি থেকে উঠে আসে, খেতখেতুর মনে হয় সে উঠে পড়তে পারবে। কিন্তু উঠবার জন্যে পায়ের পাতার একটু চাপ দিতেই পেটে যেন লাঙলের ফালের খোঁচা লাগে—খেতখেতু সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় শুয়েই পড়ে। খানিকক্ষণ ও-রকম থাকার পর খেতখেতু ভাবে প্রথমে বসে, তারপর দাঁড়াবে। বসতে খেতখেতুর খুব একটা অসুবিধে হয় না—হাতের পাতা আর হাঁটু প্রায় একসঙ্গেই তুলে পোঁড়ালির ওপর ভর দিয়ে পেছনে হেলে যায় আর খেতখেতু বসে পড়ে, শুধু ডান পা-টা বাঁ দিকে মুড়ে রাখে। কিন্তু এখন খেতখেতু দাঁড়াবে কী করে, তাহলে তাকে দুই পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে হয়। হামাগুড়ি দিয়ে যে দাঁড়াতে পারে না, সে কি বসা থেকে উঠে দাঁড়াতে পারে? আসলে খেতখেতুর সামনে একটা গাছ বা খোঁটার দরকার, যাতে ভর দিয়ে সে উঠতে পারে। সুতরাং খেতখেতু ডান পা মুড়ে ঐ আলের মাঝখানে নিজের ঢ্যাঙা শরীরটা নিয়ে বসে থাকে।

সেই বসে থাকতে-থাকতে যেমনি তার মনে হয়েছে তার পেছনে মাসান হয়ত এখন ঠিক তলার ধাপটাতে দাঁড়িয়ে, অমনি সে আবার হামাগুড়িতে ফিরে

boiRboi.net

গিয়ে একই চেষ্টায় বাঁ পা-টা এগিয়ে দিয়ে পেটের ব্যথার খোঁচাটা অগ্রাহ্য করে, বাঁ দিকে হেলে পড়ার একটা টাল সামলে নিয়ে, দাঁড়িয়ে পড়তে পারে ও এই চেষ্টার ফলে তার যে হাঁফ ধরে সেই হাঁফ না ফেলেই খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করে। সে এতক্ষণ বসে থাকায় মাসান নিশ্চয়ই ভুলে গেছে সে কত তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি হাঁটার ফলে তার দু-হাত জোরে-জোরে দুলে-দুলে বাতাস কাটে আর সে মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নেয়—একটু দাঁড়িয়ে হাঁফিয়ে না নেয়ায় যে-নিশ্বাস ক্রমেই সংক্ষিপ্ত আর অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই মোটা আলটা আরো মোটা হয়ে প্রায় রাস্তার মতনই চওড়া হয়ে গেছে। তাই খেতখেতুর হাঁটতে তেমন কষ্ট হয় না। খেতখেতু বাঁয়ে ফেরে, আর ফিরতেই সে দেখতে পায় বিঘে পাঁচেকের মতো চওড়া ধানি জমিটার পুবেই বোর্ডের রাস্তা। ধানখেতের ভেতর দিয়ে গেলে ডান দিকে বেঁকলে সোজা বোর্ড রাস্তায় ওঠা যায়। খেতখেতু ত আর তা যাবে না। সে সোজাই হাঁটতে থাকে। একটু এগতেই সামনে একটা শুকনো খাল। আল থেকে ধাপ নেমে গেছে। নামতে হয়ত খেতখেতু পারবে কিন্তু ওপারের অতগুলো ধাপ উঠতে পারবে না। বাঁ দিক দিয়ে ঢালু বেয়ে একটা মাঝারি আলে যাওয়া যায়। সেটা ধরে এগনোই খেতখেতুর পক্ষে নিরাপদ।

খেতখেতু বোর্ড রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছে, খুব বেশি হলে বিঘে পাঁচেক জমির ওপারে। সেদিকে পেছন ফিরে খেতখেতু বাঁয়ে বেঁকে ঢালু বেয়ে আস্তে-আস্তে নীচে নেমে মাঝারি আলটা ধরে সোজা চলতে থাকে। আলটা প্রায় বাঁধের মত সোজা চলে, প্রায় কোনোদিকেই মোড় নেয় না, গতটর্তও খুব একটা নেই, বেশ শক্ত করে পেটানো, আর একই রকম চওড়া, যার আল সে খুব ভাল করে বেঁধেছে। ধানখেতটা শেষ হলেই হাঁটা শেষ হয়ে যাবে যেন, এমনি তাড়ায় খেতখেতু হেঁটে যায় আর সেই রাস্তার মত পেটানো আল তার হাঁটার গতিও যেন বাড়িয়ে দেয়। যত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে, তত তাড়াতাড়ি সে কোথাও পৌছতে পারবে যেন।

হাঁটতে-হাঁটতে খেতখেতু দেখে আলটা মোটা হয়ে ডান দিকে বেঁকেছে আর বাঁ দিকে একটা সরু আল বেরিয়ে গেছে। খেতখেতু ডাইনে বেঁকে সোজা এগিয়ে যায়। এ-রকম গতিতে এতটা হেঁটে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে যেন খেতখেতু পৌছে গেছে এমনভাবে সে থমকে দাঁড়ায়, পা থেকে চোখ তোলে, সামনে তাকায়। এতক্ষণ হাঁটার বেগে খেতখেতুর সারাটা শরীর থরথর কাঁপছে, কণ্ঠনালীটা ধকধক করছে, নাক আর মুখ দিয়ে একসঙ্গে নিশ্বাস নিয়েও ফুসফুস

boiRboi.net

ভরছে না, ফলে কুকুরের জিভ-বেরনো নিশ্বাসের আওয়াজ ওঠে—ধানখেতের ঐ নিস্তব্ধতায় আওয়াজটা তীব্র ঠেকে—যেন কেউ গর্ত খুঁড়ছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে হাঁটার ফলে আর আলসারের যন্ত্রণায় মুখের রোমকূপগুলি বিস্ফারিত আর সারাটা মুখ তৈলাক্ত। ছোট-ছোট তীব্র নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে পেটের ওপরের পেশিটা সংকুচিত প্রসারিত হচ্ছে। আলসারের ব্যথাটা খেতখেতু যেন ভুলে গেছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সামনে প্রান্তরব্যাপী শূন্যতায় তাকিয়ে আছে—খেতখেতুর চোখের সামনে না আছে বোর্ডরাস্তার পাশে নরেন সরকারের গাবগাছ, না আছে ইস্কুল বাড়ির পেছনের আধা-খাউয়াইয়া বটগাছ। তার মানে, হয় খেতখেতু পুবের বদলে পশ্চিমে চলে এসেছে নইলে দক্ষিণের বদলে উত্তরে। তার মানে, খেতখেতু পথ ভুলি গেইসে, এই দিনদুপুরে এই খেতত্ পথ ভুলি গেইসে। শরীরের আর-কোনো অঙ্গে পরিবর্তন না-এনে খেতখেতু বাঁয়ে তাকায়—কিছুই নাই। ডাইনে তাকায়—নরেন সরকারের গাবগাছ। তার মানে ইস্কুল বাড়িটা পেছনে। তার মানে খেতখেতু ঘুরে এসেছে, তার মানে, খেতখেতু ঘুরে এসেছে। তার মানে, খেতখেতু এখন মাসানের মুখোমুখি। দূর থেকে চোখটা ধানখেতগুলোর ওপর দিয়ে কাছে আনতে-আনতে খেতখেতু নিজেই বুঝে নেয় সে রানীমার খাল বা আসিন্দিরের পালান বাড়িটাকে একটা পাক দিয়ে এল। এমন-কি, পাড় বেয়ে ওঠার সেই ধাপগুলো দেখেও সে চিনতে পারে নি, এমন-কি সেই খালের মতন গর্ত দেখেও না, এমন-কি খুব যত্ন করে পিটিয়ে বাঁধানো পাড় দেখেও না। খেতখেতু তার সামনে যদ্দুর চোখ যায় তাকিয়ে থাকে। এই দুপুরে কার্তিকের রোদ কাঁপছে, পাখ-পাখালির আওয়াজ পাওয়া যায় না। আকাশে একটা পাখি নেই। মাসান, মাসান, কোথায় কোন আলের নীচে বা বাঁকে বা ধানগাছের ঝোপে লুকিয়ে খেতখেতুর দিকে তাক করছে। হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে খেতখেতু একটু-একটু এগিয়ে যায়, তারপর তাকিয়ে দেখে, ধানগাছের মাথায় উগরনো তার বমির শ্লেষ্মা থেকে কাশফুলের মত সুতো তখনো দুলছে, তখনো দুলছে।

আলের মাঝখানে খেতখেতু দাঁড়িয়ে, দু হাত দু দিকে ঝোলে, কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত সামনে একটু ঝুঁকে, চোখে যেন কোনো দৃষ্টিই নেই—কাউকে দেখছে না, মুখ হাঁ, গলনালী ধুকধুক, চামড়ার ওপর দিয়ে পাঁজরা বেরনো—খেত-খেতুর পা-দুটো শুধু মাঝেমাঝেই নিজের ভারে কাঁপে, এতক্ষণে খেতখেতুকে দেখায় যেন ধানখেতে গেড়ে রাখা নজর কাঁটা।

—মাসান, মাসান, মোক ছাড়ি দে, মুই ত খেতখেতু, মুই এই ঠেকার

মানষি, মোর বুড়াবাপা এইঠেকার মানষি আছিল্, দু-ই ত উত্তরপাকে মোর ঘর আর দু-ই ত দক্ষিণ পাকে ইস্কুল, এইটা ত মোর ঘরের আঙিনার নাখান, তুই ত হামারলায় টারির (পাড়ার বা গাঁয়ের) মাসান, মোক ছাড়ি দে—

সেই আলের ওপর স্থির দাঁড়িয়ে থাকে খেতখেতু। সামনে বা পাশে শূন্য মাঠ খাঁ খাঁ করে।

—মুই পথ ভুল করো নাই মাসান, পথ ভুল করো নাই, মোক আন্ধারিয়া রাতিত্ দুই চক্ষু বান্ধি ছাড়ি দে কেনে, মুই সিধা চলি যাম, ধরো কেনে উত্তরের পাকে ন্যাশন্যাল হাই, দক্ষিণের পাকে ধরো কেনে দুই জহুরি কলোনি, পুব পাকে পদ্মনাথের খোলান, পশ্চিম পাকে তালমা নদীর উপরের ভাঙা সাঁকোখান্ মুই চক্ষু বন্ধ করি পার হয়্যা চলি যাম। মাসান, মোক ছাড়ি দে, মুই তোর টারির মানষি—

খেতখেতু একবার ভাবে সে এখন সোজা হেঁটে তার বাড়িতে ফিরে যাবে কি না। কিন্তু তাকে মাসান যদি ইতিমধ্যে ধরে থাকে তাহলে সে বাড়িতে ফিরে কী করবে। বাড়িতে ত এখন কেউই নেই। কতক্ষণ একা-একা মাসানের সঙ্গে থাকতে হবে? শেষে মাসান যদি আবার তাকে ঘর থেকে বের করে নদীপাড়ে বা জঙ্গলবাড়ি নিয়ে যায়? তার চাইতে এই ধানখেতের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল। খেতখেতু এখন দিব্বি মনে করতে পারে, সে-ই মোটা আল ধরে যখন সে প্রায় বোর্ড রাস্তায় পৌঁছে গিয়েছিল তখন সামনের শুকনো খালটার ভেতরে না নেমে যখন সে বাঁয়ে ঢালু বেয়ে নেমেছে, তখনই পথটা আসলে ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু সেটাও ত নতুন রাস্তা, সেখানেও মাসান ধরতে পারে নি। যে-মুহূর্তে সে এই একটু আগের আলটায় উঠে ডাইনে বেঁকে পুরনো আলটা ধরেছে সেই মুহূর্তে সে মাসানের রাস্তায় পড়েছে। কিন্তু মাসান তাকে বেশিদূর ভুলিয়ে নিতে পারে নি, মাত্র কয়েক পা আসতে-আসতেই সে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে এখন মাসান কোথায়? তার সামনে, নাকি তার পেছনে, নাকি তার পাশে, নাকি তার গায়ের সঙ্গে লেগে? ভাবতেই খেতখেতু একটা চোক গেলে, গলায় কাঁটা-কাঁটা বেঁধে আর সামলাবার জন্য খেতখেতুকে একটুও সময় না দিয়ে হড় হড় করে ভেতর থেকে ওয়াক উঠে আসে, দুই হাতে পেট চেপে ধরে খেতখেতু শুকনো ওয়াক তোলে, একবার, দুইবার তারপর ওয়াকের ভেতর ঢেকুরের সঙ্গে নোনতা জল খানিকটা উঠে আসে, শুকনো জিভটা তাতে ভেজেও না। তাহলে কি মাসান খেতখেতুর ভেতরে ঢুকে গেছে, আলসার আর ভোখ যেটুকু রস বাকি রেখেছিল সেটুকুও শুকিয়ে ফেলছে? মাসান ত রক্ত,

রস সব শুকিয়ে ফেলেও মারে। খেতখেতু একটা ওয়াক দিয়ে পেটের ভেতর থেকে জল তুলতে চেষ্টা করে কিন্তু জল ওঠে না। অথচ এই একটু আগে পর্যন্ত খেতখেতু একটু ভাবতেই যেন মুখের ভেতর জল উঠে আসত।

—তাহলি এ্যালায় আলসারটাও ফাটিবে। মুই ত মরিবার থইচ্‌ছ। কিন্তুক মুই মরিবার বাদে কায়ও বুঝিবার পারিবে না মুই কিসে মরিলু—ভোখত্‌ না আলসারত্‌ না মাসান মারিলো। মোর মরণ বেদিশ মরণ!

খেতখেতু সামনেই তাকিয়ে ছিল, সে একটুও নড়ে নি! মরণ তার এসেছে এ-রকম চিন্তা তার মাথায় আসতেই সে শান্তও হয়ে গেছে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তার কপালের দু-পাশের শিরার আর গলনালীর দবদবানি কমে গেছে, নিশ্বাসটা স্বাভাবিক হয়েছে। এখন একটু বসতে পারলে খেতখেতু বসত কিন্তু সে বসবে না, এখন বসা মানেই তারপর শোয়া, তারপর আর-কোনোদিন না-ওঠা। তার চাইতে যতক্ষণ পারে খেতখেতু তার ঘরের আঙিনার মত এই ধান্যপ্রান্তরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই থাক—এই প্রান্তরের কিছুটা অংশ ত সে নিজের হাতে চষেছে, এই প্রান্তরের কিছুটা অংশ ত সে নিজের হাতে রুয়েছে।

খেতখেতু দেখতে পায় তার ডানহাতি খেতটার দু-ই পুব কোনায় একটা বাতাস আসতে শুরু করেছে।

চারপাশে কোথাও কোনো বাতাস নেই, ঐ কোনাটার ধানগাছগুলো নড়ে, যেন ধানগাছের ভেতরের জমি থেকে কেউ নাড়ায় কিন্তু দেখতে-দেখতে বাতাসের সেই রেখা দুই দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সাঁতরে গেলে পেছনে যেমন রেখা হয় তেমনি। আর খেতটার মাঝামাঝি আসতেই কোনাকুনিভাবে পুরো খেতটাই সেই হিল্লোলিত রেখায় ভরে যায়। বাতাস ত আর আল মানে না, তাই খেতখেতুর সামনে আসার আগে বাতাসটা পাশাপাশি খেতগুলোতেও ছড়ায়। খেতখেতু সেই বাতাসের মুখে দাঁড়িয়ে দেখে, তারপর শোনে ধানখেতের ওপর দিয়ে শিরশির বাতাস বয়ে আসে। দাঁড়িয়ে খেতখেতু অপেক্ষা করে থাকে বাতাসটা কখন ধানখেত থেকে তার পা বেয়ে উঠে আসবে। কিন্তু ধানখেতের বাতাসটা খেতখেতুর কাছে পৌঁছনোর আগেই খেতখেতুর মাথায় বাতাস লাগে আর তারপরই খেতখেতুকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলে বাতাসটা আরো বিস্তৃত চলে যায় খেত আর খেতে, প্রান্তরে। খেতখেতুর কানে থেকে যায় দুপুরের হাওয়ার সাঁই-সাঁই আওয়াজ, প্রান্তরের বাতাসের মুখে মরা গাছের মরা ডালের দীর্ঘশ্বাসের মত সাঁই-সাঁই। খেতখেতু শুনতে পায় বাতাসের ফিস ফিস শ্বাসচাপা স্বর 'তুই এইঠেকার মানষি?'

boiRboi.me

বাতাসে শুকনো ডালের মত ঠকঠক নড়ে উঠে খেতখেতু বলে, 'এইঠেকার। এইঠেকার। চিরজন্ম এইঠেকার। মুই খেতখেতু।'

'কহেন দেখি, ডাহিনত এটা কার জমি ?'

খেতখেতু ডাইনে তাকিয়ে দেখেই বলে ফেলে, 'পদ্মনাথ-র।'

'না হয়, না হয়' যেন নিঃশব্দ হেসে বাতাস ধীরে-ধীরে দূরে চলে যায়। আর বিমূঢ় খেতখেতু ভাবে, তাহলে এটা কি পদ্মনাথের ঠিকা জমি ছিল, ছেড়ে দিয়েছে ? জন্ম থেকেই পুরো মৌজার প্রায় সব জমিই দেখে এসেছে—পদ্মনাথের। শহরের যাদের জমি ছিল, তারাও ঠিকা চুক্তি দিয়েছিল পদ্মনাথকে। পরে জমিদারি আইন পাশ হওয়ার পর থেকে এই সেদিনের পরিবার-পিছু জমি আইন পাশ হওয়া পর্যন্ত পদ্মনাথ কত ঠিকা ছেড়ে দিয়েছে, কত জমি সরকারে ভেস্ট করেছে, আবার কত জমি নিজচাষে নিয়েছে ! পদ্মনাথ বড় সাধু জোতদার। পদ্মনাথ যখন এই অঞ্চলের বড় জোতদার ছিল তখন কোনো না-খাওয়া মানুষ তার কাছ থেকে খালি হাতে ফেরে নি। এখনো পুরো সাতখামারটাই ত পদ্মনাথের বাড়ি—পাঁচ ভাই, তাদের ছেলেমেয়ে-জামাইরা, ভাগ্নেরা—সব মিলে একটা পুরো গাঁ পদ্মনাথেরই। সেই প্রথম জমি আইন পাশ হওয়ার পর জমি মাপার জন্য কতবার আমিন এল, কোনোবার সরকার পাঠায়, কোনোবার পদ্মনাথ আনে। এখনো সরকারের সঙ্গে পদ্মনাথের পাকাপাকি ঠিক হয় নি, কোনটা তার জমি, আর কোনটা সরকারি জমি। এর ভেতর অনেকগুলি ছিল ঠিকাচুক্তির জমি। সেগুলো পদ্মনাথ ছেড়ে দিয়েছে। আবার নতুন ঠিকা চুক্তির জমি নিয়েছে। আর, অনেক জমি থেকে আধিয়ার সরিয়ে নতুন জমিতে বসিয়ে পুরনো জমি নিজচাষে নিয়েছে—ধানের কোনো ভাগ নেই, নগদ পয়সায় কাজ। শুধু পুরনো আধিয়ারের বেলায় ধানের একটা ভাগার চুক্তি পদ্মনাথ রেখেছে।

'স্যালায় এই জমিখান্ পদ্মনাথের না হয়।' ভেবে খেতখেতু ডানহাতি সেই জমিটার দিকে তাকায়, আর জমিটা সত্যি তার কাছে অপরিচিত ঠেকে যেন সে একটা ভিনদেশী খেতের পাশে দাঁড়িয়ে।

সেই জমির ভেতর বাতাস 'ধকপোকিয়া' ভাব ধরে। একবার খুব জোরে বইছে, মোটরগাড়ি চলে গেলে যেমন বাতাসের 'ধাক্কা' তেমনি লাগছে। তারপর আবার বাতাসটা সরে যাচ্ছে। একবার দক্ষিণ থেকে পুবে আসে, আবার পুব থেকে দক্ষিণে ফেরে। আবার পুব থেকে একটা বাতাস খানিকটা এসে ফিরে যায়। আর এই ফেরার পথে দক্ষিণের বাতাস আর পুবের বাতাসে জড়াজড়ি লাগে। ধানখেতের কতক অংশের মাথা দক্ষিণে হেলা, আর

কতক অংশের মাথা পুবে হেলা আর মাঝখানে খানিকটা জুড়ে উথাল-পাথাল, কেউ যেন ভেতর থেকে ধানের গোছা ধরে-ধরে মুচড়ে দিচ্ছে বা নদীতে যেমন ঘূর্ণি তেমনি মাটিতে ঘূর্ণি লেগেছে। মনে হয়, ধানখেতের ঐটুকু জায়গাতেই যেন ঝড়।

'মাসান-দেও, খেপি গিছে, অ্যালায় মোরঠে আসিবে', খেতখেতু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। খেতের মাঝখানে বাতাসের সেই ঘূর্ণি যেমন হঠাৎ উঠে-ছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে আসে, আকাশ জুড়ে শুধু এতক্ষণের বাতাসের শাসানি কাঁপতে থাকে। সেই কম্পন খেতখেতুর কানে এসে বাজে—তুই মিছা কথা কহিছিস। তুই এইঠেকার কায়ও না। তুই বেগাঁউয়া, বেদেশিয়া।

'মুই মিছা কহ নাই। মুই খেতখেতু। মুই বেদেশিয়া না-হই। মুই চিরজন্ম এইঠে আছি। মোর বাপার নাম কান্দুরা, মোর বুড়া বাপা ভাদুরা।'

খেতখেতু দেখে, আবার সব বাতাসহীন নীরব হয়ে যাচ্ছে। এই বাতাসে আর এই নীরবতায় খেতখেতু টের পেয়ে যায় বেলা যেন পড়ে আসছে। কেমন থমথম ভাব ধরেছে। বাতাসের ঘূর্ণি ওঠার পর বাতাসটা আরো নেমে যাবে। তারপর এমন বইবে যেন কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন মাটি থেকে শুকনো গন্ধ আসছে। 'শুখা মাটির গন্ধটা পাতলা ঝুরঝুরা।' বেলা যখন পড়ে তখন ঝুরঝুরা গন্ধটা একটু থিতয়। তখন কান পেতে রাখলে ধানখেতের ভেতরে মাটির ওপরে ফড়িঙের আর পোকামাকড়ের খুব মৃদু ধ্বনি শোনা যাবে আর যে-সব পাখি বড়-বড় গাছের মাথায় বাসা বাঁধে তাদের সব মন্থর ডাক শোনা যাবে। আরো একটু পর, বেলা আরো একটু পড়লে—কার্তিকের বেলা হঠাৎ-ই পড়ে—আকাশে পাখির ঝাঁক উড়ে চলে যাবে।

—'মাসান, মুই কহি দিবার পারো এই জমিঠে কয় চাষ পড়িছে, ক্যানং ধান হবা পারে, মুই ত চিরজন্ম এইঠে, মুই জানো কোন জমি ক্যানং।'

খেতখেতুর ঘাড়ের ওপর নিশ্বাসের মত একটা হাওয়া পড়ে আর খেতখেতুর সারা শরীর চমকে ওঠে, বাতাসটা তার শিরদাঁড়া বেয়ে নীচে চলে যায়। তবে, তবে কি এতক্ষণে মাসান তার শরীরে ভর করল ?

—মুই একঠেকার জমি চিনি, আলি চিনি। মুই পথ ভুল করো নাই। মোর প্যাটত একথান্ আলসার আছে। ডাক্তার কহিছিল প্যাটত ভোখ না রাখেন, প্যাট ভরা রাখিবেন। তিনদিন মুই কুছু খাও নাই। মোর প্যাট বিষাবার ধরিছে। কালি রাতিত না আগের রাতিত মোর বমি হছে। এই বমির বাদে মোর মুখত অক্ত পড়িবে। সেই তানে মুই মোটামোটা আলি দিয়া

হাঁটিবার ধইচ্ছু আর ভুল করি ফেলাছু। মোর প্যাটত বিষ না থাকিলে মুই চক্ষু মুদি চলি যাবার পারি, যেইঠে যাম সেইঠে, মুই এইঠেকার, চিরজন্মের এই-ঠেকার, মুই খেতখেতু।

খেতখেতু ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে নিচু খেতগুলোতে একটু-একটু ছায়া পড়তে শুরু করেছে। বাঁয়ে একেবারে নিচু আর পশ্চিম থেকে পুবে ঢালু জমিটার মাথা থেকে অনেকখানি ছায়া নীচে গড়িয়ে পড়েছে। আর খেত-খেতুর নিজের ছায়ার মাথা ডানদিকের খেতের কোনাকুনি পড়ে ক্রমেই লম্বা হচ্ছে—

মুই মোর গিরির নাম কহিবার পারো নাই। মুই জানি না, ত ক্যানং করি কহিম? বুড়া বাপার টাইমত মোর গিরির ঘর আছিল পদ্মনাথ। সেই জমি আইন পাশের বাদ জানিলো পদ্মনাথ মোর আপন গিরি না-হয়, ঠিকা গিরি। মোর সেইল্যার আপন গিরিক মুই দেখো নাই। গিরি মরে ত জমি ভাগ হয়। জমি ভাগ হয় ত জেমি বেচা হয়। জমি বেচা হয় ত হালুয়াক বেচা হয়। যেইলা আসি কয়, মুই তোর জমি কিনিছু, মোর ভাগা দে, মুই ভাগা দিছু। মুই ত খেতখেতু। মুই ত কহিবার পারি না, তুমি মোর গিরি তার প্রমাণ কী! প্রমাণ ত রেজিস্টার অফিসত। মুই ত কাগজ পড়িবার পারো না। যায় আসি কহে মুই তোর গিরি, মোক ভাগা দে, মুই ভাগা দিছু। এক গিরি দুই সনত আসে না। ক্যানং করি উমরার নাম কহিম? মুই ত জানো না, এই সনত কাক ভাগা দিবার নাগিবে। কায় জানে, মোর জমিটা গিরিনিটা বেচি দিছে কি না মুই ক্যানং করি মোর গিরির নাম কহিবার পারিম?

বেলাশেষের কার্তিকা হাওয়া খেতখেতুর গায়ে এসে লাগে। শিরশির করে না, কিন্তু চামড়াটায় আরাম লাগে। খেতখেতু বোঝে, বেলা যত ফুরবে, মাসান তাকে তত ঘিরবে। যদি খেতখেতু ওখানে দাঁড়িয়ে না পড়ত, সব বুঝেও যদি খেতখেতু এতক্ষণ মাসানের হাত থেকে পালাবার জন্য ছুটত, তাহলে এতক্ষণ খেতখেতু এই দিক-দিক ভরা ধানখেতের কোথাও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত। শুধু ছোটার জন্যই এই ভুখা পেটে পড়ে মরে যেতে পারত। ছোটার বেগে তার আলসারটা ফেটে যেত হয়ত। আর মাসান তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু এই একটা জায়গায় গাছের মত দাঁড়িয়ে পড়ায় সে এখনো বেঁচে আছে। এখন বেলা পড়বে, ছায়া গড়াবে আর মাসান তাকে ঘিরে ধরবে। শুধু পা দুটো মাঝে-মাঝে কাঁপছে।

খেতখেতু ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে খেতের ছায়া খেতের ওপর, ধানের

boiRboi.net

ছায়া ধানের ওপর, মাটির ছায়া মাটির ওপর। খেতখেতুর বাঁয়ের ছায়াগুলো খেতখেতুর দিকে কৌণিক তীক্ষ্ণ আর খেতখেতুর ডাইনের ছায়াগুলোর চওড়া ভিত খেতখেতুর দিকে। খেতের ওপরে-ওপরে এলোমেলো রোদ ছড়ানো, রোদ ক্রমেই ওপরে উঠছে, নীচের জমিগুলো ছায়াতে প্রায় ভরেই গেছে—শুধু পাড়ে-পাড়ে রোদ লেগে—

মাসান মুই কহিবার পারো নাই কুন্ জমি কুন্ জোতদারের। মুই ত জানো না। ক্যানং করি কহিম। ছেইল্যাবেলাত্ জমি চিনা আছিল্ জোতদারের নামত্, না-হয় ত আধিয়ারের নামত্। এ্যালায় ত জোতদারি আর নাই, তাই জোতদারের নাম নাই। এ্যালায় যায় পাঁচ-কি-দশ বিঘা জমি কিনে, না-হয় ত, পাঁচ ভাই মিলি, ধরো কেনে, পাঁচ হাল জমি কিনে—উমরায় সগায় আধিয়ারক তুলি দিবার চাহে; সগায় নিজচাষে জমি চাষ করিবার চাহে। আধিয়ারি নাই তাই জমিত আর আধিয়ারের নাম নাই। ত ক্যানং করি কহিম কুন জমি কার?

খেতখেতু একবার এই জমিগুলির দিকে তাকায়। সব জমিই ধানখেত। ধানে-ধানে এক জমির সঙ্গে আর-এক জমির কোনো পার্থক্য নেই। এর ভেতর কোনো জমি দহলা (নিচু), কোনো জমি পালান (খুব নিচু), কোনো জমি ডাঙা, কেনো জমি পড়া (পতিত), কোনো জমি সারুক (উর্বর), কোনো জমি পাথারি, কোনো জমি বালু। কোথাও তিনচাষেই জমি তৈরি হয়েছে, কোথাও হয়ত পাঁচ চাষ পর্যন্ত লেগেছে—যদি কেউ অত খরচ করে থাকে। এর ভেতর আবার আছে পদ্মা, আই-আর—এইসব বিছন। এগুলো খেতখেতু ত প্রায় না দেখেই বলতে পারে—

কিন্তু মাসান, মুই ক্যানং করি কহিবার পার, কুন জমি কার নামে রেজিস্টারি হইছে কি হয় নাই, কুন জমি কার নামে পাট্টা হইছে কি হয় নাই, কুন জমি ঠিকায় চলিবার ধরিছে আর কুন জমি বেনামা চলিছে। মোর কুনো খতিয়ান নাই। মুই ক্যানং করি কম, কুন জমি কুন জোতদারের নিজ খতিয়ানে আর কুন জমি কুন জোতদারের খাশ খতিয়ানে। জমির মালিকানা এ্যালায় নদীর জলের নাখান—হেই চড়া পড়িবার ধরিছে আবার হেই ভাসি যাছে। মুই ক্যানং করি জানিম। সগায় বদলাবার ধরিছে। পদ্মনাথ আছিল্ জোতদার—হইছে নিজচাষি। অমনীকান্ত আছিল্ পঞ্চায়েত—হইছে মেম্বার। নরেন সরকার আছিল্ জোতদার—হইছে এফ-সি-আই-এর এজেন্ট। তামান বদলাই গিছে। কিন্তুক মুই খেতখেতু থাকি গিছু, মুই বদলাও নাই। তাই হামাক বেদেশিয়া

boiRboi.net

বেগাউয়াইয়া মতন থায়। কিন্তুক মুই খেতখেতু, চিরজন্মের খেতখেতু, খেতখেতু রায়, স্যানং-স্যানং টাইমত খেতখেতু রায় বর্মনও বটে,

পদ্মনাথ, অমনীকান্ত, নরেন সরকার সগায় এইঠেকার মানসি থাকি গেইল্ আর মুই খেতখেতু, হয়্যা গেইল্ বিদেশিয়া ?

সহসা খেতখেতুর ওপর দিয়ে ঝাঁকের পর ঝাঁক টিয়ে আকাশ কাঁপাতে-কাঁপাতে উড়ে-উড়ে যায়। পাখিদের কোনো ডাক আর মাটিতে না, গাছে না, সব ডাক আকাশে, উড্ডীন। শুধু পাখার শব্দ তুলে মানিকজোড়, আর দিগন্ত জুড়ে বকের পাল। বকেরা কখনো দিগন্ত ছাড়া ওঠে না। গলায় শব্দ হোক না-হোক, বাতাসে এইসব পাখির পাখার আঘাতে অশ্রুত ও অদৃশ্য শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয় আর সেই শব্দতরঙ্গ খেতখেতুর শরীরে এসে লাগে। আকাশময় শব্দস্পন্দন শরীর ভরে গ্রহণ করতে-করতে, সেই ধান্যময় প্রান্তরে, খেতখেতু, আসন্ন সন্ধ্যায় পুরুষানুক্রমিক আকাশ মাথায় নিয়ে, পথভোলা এক বিদেশীর মত দাঁড়িয়ে— অন্ধকারে-অন্ধকারে কখন মাসান তার শরীরে ভর করবে সেই অপেক্ষায়।

একটু বসতে পারলে খেতখেতু বসত, কিন্তু এখন বসবে না। তার চাইতে যতক্ষণ পারে খেতখেতু তার ঘরের আঙিনার মত এই ধান্যপ্রান্তরে দাঁড়িয়েই থাক—

এই প্রান্তরের কিছুটা অংশ ত সে নিজের হাতে চষেছে, কিছুটা অংশ ত সে নিজের হাতে রুয়েছে।

আর তেমন সব ফসলেই ত এখন পাক ধরছে।

boiRboi.net

৬

ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তায় উঠে সোজা উত্তরে গিয়ে চ্যাওভাড়াতে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে শহরে যাবে—চ্যারকেটু ভেবেছিল। কিন্তু হাইওয়েতে বাস-ট্রাক আর গাড়ির চোটে গরু সামলানো দায়। তাই সে বোর্ডের রাস্তা টপকে পুবে সাতখামারের রাস্তায় নেমে যায়। বটতলিতে হাইওয়ে ধরে পাঙ্গার ব্রিজটা পেরিয়ে মোহিতনগর কলোনির ভেতর ঢুকে যাবে। সেখান থেকে ল্যাটারাল রোডটা ধরে কুমোরপাড়া দিয়ে রাহুত বাগানের পেছন দিয়ে, বামনপাড়া বোসপাড়া দিয়ে শহরে ঢুকবে।

সাতখামারের রাস্তায় খানিকটা এগতেই যেন সাজো-সাজো ভাব দেখে। পদ্মনাথের ঘরের সবাই শার্ট আর ধুতি পরে বেরছে। পদ্মনাথের জোয়াই (জামাই) আসিন্দিরের গায়ে শাদা হাফশার্ট, ধবধব, ইস্তিরির দাগ লাঙলের ফলার মত চকচক করে, পায়ে লাল চামড়ার খটখটিয়া জুতো, পা-টা ফাঁক করে-করে ফেলছে, দুলে-দুলে হাঁটছে, যেন ঘষা লেগে ময়লা হয়ে যাবে। হাত দুটোও দুদিকে ফাঁক করে দোলায়, যেন জামার সঙ্গে ঘষা না লাগে। আসিন্দিরের সঙ্গে-সঙ্গে চলে আসিন্দিরের খুড়োশ্বশুর, পদ্মনাথের ছোট ভাই নেংগু। নেংগু আর আসিন্দির প্রায় সমান-সমানই। নেংগুর গায়ে পাতলা পাঞ্জাবি, বরাবর এই জামাই পরে, এরকমই হাঁটেও। নেংগু আর আসিন্দির দুজনই পান খেয়েছে। তাদের সঙ্গে তিন-চারজন চ্যংড়া-প্যাংড়ার ঘর। গায়ে ছিটের শার্ট, পরনে হাফপ্যান্ট। শহরের বাবুদের ঘরের মতন দেখতে লাগে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এরা চ্যারকেটুর সামনে দিয়েই বটতলির দিকে রওনা দেয়। তাদের দেখার জন্য চ্যারকেটু দাঁড়িয়ে পড়ে। তারা বেশ খানিকটা এগিয়ে যায়, চ্যারকেটু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে। দেখতে-দেখতে যেন খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবেই কঞ্চিসমেত ডান হাতটা তুলে গরুর পিঠে রাখার জন্য নামিয়ে নিয়ে আসে। গরুর পিঠে না ঠেকে নামাতে-নামাতে হাতটা যখন ঝুলে পড়ে তখনো চ্যারকেটু দেখে ফরশা জামাকাপড় আর জুতো পরে আসিন্দির-জোয়াই আর নেংগু খুড়ার হাঁটার বেগ যেন বেড়ে গেছে, ছাওয়াছোটগিলা তাল রাখতে

boiRboi.net

পারছে না। হাতটা একেবারে ঝুলে পড়লে চ্যারকেটু তাকিয়ে দেখে গরু তার পাশে নেই। গরুটার লেজ মাছির মত তার গায়ে লেগে থাকার কথা, এমনি-ভাবে চ্যারকেটু নিজের পায়ের দিকে, গায়ের দিকে তাকায়। তারপর চোখ তুলে সামনের রাস্তায় জোয়াই আর খুড়াকে যেতে দেখে। চমকে পেছনে ফিরে দেখে বিদ্যানাথের বাড়ির কলাগাছের পাতা, শালার গরু, টেনে নামিয়েছে। চ্যারকেটু ছুটে গিয়ে কঞ্চিটা দিয়ে গরুটার পেছনে-সামনে মারতে শুরু করে। কলাপাতাটা মুখে রেখেই গরুটা বাঁ-দিকে পেছিয়ে যায়, তাতে মুখটা এসে পড়ে চ্যারকেটুর সামনে। চ্যারকেটুকে আবার ঘুরে গরুটার পেছনে গিয়ে কঞ্চি দিয়ে মারতে হয়। গরুটা পেছনদিকটা আরো বাঁয়ে ঘুরিয়ে নেয়, ফলে কলাপাতার ডগাটা একটা পাক খায় আর গরুর পেছনটা গিয়ে বেড়ায় ঠেকে। চ্যারকেটু গিয়ে হাত দিয়ে গরুর পেছনটা ঠেলে, গরুটা নড়ে না। তারপর আচমকা পাক খেয়ে কলাপাতাটাসহ রাস্তা দিয়ে এমন ছোটে যে কলাগাছটার মাথা বেড়ার এদিকে হেলে আসে আর ভেঙে যাওয়া ডাণ্ডাটার পাতাগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মুখের ভেতর ঢুকিয়ে গরুটা ছুট দেয়। পাতাছাড়া ডাণ্ডাটা কলাগাছের সঙ্গে ঝুলে থাকে। কঞ্চি হাতে চ্যারকেটু গরুটার পেছনে যত জোরে পারে ছোটে। কিন্তু বাঁ হাত দিয়ে কাঁধের লাঙলটা সামলাতে হয় বলে ঠেকে-ঠেকে যায়। গরুটা প্রথমে ছুটছিল যেন চ্যারকেটুর হাতে মার খাওয়া থেকে পালাচ্ছে। তখন তার দৌড়নোর ভেতর একটা তাল ছিল, চারপায়ে দুলে-দুলে ছুটছিল, মাথাটা সোজা, লেজটা ঝোলা। চ্যারকেটু একটু দৌড়লেই ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু গরুর গলার দড়িটা রাস্তায় ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে মাঝে-মাঝে পেছনের পায়ে জড়িয়ে যাচ্ছিল। সেই দড়িটা পা থেকে ছাড়ানোর জন্য গরুটাকে পেছনের পা জোড়া করে লাফাতে হয়, ছুটতে-ছুটতেই। তখন তার লেজও খাড়া হয়ে ওঠে। এই রকম দু-চারবার হতেই গরুটা যেন খেপে ওঠে। তখন সে আর চার পায়ে দুলে-দুলে না ছুটে সামনের পা জোড়া করে আর পেছনের পা জোড়া করে জোড় পায়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে লাগল। তার লেজ উঁচু হয়ে যায়, ঘাড়-গলা লম্বা। মুখ থেকে কলাপাতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাস্তায় পড়ে। সে যেন এবার রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ছুটে চলে যাবে। দড়িটা ধরার জন্য চ্যারকেটু যত জোরে পারে ছোটে। গরুর আর চ্যারকেটুর পায়ের ছুটন্ত শব্দে চমকে আসিন্দির, নেংগু আর চ্যাংড়ারা রাস্তা থেকে হুড়দাড় সরে পরে পাশে। ছুটতে-ছুটতে গরুটা তাদের মাঝখানে এলে নেংগু হাত বাড়িয়ে দড়িটা তুলে নেয়, তারপর পিছু-পিছু দু-পা ছোটে আর

boiRboi.net

দড়ির টান পেয়ে গরুটা ঘুরে যায়, নেংগুও ঘুরে যায়। চ্যারকেটু পৌঁছেই গরুর পিঠে সপাং-সপাং করে কঞ্চি দিয়ে মারতে থাকে। 'তোর নিজের পিঠত্ মার্ কনেক', বলে নেংগু দড়িটা চ্যারকেটুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে দু-হাতে তালি মেরে হাত পরিষ্কার করে নেয়, তারপর ওরা আবার চলতে শুরু করে। ধরা পড়েও গরুটা ঘাড় নোয়ায় না। ঘাড়টা সোজাই থাকে। চোখ দেখে মনে হয়, আবার ছুট দিতে পারে। ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে চ্যারকেটু গরুটাকে একটু সময় দেয়। ততক্ষণে আসিন্দির আর নেংগু অনেকখানি এগিয়ে গেছে। ওরা নিশ্চয়ই শহরে যাচ্ছে। আসিন্দিরের ত মামলা-মোকদ্দমা লেগেই আছে। নেংগুর তাল সব-দিকেই, কোনোদিকেই সামলাতে পারে না। ফোঁস করে গরুটা চ্যারকেটুর ঘাড়ের ওপর একটা নিশ্বাস ফেলে। চ্যারকেটু তাকিয়ে দেখে, গলাটা চ্যারকেটুর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। নরম তুলতুলে গলার থলিটাতে একটু হাত বুলিয়ে, দড়িটা ধরে গরুটার মুখ ঘুরিয়ে, চ্যারকেটু বটতলির দিকে হাঁটতে শুরু করে। গরুটা আবার চ্যারকেটুর পাশাপাশি চলতে থাকে, দুলে-দুলে। কিন্তু ওর শিং দুটো মাথার ওপর এতটা বাঁকা উঠে থাকে যে মাথাটা শরীরের সঙ্গে লাইনে রাখলেও তাকে বেশ রোখাই মনে হয়, বিশেষত চিবুতে-চিবুতে চোয়াল নাড়াতে-নাড়াতে গলাটা দুলিয়ে-দুলিয়ে যদি হাঁটে তাহলে মনে হয়, যে কোনো সময় খেপে উঠতে পারে বা কাউকে ঢিঁসোবার জন্যেই যাচ্ছে।

বটতলির কাছাকাছি যেতেই হৈ-হট্টগোল শোনা যায়, চায়ের দোকানটার পেছন থেকেই দেখা যায় যেন মেলা বসেছে। পাশের চায়ের দোকানটাতে ভিড়, দেখেই বোঝা যায় শহরের বাবুরা ঘররা এসেছে। স্থানীয় মাতব্বররা কেউ কেউ দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে। রাস্তার উল্টোদিকের চায়ের দোকানটাতে ভিড় বেশি, সামনে একটু ঢালু জায়গা, বাঁশের মাচান, বটতলিতে একটা সিমেন্টের পাটাতনও আছে। বটতলির বটগাছটা ঐ-দিকেই। ওদিকে একটা মুদির দোকান। চা আর মুদির দোকানের পিছনে বীরেন রায়ের বাড়ি। ওদিকের ভিড়টা কোনো দোকানের সামনে নয়, আসলে সারা মাঠময়ই ছড়িয়ে। মুদি আর চায়ের দোকানের ভেতর কেউ-কেউ, অনেকে বাইরে বাঁশের মাচানের ওপর, মাঠের ভেতর উবু হয়েও বসে অনেকে, আবার কেউ-কেউ বটগাছতলার সিমেন্টের পাটাতনে। চারদিকেই বেশ সাজো-সাজো রব। চ্যারকেটু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে যায়।

পুবে পাঙ্গা ব্রিজটার ঠিক পাশের মাঠটাতে সারি দিয়ে দুইখানা ট্রাক। একটার এঞ্জিনের সামনে শাদা কাপড়ে নীল কালিতে লেখা কাপড়। দুটো

boiRboi.net

ট্রাকের মাথাতে একই তেরঙা নিশান —খদ্দরের। পশ্চিমে, রাস্তা ধরে একটু এগিয়ে একটা ট্রাক শিলিগুড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, ট্রাকের পিছনে কেউ নেই, একটা ছোট লাল ফ্ল্যাগ ড্রাইভারের দরজার সঙ্গে লাগানো। নিশানটি নেতিয়ে আছে। 'আজি কি একোদিনে কংগ্রেসের ঘর আর কমিনিস্টের ঘর, এই দুই দলেরই মিছিল উঠিবে, শহরত্? এ্যালায় বাহাদুরঠে মানষি নিগাবাব আসিছে? এই একো দিনে?'

গরুটা এতক্ষণ পিছনে ছিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চ্যারকেটু যখন এইসব দেখছিল তার মধ্যে এসে চ্যারকেটুর পাশে দাঁড়িয়েছে, এমনই পাশে যে চ্যারকেটুর পক্ষে এখন বাঁ হাতটা গরুর পিঠের ওপর তুলে দেয়াটাই স্বাভাবিক। চ্যারকেটুর গা ঘেঁষে একটু বাঁ দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে গরুটা দাঁড়িয়েছিল, যেন চ্যারকেটুর মত সে-ও এইসব দেখছে। গলাটা একটু নোয়ানোই থাকে, বাঁ শিংটা চ্যারকেটুর গায়ের সঙ্গে প্রায় লাগানো।

চ্যারকেটু দাঁড়িয়েছিল সাতথামারের রাস্তাটার মুখে, বটগাছটার উল্টো-দিকে। তার পাশে ছোট চায়ের দোকানটা থেকে নেংগু হঠাৎ লাফিয়ে বেরিয়ে এল। কাপড়ের খুঁটটা ধরে এমন টান দেয়, ডান দিকের কুঁচকি পর্যন্ত দেখা যায়। বাঁ হাতটা সোজা মাথার ওপর তুলে নেংগু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আঙুল নাড়িয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'ঠিকো আছে, নেংগু একখান গাড়িও এইঠে যাবার দিবে না, তোমরালা যে হও না কেনে, কংগ্রেসের ঘর, দুই কমিনিস্টের ঘর, কারো কোনো মিছিলত বাহাদুরের মানষি যাবা না হয়। এই গাড়ি ঘুরাও'—বলে নেংগু পশ্চিমদিকের গাড়িটার দিকে ধেয়ে যায়—যে-গাড়িটা শিলিগুড়ির দিকে মুখ করে, খানিকটা দূরে একা-একা দাঁড়িয়ে। নেংগুর ছুটে যাওয়া দেখে চারপাশের সবাই হাততালি দিয়ে ওঠে, হাসির আওয়াজ ওঠে। কোনো-এক দোকানের ভেতর থেকে নেংগুকে ভেংচিয়ে চিৎকার ওঠে, 'এই গাড়ি ঘুরাও।' ছোট চায়ের দোকানটা থেকে দু-একজন শহরের বাবুর ঘর বেরিয়ে আসে, সঙ্গে স্থানীয় যারা বসে ছিল, তারাও। শহরের বাবুদের মধ্যে বাহেবাবুকে চ্যারকেটু চেনে—বাহেবাবুকে না চিনলে বাহাদুরে থাকা যেত না বলে চেনে—বাহাদুরের মাথা, সবচেয়ে বড় জোতদার, শহরে থাকেন।—'আরে বাপা হে, ব্যাপারখান্ তো সাঁটিয়াল হবা ধরিছে, বাহেবাবু নিজে আসিছেন মিছিল উঠাবার তানে।'

বাহেবাবু খাটো মোটা মানুষ। তাড়াতাড়ি হেঁটে নেংগুর কাছে গিয়ে নেংগুর হাত ধরেন, 'হে-ই নেংগু তুই কি খ্যাপা হলি? তোক খেপাবার ধরিছে

boiRboi.net

আর তুই খেপি যাছিস ?'

'না, হামাক্ ছাড়ি দেন বাহেদা। মুই দেখিম, নেংগু ছাড়া বাহাদুরঠে কোন গাড়ি যায় ?'

'আরে ছাড় কেনে, ছাড়, চল্, ঐঠে বসিবি,' নেংগুর হাত ধরে বাহেবাবু বটতলার দিকে টেনে নিয়ে যান। বীরেন রায় কমিউনিস্ট, সি-পি-আই-এর ঘর। সে বাহেবাবুকে আসতে দেখে বাড়ির ভেতর থেকে একটা বেঞ্চি তুলে এনে চায়ের দোকানটা ছাড়িয়ে পেতে দেয়, তারপর হাত দিয়ে বেঞ্চিটা মুছে একটু সরে দাঁড়ায়। বাহেবাবু গিয়ে বেঞ্চিটাতে বসেন, নেংগুকে বসান। দেখতে-দেখতে বাহেবাবুর দিকে পায়ে-পায়ে দু-একজন এগিয়ে যায়। বাঁশের মাচানের ওপর শহরের এক প্যাণ্টপরা মাঝবয়সি বাবু বসে ছিল, পাতলা চেহারা, গোপাল কুণ্ডু, শহরে তারা-হাতুড়ির নেতা। তার দিকে তাকিয়ে বাহেবাবু গলা চড়িয়ে বলেন, 'গোপাল, এদিকে এসো।' গোপাল কুণ্ডু সিগারেট টানতে টানতে উঠে আসে। 'বসো'—বাহেবাবু বলেন। গোপাল কুণ্ডু নেংগুর পাশে বসে। 'গোপাল তুমিই বলো, নেংগুকে ছাড়া বাহাদুরে কোনো পার্টি কোনো কাজ করতে পারে ?'

কথার জবাব দেবার আগে গোপাল কুণ্ডু ঠোঁট ফাঁক না-করে ঠোঁটটা মোচড়ায়, তারপর মাথাটা একটু ঝাঁকায়, যেন নিজের জবাবটাকে নিজেই একটা তারিফ দিয়ে নেয়। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে খুব মৃদুস্বরে বলে, 'আরে তা-ও কি হয় ? তাই ত বাহাদুরে যে পার্টিই আসুক নেংগুবাবু একবার ছুঁয়ে দেন।' কথাটা এমনভাবে গোপালকুণ্ডু আরম্ভ করে যেন এর আগেও কিছু কথা আছে, আর এমন ভাবে শেষ করে যেন এর পরেও অনেক কথা আছে। কথা বলার রসের জন্য শহরে গোপাল কুণ্ডুর খুব নাম। গোপাল কুণ্ডুর জবাব শুনে বাহেবাবু হেসে ওঠেন, সঙ্গে-সঙ্গে যারা এতক্ষণে এদের ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারাও হাসে। এক বুড়ো মাথা নেড়ে বলে, 'তয় ?' সকলের হাসি থামলে গোপাল কুণ্ডু নেংগুর দিকে তাকায়, তারপর তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বলে, 'তা নেংগুবাবুর এত রাগ হল কেন ?' গোপাল কুণ্ডু খুব আস্তে কথা বলে, গলা চড়ায় না, তাই কথাগুলো বলার জন্য তাকে সময় বেছে নিতে হয়, যাত্রাদলের সবচেয়ে পুরনো অভিনেতা যেমন হাততালি আর হাসির ভেতর তার 'ডায়ালগ' বলার সময়টি বেছে নেন, অভ্রান্ত।

বাহেবাবু নেংগুর পিঠে হাতটা রেখে বলেন, 'আরে ঐ নগেন সরকার ওর পেছনে লেগে বলল, বাহেদা, নেংগুকে আপনার ট্রাকে তুলবেন না। কেন ? না,

মাঝরাস্তায় যদি ও বলে বসে আমি এখন আর আপনার দল করব না, তখন আপনি কী করবেন ? তা এই কথা শুনে নেংগু একেবারে খেপি গেইল।'

চারপাশের ভিড়টার ভেতর সামান্য একটু হাসি উঠেই থেমে যায়। কারণ, গোপাল কুণ্ডু বা বাহেবাবু হাসেন নি। কিন্তু সামনের সেই বুড়ো এবারও মাথা নেড়ে বলে ফেলে, 'তয়' ? বলাটা ঠেকাতে পারে না।

গোপাল কুণ্ডু কোনো কথা বলে না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে আর ঠোঁটটা মোচড়ায়। দাঁতের গোড়ায় জিভ দিয়ে চকাস-চকাস শব্দ তোলে। যখন বোঝে এখন সবাই তার কথাটা শুনবে, তখন খুব আস্তে বলে, 'সে দোষ কি আর নেংগুবাবুর একার ? সব ত আপনাদের খুঁটায় বাঁধা। বাঁধা ত আছেই, একটু টানাটানি করলেও ত আপনারা চিৎকার করবেন, হে-ই নেংগু কী করিস।'

বাহেবাবু গোপাল কুণ্ডুর খোঁচাটা গায়েই মাখলেন না, হেসে বলেন, 'আরে আমি একদিকে থাকলে নেংগুও সেদিকেই থাকবে, বুড়াদাদাক কি ফেলি যাবার পারিস নেংগু ?'

বাহেবাবু নেংগুর ঘাড়ের ওপর দুটো ঘুষি মারেন। চারপাশের ভিড়টা সামান্য হেসে উঠে। সামনের সেই বুড়ো মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'না পারে।'

গোপাল কুণ্ডু তার কথাটা বিফলে যায় দেখে বলে ওঠে, 'দাদার ভারে যে নেংগুবাবুর ঘাড় যায়, তাই মাঝেমাঝে ঘাড় নাড়া দেয়।'

বাহেবাবু বেশ মোটা বলে, কথাটা লাগসই হয়। বাহেবাবুও হেসে ওঠেন। সবাই হেসে উঠে থেমে গেলে, বাহেবাবু একটু হাসি-হাসি মুখে বিষণ্ণ সুরে বলে ওঠেন, 'বাবা-বড়দাদা বুড়া হইলেই ভারী হয়, আর ভারী হলি কি দাদা-বাবাক দাহ করিবার তানে কাঁধ দিবে না ?'

সমস্ত ভিড়টা গম্ভীর হয়ে যায়। গোপাল কুণ্ডু কোনো জবাব দেয় না। সামনের বুড়ো এবার শুধু মাথা ঝাঁকায়। চারপাশের নীরবতার সুযোগে বাহেবাবু বলেন, 'নতুন ধোকর বাপের (সৎবাপ) চাইতে নিজের পুরান বাপটাই ভাল।' যেন যুক্তফ্রন্টের সরকার, নির্বাচন, কংগ্রেসের নতুন সরকার —এইসব প্রায় দশ বছরি অভিজ্ঞতার এটাই সার কথা, সিদ্ধান্তের মত শোনায়। বাপ, দাদা, ছেলে, সৎকার, পরিবার—এইসব প্রসঙ্গ টেনে বাহেবাবু যেন সমস্ত অবস্থাটার ভেতর একটা ঘরোয়া ভাব এনে দেন, তিনি নিজে সেই ঘরোয়াভাবের কেন্দ্র হয়ে যান।

'কনেক আস্তা (রাস্তা) করি দেন ত', বলতে বলতে বীরেন রায় চার কাপ

boiRboi.net

চা একটা কলাইকরা থালার ওপর নিয়ে আসে। সবাই সরে জায়গা করে দেয়। প্রথমে বাহেবাবুর সামনে ধরে। বাহেবাবু একটা কাপ তুলে নেন। তারপর গোপাল কুণ্ডুর সামনে ধরে। গোপাল কুণ্ডু একটা কাপ তুলে নেয়। বাকি দুটো কাপসহ থালাটা নিয়ে বীরেন রায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ভিড়ের মাথার ওপর দিয়ে কাউকে খোঁজে যেন।

'আরে ও-কাপটা নেংগুকেই দাও'—বাহেবাবু বলেন।

নেংগু বলে ওঠে, 'না, না। আরে, আপনি হচ্ছেন কংগ্রেসের ঘর আর গোপালদা তারাহাতুড়ির ঘর। আর বীরেনের নিজের ঘরটাক দিবে না?'

'আরে তাই ত, বিশুকে ডাকো, ডাকো', বাহেবাবু বলেন।

'হে বিশুদা, এইঠে আস,' ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ একজন ডেকে বলে।

বাহেবাবু বলেন, 'তমাল আছে নাকি, দেখ ত।'

নেংগু উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকে, 'হে-এ তমালদা, তমালদা হে।'

দূর থেকে কেউ আওয়াজ দেয়, 'কে? যাচ্ছি।'

রাস্তার উল্টোদিকে মাটির ওপর বিশু উবু হয়ে বসে ছিল। বাহেবাবুর ভিড় থেকে তাকে ডাকলে সে জবাব না-দিয়ে বসেই থাকে। বসে বসে বাঁ দিকে তাকায়। ওর বাঁ হাতটা বাঁ হাঁটুর ওপর টানটান। ডান হাতটা ভাঁজ করা, আঙুলের ডগায় কুটোমতো কিছু-একটা ভাঙছে। এটা সবাই বোঝে আসবে না বলেই বিশু শুনতে না-পাওয়ার ভান করেছে। বাহেবাবুর খাশজমি যুক্তফ্রন্টের আমলে বিশু দখল নিয়েছিল। কিন্তু সে-সব ত পুরনো কথা। বাহেবাবু বলেন, 'বিশুকে ডাকে', বলো, আমি ডাকছি।'

'হে বিশুদা, তোমাক্ বাহেদা ডাকোছ।'

বিশু কোনো জবাব দেয় না। সমস্ত ভিড়টা একবার বাহেবাবুর মুখের দিকে আর-একবার রাস্তার ওপাশে বিশুর দিকে আড়চোখে তাকায়। যেন চায়ের কাপটা সামলাতেই বীরেন রায় চায়ের কাপ দুটো নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সে জানে, পরে বিশু তাকে এক হাত নেবে।—তোমার কি কাম নিজের ঘর থেকে বেঞ্চি এনে, চায়ের দোকান থেকে চা এনে বাহেবাবু আর গোপালবাবুকে খাওয়ানোর?—কিন্তু বীরেন কী করবে? গোপাল কুণ্ডু কি আর। সগার কাথা ছাড়ি দাও। কিন্তুক বাহেবাবু যদি আসি এইঠে এই বটতলাত্ খাড়ান আর বীরেন যদি সামনত্ থাকে, তাহলি বীরেন একটা বেঞ্চি না আনিবার পারে? এক কাপ চা না আনিবার পারে? আরে এ্যালায় দিনকাল বদলি গিসে, তাই বাহেবাবু আসি বটতলাত্ বসে। কায় কবে বাহাদুরত

দেখিসে বাহেবাবু আসি বটতলাত্ বসি আছে ? কায় কবে দেখিসে ? এই যে এ্যালায় বাহেবাবু বিশুদাকে ডাকাবার ধইচচে, বিশুদাদা, পারিবু তুই না-আসিবার ? পারিবু ?

বাহেবাবু ডিশে ঢেলে চা খাচ্ছিলেন। আস্তে-আস্তে। বিশুকে ডাকাটুকু যেন তাঁর কাজ ছিল। আসা, না-আসা সেটা বিশুর ব্যাপার। বাহেবাবুর তাতে কিছু যায় আসে না। সেই যুক্তফ্রন্টের আমলে বাহেববাবুর দশ একর জমিতে বিশু কোথা থেকে মদেশিয়া এনে বসিয়ে ছিল। শুধু দখল নয়, পাট্টা, এমন-কি লোন শুদ্ধু বের করেছিল। এখন আর সেখানে বিশুর দল নেই অবশ্য। গত বছর-তিন তারা বাহেবাবুর আধিয়ার হয়ে ঐ জমিতেই আছে। পাট্টা অবশ্য তাদেরই নামে। শুধু বলদ-বিছন-খাওয়া বাহেবাবুর। দশ আনি-ছ আনি ভাগা। আজ তারা বাহেবাবুর সঙ্গে কংগ্রেসের মিছিলে যাবে। বাহেবাবু যখন বিশুকে ডাকলেন তখন তিনি জানেন, বিশু নাও আসতে পারে। এই ভয়েই যুক্তফ্রন্টের আমলে তাঁর জমি যখন বিশু দখল করল তখন ডাকাডাকি করেও বিশুকে আনাতে পারেন নি। তখন বিশুর জেতার সময়, বিশু বাহেবাবুর ডাকে না-ও যেতে পারত। কিন্তু এখন যে বিশুকে ডাকলেন, বিশু না-এলেও তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। বীরেন রায়, বিশুর দলের লোক, চা এনেছে। তাই বিশুকে ডাকছেন। তাঁর পক্ষে ডাকাটা ভদ্রতা বলে ডাকছেন। কিন্তু যদি না-আসে তাহলে এখানকার লোকজন বিশুর নিন্দে করবে—একখান্ পুরানা বড় মানষি যদি চা খোয়ার তানে ডাকে আর যদি না যাও, উমরার রপমান হয় না ? হলেন না-হয় তোমরা ধানের শিষ আর উমরা কংগ্রেস, কিন্তুন্ বড় ত বড়-ই !

এদের কোনো ডাকেরই সাড়া না-দিয়ে বিশু জানিয়ে দেয় যে সে এখানে আসতে চায় না। সেটা বোঝানো হয়ে গেলে, বেশ খানিকটা দেরি করলেও তাকে উঠতেই হয়। উঠে, দাঁড়িয়ে, দুই হাত মাথার ওপর তুলে, হাতের কুটোটা টুকরো করতে-করতে রাস্তাটা অন্যমনস্ক পার হয়, যেন এদিকে তার অন্য কাজ আছে। বিশু কোনো ট্রাক আনতে পারে নি। তাকে হাঁটিয়ে মিছিল নিয়ে যেতে হবে। তার মিছিলে লোক হবে কিনা সন্দেহ। এক যদি শুকরা পাড়া থাকত, তাহলে মদেশিয়ারা হেঁটেই মিছিল করত। কিন্তু বিশুর দখল করা খাশ জমিতে এখন মদেশিয়ারা বাহেবাবুর আধিয়ার। তারা ত এখন বাহেবাবুর মিছিলে যাবে। বাহেবাবুর ডাক শুনে বিশু যদি চা খেতে না যায় তাহলে কানাকানি হয়ে যাবে, সে বাহেরাবুকে অপমান করেছে, তার মিছিলে

boiRboi.net

লোক হবে না। আর এখন কংগ্রেস সরকার। বাহেবাবুর চোখের সামনে বিশুর মিছিলে লোক আসতে ভয় পাবে। আসলে বাহেবাবুর ডাক শুনে ওখানে যেতে তার যেন তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ওখানে গোপাল কুণ্ডু বসে আছে, যাওয়া মাত্র ত ঝগড়া লাগবে। এই সব ঝামেলা বীরেনের জন্যে। বেশি দেউনিয়াগিরি দেখাচ্ছে বাহেবাবুকে দেখে—বেঞ্চি, চা। আর, আসলে শিট খুলে-খুলে, মৌজা ম্যাপ দেখে-দেখে, বীরেনই ত বাহেবাবুর খাশজমিগুলো বের করেছে। ব্যাটার মাথা এত ঠাণ্ডা আর হিশাব এমন পাকা যে কারো কোনো ভুল ধরার উপায় নেই। আর, এখন বাহেবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে যেন শালা বাহেবাবুর বাছুর।

বিশুকে দেখে ভিড়টা একটু জায়গা ছেড়ে দেয়। বিশু ভিড়ের ভেতর না ঢুকে বাইরে থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে সরে পড়তে চায়। কিন্তু তাকে দেখে নেংগু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আরে বসো, বসো, বিশুদা।'

'আরে তুমি বসো নেংগুদা, আমি এখানে আছি।'

'আরে তোমরালা শহরের মানষি আসিছেন বাহাদুরত, আগত ত তোমাক্ বসা দিবার নাগে।'

'আমি ত বাহাদুরেরই লোক হয়ে গেছি, চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর ষোল ঘণ্টাই এখানে থাকি। তুমিই বরং শহরের লোক। আমি ত আর মিছিলে লোক নেয়ার দরকার পড়লে ট্রাক নিয়ে আসি না। রোজই সাইকেলে আসি, আজও তাই এসেছি।' বলতে-বলতেই বিশু বোঝে সে যা করতে চায় নি, তাই করে বসল, গোপাল কুণ্ডুর সঙ্গে সেধে ঝগড়া বাধাচ্ছে। নেংগু এমন কিছু বলে নি, তার কথার জবাবে এত কথার কোনো মানেই নেই। মিছিল নিতে আসার কথা বাহেবাবুর গায়ে লাগবে না—বাহেবাবু এ-সব কথার বাইরে। গোপাল কুণ্ডুকে বলা, গোপাল কুণ্ডুর গায়েই লাগবে।

রাস্তার ওপারে বিশু যখন একা-একা বসেছিল আর এখান থেকে বাহেবাবুর নাম করে তাকে ডাকছিল, তার সমস্ত রাগটা পড়তে চাইছিল, বাহেবাবুর ওপর। উঠে এখানে আসতে বাধ্য হওয়া পর্যন্তই ভাবটা সেইরকমই ছিল। এখানে এসে নেংগুর কথার ছুতো ধরে সমস্ত রাগটা ঝাড়ল গোপাল কুণ্ডুর ওপর।

বাহেবাবু কি জানতেন, এখন বিশুর হারার সময়, সব কাজই অনেক হিশেব কষে করবে, আর হিশেব কষলে, বাহেবাবু ডাকলে বিশুকে আসতেই হবে।

গোপাল কুণ্ডু কিন্তু বিশুর কথাটা গায়ে মাখে না। বেঞ্চিতে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলে, 'আরে বসো, বিশু বসো, রোজ সাইকেলে এলে একদিন কি আর

বেঞ্চিতে বসা যায় না ?'

অত কথা শোনানোর পর কেউ বসতে বললে, বসা ছাড়া উপায় থাকে না, যদিও বিশু জানে আসলে গোপাল কুণ্ডু তাকে বসাল, তাকে ধীরে-ধীরে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাটবে বলে। কিন্তু কী আর করবে বিশু, সে নিজেই ত সমস্তটা শুরু করেছে।

আর আজ যেন বিশুর সবার সামনে একের পর এক অপদস্থ হবারই দিন। মনে-মনে অনেকক্ষণ ধরেই সে ফুঁসছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আর কারা-কারা আসবে—এখানকার জিলা কমিটি ভাঙা হবে কি না, এই জিলায় অ্যাড হক কমিটি হবে কি না, সেই সব ঠিক করতে। তাই সরকারি কংগ্রেস আর বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস যে যার শক্তি দেখাবে। তার জন্য কংগ্রেসের সব পক্ষই সাজো-সাজো করে আজ মিছিল তুলতে লেগেছে। আবার আজই নয়-বাম পার্টির আইন অমান্য। বিশুদের পার্টি আইন অমান্য করবে না, তারা কাছারিতে অবস্থান করবে। একই দিনে, একই সময়ে, সবগুলো পার্টির মিছিল পড়েছে। আজ আর টাউনে জায়গা হবে না।

সাইকেল করে এসে খুব সকালেই টাড়িতে-টাড়িতে একটা ঘুরান দিয়েছে বিশু। তখন আশাও ছিল যে বেশ কিছু লোক অন্তত মিছিলে নিয়ে যেতে পারবে। তারপর বেলা একটু বাড়তেই বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের তমাল একটা ট্রাক নিয়ে এসে হাজির। তাতে বিশুর কিছু যায়-আসে না। কংগ্রেসিরা ত আর তার মিছিলে যেত না, তমালের ট্রাকে গেলে তার কী এল গেল। কিন্তু বেলা আর-একটু বাড়তে স্বয়ং বাহেবাবু একটা ট্রাক নিয়ে আসবেন, এটা বিশু ভাবতে পারে নি। বাহেবাবু বাহাদুর অঞ্চলের এককালের ধর্মবাপা। বাহাদুরের তামান লোক শহরে বাহেবাবুর কাছে সারা বছর যাতায়াত করত। কার বিছন লাগবে, কার সার লাগবে, কার বৌয়ের ব্যথা উঠেছে—অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি লাগবে, কার পাটগাছে পোকা লেগেছে—বি-ডি-ও অফিস থেকে লোক পাঠাতে হবে, কার গরুর বাঁটে ঘা হয়েছে—মোবাইল ডাক্তার পাঠাতে হবে, সব কিছুতেই বাহেবাবু। আর বাহেবাবু শুধু প্রত্যেক ভোটের আগে কটা হাটে আসবেন। হাটে কোনো দোকানের মাচানে বা গাছতলায় বাহেবাবুর দরবার বসবে। আর ভোটের দিন বাহেবাবু ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকবেন। কংগ্রেসের দুই পক্ষ বা তিন পক্ষের গোলমালটা এতই সাংঘাতিক যে বাহেবাবুকে ট্রাক নিয়ে বাহাদুরে মিছিল তুলতে হয় ? নাকি বাহাদুরে কংগ্রেসের নামে তমাল এসে মিছিল তুলে নিয়ে যাবে, এটাই বাহেবাবু বরদাস্ত করতে পারেন না ? বাহেবাবুকে আসতে দেখে

boiRboi.net

বিশু বুঝেছে ব্যাপার খুব জোরদার। কিন্তু ঘাবড়ায় নি। কংগ্রেসের লোক নিয়ে বাহেবাবু আর তমালের ঝগড়ায় তার কী এসে যায়। কিন্তু বাহেবাবু আসার ঘণ্টা-দেড় বাদে এসেছে গোপাল কুণ্ডু। গোপাল কুণ্ডুকে দেখার পর থেকেই বিশুর মেজাজটা বিগড়েছে। এমনি ত রাগ করার কিছু নেই। প্রধান পাড়াতে ওদের সংগঠন আছে, সেখানে কানু মাস্টার আছে, ওদের একটা বড় মিছিল আনবেই। আর বাহেবাবু নিজে হাজির থাকায় যারা সরাসরি গোপাল কুণ্ডুদের দলে না, তারা কেউ গোপাল কুণ্ডুদের গাড়িতে ওঠার সাহস পাবে না। সুতরাং গোপাল কুণ্ডু আসায় বিশুর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে নি। কিন্তু ক্ষতিবৃদ্ধি ত পরের কথা, গোপাল কুণ্ডু বাহাদুরে এসেছে, এটাতেই বিশুর রাগ। কংগ্রেস করুক আর যাই করুক বাহেবাবুর সঙ্গে বাহাদুরের সম্পর্ক পঁচিশ-তিরিশ বছরের। সেই কংগ্রেসের সুতো ধরে তমাল-টমালও আসতে পারে। কংগ্রেসের সংগঠন নিজেরা দখল করার চেষ্টা ত ওরা করবেই। কিন্তু গোপাল কুণ্ডু আসবে কেন। ওদের লোকজন নিয়ে মিছিল ত কানু মাস্টারই নিতে পারে। নেতাগিরি ফলানোর জন্য ট্রাক নিয়ে বড় নেতাকে আসতেই হবে? আর এই রাগটা সামলে রাখতে পারল না বলেই নেংগুর এক কথার জবাবে বিশু সাত কথা শুনিয়ে দিল। শোনাতে-শোনাতে বুঝেছিল, শোনানোটা ঠিক হচ্ছে না। যে-ঝগড়াটা সে এড়াতে চায়, সে-ঝগড়াটা বাধিয়ে ফেলছে। তবু কথাগুলো যেন নিজের বেগে বেরিয়ে আসে।

বাহেবাবু বলে ওঠেন, 'বিশু খুব খাটতে পারে।'

আর সঙ্গে-সঙ্গে, বাহেবাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই এদের ঘিরে থাকা ভিড়ের সামনে দাঁড়ানো দেবেন মাথা নাড়িয়ে বলে ওঠে, 'সে কথা আর কী কহেন বাবু, বিশুবাবুক ঘুরিবার দেখিলে নিজের নাজ্জা হবার ধরে, হায় হায় হায়, একোটা মানষি এ্যানং খাটিবার পারে?'

দেবেন একটু মোটা, একটাও দাঁত নেই, সারাটা মুখ ফোলা, সম্পূর্ণ ভাঙা, একটু তোতলা। ফলে, সে কী বলে তা বিশু বাদে আর-কেউই বোঝে না।

বাহেবাবুর কথাটার নানা রকম মানে থাকতে পারে। হয়ত উনিই একমাত্র বুঝেছিলেন এতগুলো ট্রাকের সামনে বিশু আজ অবধারিত হেরে যাবে, অপদস্থ হবে, অথচ শহরের 'মানষিগুলার' ভেতর ত এক বিশুই বাহাদুরে পার্টির কাজ করে—এইসব বুঝে উনি হয়ত বিশুর প্রাপ্য স্বীকৃতি আগেই দিয়ে রাখেন। অথবা, বিশুর সঙ্গে তাঁর এই প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাতে আর কথায় তিনি বিশুকে জানাতে চান যে পুরনো কথা তাঁর মনে নেই, মন থাকে না, খাশজমি নিয়ে যা

boiRboi.net

হওয়ার তা মিটে গেছে। এখন বাহেবাবুর উদার হতে বাধা নেই, কারণ এখন বাহেবাবু জিতছেন। অথবা, এই সব কোনো কিছুই হয়ত ঠিক নয়, বিশু গোপাল কুণ্ডুকে যে-রকম ঠুকল, তাতে গোপাল কুণ্ডু এখুনি ওকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে জবাই করবে, তাই বাহেবাবু একটু নরম করতে চাইলেন অবস্থাটা।

'কী ব্যাপার, এত ডাকাডাকি কিসের?' বলতে-বলতে ভিড় ঠেলে তমাল ঢোকে।

বাহেবাবু বলেন, 'এই, তমালকে এক কাপ চা দাও', আর এই সুযোগটা নেবার জন্য বিশু উঠে দাঁড়ায়, 'বসেন তমালবাবু।'

বিশুকে দুহাতে বেঞ্চির ওপর বসিয়ে দিয়ে তার পাশে বসতে-বসতে তমাল বলে, 'আরে বসুন, বসুন বিশুবাবু, আপনি উঠবেন আর আমি বসব, তা কি হয়?'

'না, আমি একটু দেখব ওদিকে', বিশু বসে থেকেই বলে।

'আরে মশাই, আমরাই জিতি আর বাহেবাবুরাই জেতেন, আপনাদের ত লাগবেই। আপনারা ছাড়া তো ফাদারল্যাণ্ড সাহায্য দেবে না'—তমালের কথাটা শুনে গোপাল কুণ্ডু হো-হো করে হেসে ফেলে আর সেই হাসি শুনে বিশু কাঠ হয়ে থাকে। ধীরে-ধীরে হাসিটা থামে। হাসলে গোপাল কুণ্ডুর চোখে জল আসে, সে রুমাল বের করে চোখের জল মোছে আর ততক্ষণ সবাই চুপ করে থাকে সে কী বলে শুনতে। এত কাঁচা বলিয়ে নয় গোপাল কুণ্ডু যে হাসি, গলার শ্লেষ্মা আর চোখের জল মিশিয়ে সে এমন স্বরে কথাটা বলবে যে কেউ বুঝতেই পারবে না আর কথাটা মাঠে মারা যাবে। চোখের জল মুছে, একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে, সে এমন নিচু স্বরে কথাটা তমালকে বলে, যাতে এতক্ষণের হাসিটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে পারে।

'তাহলে তমাল, সাহায্য ছাড়া তোমাদের কোনোদিনই চলবে না। হয় আমেরিকার, নয় সোভিয়েতের।'

তমালের রাজনীতি খুব সোজা, সে নিজে যেটা বোঝে সেটাই ঠিক বোঝা আর তার এই বোঝাবুঝিটা খুব সরল। তমাল বেশ জোর দিয়ে নিজের সেই সরল বোঝাটা আবার অন্যদের বোঝায়। ফলে, অনেক সময় এমন হয় যে ঠিক বুঝে ওঠা যায় না কথাটা তমাল বোঝাচ্ছে কেন। যেমন, গোপাল কুণ্ডুর কথার জবাবে, বেশ রহস্যময় হেসে, তমাল ডান হাতের তর্জনীটা নেড়ে বলল, 'বাট নট ফ্রম চায়না', বলেই চায়ের কাপে এক চুমুক দেয়, ইতিমধ্যে তাকে চা দিয়ে গেছে।

বিশু খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করে, তমালবাবু থাকলে আর-কাউকে খুব একটা কথা বলতে দেয় না। ফলে গোপাল কুণ্ডু বিশুকে আর নাগালে না-ও পেতে পারে।

গোপাল কুণ্ডু ঠোঁট মুচড়ে নিল, জিভের ডগা দিয়ে দাঁতের গোড়া খোঁচানোর চিলিক-চিলিক শব্দ তুলল, পা নাচাল, যেন তমালের কথাটা সে ভাবছে। আর গোপাল কুণ্ডুর এই চুপচাপ থাকাটাকে জব্দ হওয়া ভেবে নিয়ে তমাল সেই তৃপ্তির হাসিটা হাসে। গোপাল কুণ্ডু বলে, 'না, সে ত বটেই, চীন থেকে নেবে কেন? কিন্তু আমেরিকা বা রাশিয়া থেকে নেবে ত? তমাল—'

'ও ডেফিনিটলি,' বলে তমাল দুই হাত দুদিকে ছড়াতে যায়, কিন্তু বাঁ হাতটা বিশুর গায়ে ঠেকে যায়, আর ডান হাতটায় চায়ের কাপ।

গোপাল কুণ্ডু আর তমাল শহরের লোক। সেই সুবাদেই গোপাল কুণ্ডু হয়ত তমালকে 'তুমি' বলে। আবার তেমনি সুবাদেই বাহেবাবু গোপাল কুণ্ডুকে 'তুমি' বলেন। বিশুর বাড়ি কলোনিতে। সে তাই এদের সঙ্গে বসতে চায় না। এদের সঙ্গে তার সম্বোধনটা ঠিক হয় না, সম্বন্ধটাও ঠিক হয় না। গোপাল কুণ্ডু বিশুকে 'তুমি' বলে, বিশু গোপাল কুণ্ডুকে 'দাদা' বলে কিন্তু তমাল বিশুকে কোনদিনই 'দাদা' বলবে না, আর তমালকে বিশু 'তমালবাবু' বলেই ডেকে যাবে।

'তা তমাল, বিশুদের ত তোমরা ছাড়বে না, তাহলে ত আবার সোভিয়েত রাগ করবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আর বিশুবাবুদের আমরা যদি ছেড়ে দিই তাহলে ত আপনাদের নয়-বামকে দশ-বাম করে দেবে, ত—খ—ন?' বলেই তমাল হো-হো করে হেসে ওঠে, যেন সে গোপাল কুণ্ডুর একটা খুব গোপন মতলব ধরে ফেলেছে।

'তাহলে বিশুরা হল গিয়ে তোমাদের মুখোশ?'

'কেন দাদা?'

'ঐ মুখোশটা দেখিয়ে সোভিয়েতের সাহায্য নেবে।'

'হ্যাঁ। তা মুখোশ হলে মুখোশ।'

'আর তোমাদের ঢাল?'

'কেন দাদা?'

'ঐ ঢালটা দিয়ে আমাদের ঠেকাবে।'

তমালের হো-হো হাসি শুনে বিশুর গা জ্বলে যায়। এতক্ষণ সে নিশ্চিন্ত

boiRboi.net

হয়ে বসে ছিল যে গোপাল কুণ্ডু আর তাকে ধরবে না। খানিকটা অপ্রস্তুত ছিল বলেই গোপাল কুণ্ডুর কথাটা খুব লাগল। তখন তমাল হো-হো করে হাসছে, যেন খুব মজার কোনো কথা হয়েছে, 'এইটা ঠিক বলেছেন দাদা, আপনাদের আমরা ঠেকাবই, আপনাদের আর উঠতে দিচ্ছি না, অ্যাজ এগেইনস্ট ইউ উই হ্যাভ নো কোয়ারল, উই আর ইউনাইটেড, কী বলেন বিশুবাবু।'

তমাল যে চট করে গোপাল কুণ্ডুকে একদিকে রেখে আর-একদিকে বাহেবাবু, বিশু আর নিজেকে দাঁড় করাল এটা বিশুর খারাপ লাগে, খুবই খারাপ লাগে। মনে হয় তর্কটা বাধিয়ে, তমালবাবুকে দিয়ে ঐ-সব বলিয়ে গোপাল কুণ্ডু ব্যাপারটা এ-রকম সাজিয়ে নিল। আর তাকে, বিশুকে, মুখোশ আর ঢাল বলে গাল দিয়ে নিল। এর জবাবটা বিশুর ঠোঁটের আগায় এসে গিয়েছিল, যেমন আসা উচিত, গোপাল কুণ্ডুরা ত চীনের মুখোশ আর পাকিস্তানের ঢাল। কিন্তু এত কথা বলে তমাল, জবাবটা বিশু আর দিয়ে উঠতে পারে না।

আসলে কে কোন কথা বলবে, আর কোন কথার জবাব কে কাকে কী দেবে সব ঠিক আছে, সবারই ত জানাও আছে। তর্কের শুরু দেখলেই বলে দেয়া যায়, কোন কথার পর কোন কথা আসবে। তার একটা যদি পিছলে যায়, তখন আর সেটাকে ফিরিয়ে আনা যায় না, পরের সুযোগটার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। কথার পাল্টা কথা এইভাবে চলতেই থাকে। আর এই তর্কগুলো দশ-জনের সামনেই হতে হয়। এখানে যদি এতগুলো লোক না থাকত, তাদের ঘিরে যদি এই ভিড় না থাকত, তাহলে এই তর্ক হত না। শহরে কোথাও যদি তারা চারজন বসে, তাহলে সেখানে তর্ক হবে না। কিন্তু সেখানে দুজন বাইরের লোক থাকলেই, হবে। সমস্ত তর্কের শেষে মূল কথাগুলির কোনো জবাব পাওয়া যায় না। বিশুরা গোপাল কুণ্ডুদের বিড়লার সঙ্গে মিশিয়ে যখন গালাগাল দেবে, গোপাল কুণ্ডুরা সেটা কখনোই পাকাপাকি ব্যাখ্যা করবে না। গোপাল কুণ্ডুরা বিশুদের যদি মুসলিম লিগ তুলে গালাগাল করে, বিশুরা কখনোই তার কোনো পাকাপাকি ব্যাখ্যা দেবে না। শুধু তর্ক চলতে থাকবে।

গোপাল কুণ্ডু তমালকে বলে, 'না তমাল, তোমাদের ঝগড়া দেখে লোকে এত আনন্দ পাচ্ছে যে তোমাদের ইউনিটি আর দেখতে চায় না। তাতে মজা কমে যাবে। এই ধরো-না কেন, এই এখানে—একই ঝাণ্ডা, একই ফেস্টুন আর একই লিডারকে নিয়ে তোমরা কী রকম দুখানা গাড়ি সাজিয়ে বসে আছ। তোমরা যদি এক হয়ে যেতে তাহলে এই মজাটা কি আর দেখতে পেতাম?'

'হোয়াট? আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই, নো কোয়ারল, বাহেবাবুরা

বলুন, ঘুষখোর-মাতাল-বদমাস-ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার-জোতদার-জমিচোরদের পার্টি থেকে বের করে দেবেন, তাহলেই আমাদের আর-কোনো কথা নেই'—তমাল তার হাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে কথাটা শেষ করে দেয়।

'এরা সবাই চলে গেলে আর আপনাদের পার্টিতে থাকবে কে?' বিশুর মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়। বলে ফেলে বিশু খানিকটা স্বস্তি পায়, তমাল থেকে সে নিজেকে আলাদা করতে পেরেছে।

'তোমরা ত এক কাজ করতে পার বিশু' আজ, এতক্ষণে গোপাল কুণ্ডু সরাসরি বিশুর নাম ধরে বলে, 'তোমার লোকজনকে আর হাঁটিয়ে নিয়ে যাবে কেন, তোমাদের ত কংগ্রেসের সঙ্গে ফ্রন্ট আছে, বাহেদা আর তমালের গাড়িতে কিছু-কিছু তুলে দাও। আমাদের গাড়িতেও কিছু তুলে দিতে পার—তোমরা ত আবার বামপন্থীও বটে। তারপর শহরে পৌঁছে তিন গাড়ি থেকে তোমাদের লোক বেছে নিয়ে মিছিল সাজিয়ে নিও।'

'দ্যাটস ফাইন, দ্যাটস ফাইন,' বলে তমাল হেসে উঠলে বিশুকে হাসির ভান করতে হয়। কিন্তু কথাটা বলে গোপাল কুণ্ডু হাসে না। মনে হয় যেন সে বিশুকে সাহায্য করার জন্যই কথাটি বলেছে, এতে রেগে ওঠা যায় না।

সামনের বুড়া দেবেন তার দাঁতহীন মোটা মাথাটা ঝাঁকিয়ে, গালের মাংস কাঁপিয়ে হাসার চেষ্টা করে বলে ওঠে 'এ্যানং-না কাজের কাথা। মানষিলা এক গোঠো হইয়া শহরত যাও। সেইঠে যার-যার পার্টির মিছিল-মিটিং করি আবার গোঠো হইয়া চলি আস', দেবেনের গলা এত ভাঙা যে এক বিশু ছাড়া কেউই তার কথা বুঝে ওঠে না। কিন্তু কথাটা একবার শোনার পর গোপাল কুণ্ডুর কথা নিয়ে রেগে ওঠার সময় আর বিশুর হাতে থাকে না।

'তা, আজ কে জিতবে তোমাদের ভেতর?' গোপাল কুণ্ডু তমালকে জিজ্ঞাসা করে।

'সে দেখাই যাবে', তমাল বলে।

'বাহেদা—'

'এঁ্যা'?

'আপনি যে কোনো কথাই বলছেন না, তমাল একাই কি কংগ্রেস নাকি?' গোপাল কুণ্ডু বাহেবাবুকে খোঁচায়।

'আমরা ত কোনোকালেই কথা বলি না গোপাল, চিরকালই চুপচাপ থাকি। বক্তৃতা ত চিরকাল তোমরাই করো। আর আজকাল তমালরা করে। আমরা চুপচাপই থাকি'—বাহেবাবু খুব নিস্পৃহ গলায় ডান হাঁটুর ওপর তুলে দেয়া বাঁ

পায়ের তলা হাতাতে-হাতাতে বলেন, কারো দিকে না-তাকিয়ে। আসলে, বাহেবাবু কারো সঙ্গেই এখন ঝগড়া করতে চান না। তার একটা কারণ হতে পারে যে এইসব রাজনীতির ঝগড়া তিনি করতেই পারেন না, এত সব ঘটনা, সন-তারিখ তাঁর মনেই থাকে না। আর একটা গভীর কারণ এই হতে পারে যে এ-সব ঝগড়ায় কোনো লাভ নেই জেনেই তিনি করতে চান না, আর হয়ত আসলে বাহেবাবুর নীরবতার সামনে তাঁর প্রতিপক্ষ যত বেশি রেগে ওঠে আর চেঁচায় আর তর্ক করে তাঁর শক্তি তত বেশি ক্ষয় হয়ে যায় আর এইভাবে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করে ফেলাটা বাহেবাবুর লড়াইয়ের কায়দা।

'তা তমাল, তোমাদের ঝগড়াটা কী নিয়ে, আজ, প্রেসিডেন্টের সামনে?' গোপাল কুণ্ডু তমালকে উশকোয়। কোনো প্রশ্নেই তমালের আটকায় না, 'উই হ্যাভ নো কোয়ারেল, উই আর অল কংগ্রেস, কিন্তু এখানকার জিলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট যদি টেকস ব্রাইব ফ্রম দি ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স আর জিলা কংগ্রেসের সম্পাদক যদি সিমেন্টের ব্ল্যাকমার্কেটিং করে, তাহলে ওয়াজ ইট ফর দিস ছাট আওয়ার লিডার ড্রোভ আউট অতুল্য ঘোষেস অ্যাণ্ড গেভ আস এ নিউ কংগ্রেস?'—তমাল কখনো তার লিডারের নাম করে না, 'আওয়ার লিডার' 'আমাদের নেত্রী'।

'তা আজ তোমাদের প্রদেশ সভাপতি কী দেখবেন?' গোপাল কুণ্ডু জিজ্ঞাসা করে।

'কাদের জোর বেশি, কারা রিয়্যাল কংগ্রেস, পিপল কার দিকে'—তমাল।

'তোমরা আর বাহেদারা দুই লাইন দিয়ে বসবে আর উনি মাথা গুনবেন?' —গোপাল।

'নো, ছাট ইজ নট পজিব্‌ল্‌। শো অব্‌ স্ট্রেংথ দিয়ে'—তমাল।

'স্ট্রেংথটা মাপা হবে কী করে? তোমরা আর বাহেদারা মারামারি করবে, তারপর যে জিতবে, প্রেসিডেন্ট তার পক্ষে রায় দিয়ে যাবেন ত?'—গোপাল।

'নো, নো, সে কী করে হয়, প্রেসিডেন্ট দেখবেন, পেজান্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স কোন দিকে'—তমাল।

'তোমরা জিতলে কী হবে?'—গোপাল।

'জিলা কমিটি ভেঙে দেয়া হবে, অ্যাড হক কমিটি হবে'—তমাল।

'বাহেদারা সেটা মানবেন?—গোপাল।

'না মেনে আর উপায় কী'—তমাল।

'আর বাহেদারা জিতলে কী হবে?'—গোপাল।

boiboi.net

'ঐ চোর-বদমায়েশদের জিলা কমিটি বহাল থাকবে'—তমাল।

'তোমরা মেনে নেবে ?'—গোপাল।

'নেভার। আমরা আন্দোলন করব। আর আমরা ত কিছুতেই হারতে পারি না, কারণ আমরা অনেক বেশি, পেজাণ্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স আমাদের দিকে' —তমাল।

'কী করে সেটা মাপবেন, তোমাদের প্রেসিডেণ্ট ?'—গোপাল।

'যে ভাবে আপনারা মাপতেন গোপালদা, যুক্তফ্রণ্টের সময়,যে দুনিয়ার সব লোক আপনাদের দিকে', বলতে-বলতে বিশু উঠে দাঁড়ায়। ভিড়টাঠেলে বেরিয়ে যেতে-যেতে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে, 'তমালবাবু, গোপালদার কাছ থেকে পার্টি ভাঙার ট্রেনিং নেন, একেবারে এমন ট্রেনিং দেবে যে বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না'—বিশু বেরিয়ে যায়, যেন কথাটা বলার জন্যেই সে এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসে ছিল। সমস্ত কথাটার মধ্যে এমন একটা আকস্মিকতা আর তীব্রতা ছিল যে গোপাল কুণ্ডু খানিকটা থতমত খেয়ে যায়। সে বিশুর পেছনে বলে ওঠে, 'এটা কিএকটা খেলার নিয়ম হল বিশু, তোমার তাসটা ফেলে কোট ছেড়ে উঠে যাচ্ছ ?'

তমাল দাঁড়িয়ে পড়ে। বুড়া দেবেন মাটির ওপর বসে এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল, যেমনভাবে বসে নামগান শোনে। সারাটা মুখে তার এমন থলথলে মাংস যে চোখটা খুললেও বোঝা যায় না আর চোখের পাতাটা যেন টেনে তুলতে হয়, মাতালদের মত। 'তাহলে কাথাটা কী হইল ? এই তমালবাবুর দলটা হইল ঐ বাহেবাবুর দলের হাতুরি পার্টি ?' দেবেনের গলা এত ভাঙা যে তার কথা কেউই বুঝতে পারে না। কিন্তু দেবেন তার সম্পূর্ণ ফোকলা মাড়ি বের করে এমন নীরব ও বিস্তীর্ণ হাসিতে মুখমণ্ডল ভরে তোলে যে তার চোখ দুটো আর দেখা যায় না, মাঝে-মাঝে ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজে শুধু বোঝা যায়, হাসিটাতে শব্দও আছে, দেবেনের গলাটা ভাঙা বলে হাসিটা শোনা যাচ্ছে না। এমন মুক্ত, তরঙ্গিত, বিস্তীর্ণ অথচ সম্পূর্ণ নীরব হাসি খুব প্রবীণ বাউলদের মুখে দেখা যায়, দেহপিঞ্জরের ভেতরের মনের মানুষের একটা খুব ব্যক্তিগত সন্ধান যে জেনেছে। এই তর্কবিতর্ক থেকে সবগুলো পার্টিকে বোঝার আর ব্যাখ্যা করার আর এদের পরস্পরের সমীকরণের কোনো গোপন সূত্র যেন দেবেন-বুড়া পেয়ে যায়। সেই সারা শরীরব্যাপী তরঙ্গিত, শব্দহীন, নির্জন হাসির ওপর দূর থেকে একটা ছন্দিত তালবদ্ধ শ্লোগানের ধ্বনি ভেসে এসে পড়ে। মিশে যায়। মিছিল আসছে।

মিছিলের শব্দটা এসেছিল সাতখামারের রাস্তা ধরে। ফলে সবাই সেই

boiRboi.net

রাস্তার মুখে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মাঝখানে ন্যাশন্যাল হাইওয়েটা সবাই খালি রাখে, ট্রাক-বাস-ট্যাকসি ছুটছে। পাকা রাস্তার ওদিকে সাতখামারের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সবাই মিছিলটা আসতে দেখে। যারা ওখানে যায় না, তারা বটতলায় দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে দেয়। মিছিলের শব্দ পাওয়ামাত্র বাহেবাবুদের বেঞ্চি-ঘেরা দলটা ভেঙে যায়।

প্রথমে ঝাণ্ডাটা দেখা যায়, লাল। মিছিলটা মাঠ ভেঙে রাস্তায় এসে উঠছিল, তাই মানুষজন আগে দেখা যায় না, আগে দেখা যায় তাদের মাথার ওপরের ঝাণ্ডা। ঝাণ্ডাটা দেখেও তমাল দাঁড়িয়ে থাকে। বাহেবাবু এদিকে আসেনই নি। ধীরে-ধীরে স্লোগান উঠছে। কতকগুলো আওয়াজ শুধু শোনা যায়। মাঠ ভেঙে লোকগুলো রাস্তায় ওঠা শুরু করে আর এই মোড়ে দাঁড়িয়ে এরা মিছিলের যে-কোনো একজন মানুষকে চিনতে চেষ্টা করে। একজনকে চিনলেই মিছিলটা কোন দলের বোঝা যাবে, 'ঐঠে সামসুদ্দিন, না ?'

'হঃ, সামসুদ্দিন তিনোদিন হয় হেমকুমারী গিসে।'

মিছিলের সব মানুষই এখন মাঠ থেকে রাস্তায় উঠেছে আর রাস্তা ধরে বটতলির দিকে আসছে। মিছিলের একটু পেছনে সাইকেল হাতে কানু মাস্টারকে চেনা যায়, সঙ্গে-সঙ্গে মিছিলটাকেও চেনা যায়, মিছিলের স্লোগানগুলোও যেন স্পষ্ট শোনা যায়। বটতলিতে এত-লোক দেখে মিছিলটার গলায় জোর আসে। আরো জোরে-জোরে 'ধ্বংস হোক' 'চলবে না' বলতে-বলতে মুঠো করা হাত মাথার ওপর ছুঁড়তে-ছুঁড়তে মিছিলটা বটতলায় ঢুকে একবার ডাইনে আরেকবার বাঁয়ে তাকায়। সাইকেলটা ঠেলে কানু মাস্টার পেছন থেকে সামনে চলে আসে তাড়াতাড়ি, ধুতি হাঁটুতে তোলা, স্যাণ্ডেলজোড়া সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের সঙ্গে ঝোলানো, পায়ের পাতা ধুলোয় ঢাকা, মুখচোখ ঘামে তেলতেলা। মাস্টার একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে তাকায়। সামনে তমাল, কংগ্রেসের লোকজন। কানু মাস্টারের হঠাৎ সন্দেহ হয় কংগ্রেস তাদের মিছিল আটকাতে এসেছে আর কানু মাস্টার ডান হাতটা সাইকেলের হ্যাণ্ডেল থেকে তুলে মুঠো পাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'ই-ন্-কি-লা-ব', কানু মাস্টারের হঠাৎ চিৎকারে ত্বরিতে মিছিলটা যেন প্রস্তুত হয়ে যায়, এতক্ষণ মাঠঘাট হেঁটে আসা মিছিলটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিহরিত হয়ে যায়।

ঠিক সেই সময় গোপাল কুণ্ডু সিগারেট টানতে-টানতে বটতলা থেকে এই দিকে চলে আসে। তাকে দেখে কানু মাস্টার মিছিলের স্লোগানের ওপর গলা তুলে বলে, 'আমাদের গাড়ি কোথায় ?' সিগারেট ধরা আঙুলে

boiRboi.net

গোপাল কুণ্ডু একটু দূরে দাঁড় করিয়ে রাখা শিলিগুড়িমুখো ট্রাকটা দেখিয়ে দেয়। মিছিলটাকে সেদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে কানু মাস্টার সাইকেলসহ গোপাল কুণ্ডুর পাশে-পাশে চলে জিজ্ঞাসা করে, 'কী ব্যাপার?'

'ওদেরও মিছিল আছে। তোমার কত লোক এল?'

'পঞ্চাশ'।

'আর কত আসবে?'

'পঁচিশ-তিরিশ।'

চায়ের দোকানের ভেতর থেকে সাইকেলটা বের করে বিশু সাতথামারের ভেতর দিকে চলে যায়। ট্রাকের মিছিলগুলো আসা শুরু করে দিল, তার আগেই যদি তার হাঁটা মিছিল বের না-করতে পারে, তাহলে আর তার মিছিলে লোক হবে না। বিশু তাড়া দিতে চলে। কানু মাস্টারের কাছে ত আর বিশু হারতে পারে না।

কানু মাস্টারের মিছিলটা এসে যাওয়ার পর তমাল হাইওয়েটার ঠিক মাঝখানে দাঁড়ায়, মুদিদোকানটার সামনে, পশ্চিমদিকে মুখ করে। চিৎকার করে ওঠে, 'আ-সি-ন-দি-র।' এমনভাবে ডাকে তমাল যেন ইংরেজিতে কিছু বলল। আসিন্দিরকে তমাল আসিন্দিরদা বলে ডাকে, উত্তেজনায় এখন সে কথা ভুলে গেছে। তমালের তীক্ষ্ণ ডাকে কড়কড়ে ইস্ত্রির শাদা জামায় আসিন্দির একটা দোকানের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে এমনভাবে রাস্তার মাঝখানে তমালের কাছে দাঁড়ায়, যেন চোর ধরা পড়ে। 'হোয়াট ইজ দিস? এখনো আপনার একটা প্রসেসন এসে পৌছল না, আর আপনি বললেন ওয়ান ট্রাক উইল নট বি এনাফ?'

'আসোছে, আসোছে, কনেক দেখেন, সগায় আসিবে। হে-আষাঢ়, যা ত যা ত, সগাক কহি আয় ত ঝট করি চলি আসিবার, যা, সাইকেল ধরি যা'—একটা সাইকেল জোগাড় করতে আসিন্দির তমালের কাছ থেকে সরে যেতে পারে।

তখনই দেখা যায় চ্যাঙড়াভাড়ার দিক থেকে কয়েকজন লোক আসছে, জনা দশবার হবে। সামনের দুজনের পরনে লুঙি—অনেকের মাথাতেই শাদা টুপি। একটা বাচ্চা ছেলের হাতে একটা কাঠির ভেতর কংগ্রেসের ঝাণ্ডা। বাচ্চাটার গায়ে একটা ফুলহাতা শার্ট। ফলে, দেখায় যেন ঈদের দিন, মুসলমানরা নমাজে যাচ্ছে।

সমস্ত দলটা কানু মাস্টারের ট্রাকের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এসেছে কংগ্রেসের মিছিলে, দেখছে লালঝাণ্ডার ট্রাক। দাঁড়িয়ে পড়ার পর বাচ্চাটার

boiRboi.net

হাতের কাঠিটা একদিকে কাত হয়ে যায় আর তার মাথার ছোট্ট নিশানটা ঝুলে পড়ে। বটতলায় বুড়োমত একজন বাহেবাবুকে গিয়ে ধীরে-ধীরে কিছু বলতেই, বাহেবাবু খুব দ্রুত রাস্তার মাঝখানে চলে আসেন, একবার একটু নজর করে দেখেন, তারপর খুব তাড়াতাড়ি সেই লোকগুলোর দিকে হাঁটা শুরু করেন। বাহেবাবুর শরীর দেখে বোঝা যায় না তিনি এত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন, কিন্তু এখন, যখন তিনি ধুতিটা এক হাতে টেনে ধরেছেন—তাঁর এককালের খেলোয়াড়ি পায়ের বাটির পেশি চমকায়। কিন্তু বাহেবাবুর আগে তমাল দাঁড়িয়েছিল, একেবারে রাস্তার মাঝখানে। সেও দেখছিল লোকগুলো এসে ট্রাকটার সামনে দাঁড়াল। ঝাণ্ডাটা সে অত লক্ষ করে নি। কিন্তু জুতোর দ্রুত ঠক ঠক শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে বাহেবাবুকে আসতে দেখে লোকগুলোর কাছে আগে পৌছবার জন্য সে দৌড়তে শুরু করলে, বাহেবাবু থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ওঠেন, 'হেই নেংগু, দেখ ত', বলেই তিনি আরো তাড়াতাড়ি হাঁটেন। নেংগু সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে সমস্ত কাপড়টা হাঁটুর ওপর তুলে ধরে 'হে-ই কি-ত্-কিত্ কিত্-কিত্' বলে দৌড়তে শুরু করে। রাস্তার দু-পাশের লোকজন হাততালি দিয়ে ওঠে। হাততালির আওয়াজে তমাল ঘাড় ঘোরাতেই দেখে নেংগু ছুটে আসছে, নেংগুর সারা মুখে হাসি, সামনের দাঁতগুলো বড়-বড়—মনে হয় তমালকে ঠাট্টা করছে। ব্যাপারটা বোঝার আগেই নেংগু তমালকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় ও যাওয়ার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে তমালের দিকে সেই মোটা-মোটা দাঁতে ভেংচি কেটে যায় যেন। তমাল কয়েক পা দৌড়লে মনে হয় যে আসলে নেংগু আর তমালের মধ্যে দৌড় হচ্ছে, কে ফার্স্ট হবে। তমাল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারে নেংগুর সঙ্গে দৌড়নো তাকে মানায় না। সে দৌড় থামিয়ে, লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যেতে-যেতে চিৎকার করে ওঠে, 'ইউ স্টপ, আই সে ইউ স্টপ, দে আর আওয়ার মেন, হু আর ইউ?' চিৎকারটা বটতলি পর্যন্ত শোনা যায়। কে আগে ঐ দলটার কাছে পৌছতে পারে দেখার জন্য বটতলির দুদিকের সব দোকান থেকে, মাঠ থেকে, সবাই বেরিয়ে এসে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তাদের পেছনে একটা ট্যাকসি এসে দাঁড়িয়ে সমানে হর্ন দেয়, কেউ রাস্তা দেয় না। বাহেবাবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটেন, তাঁর জুতোর খট খট আওয়াজ, মুখময় মোটা-মোটা ভাঁজ, ভুরুদুটো কোঁচকানো। যারা বাহেবাবুকে দেখে ভয় পেতে চায়, তারা বাহেবাবুর এই চেহারাটা দেখলে ভয় পেত।

দলটার কাছে পৌছেই নেংগু দুই হাত দুদিকে ছড়িয়ে দাঁড়ায়, তমালকে

ঠেকাতে, আর চিৎকার করে বলে, 'বাহেবা, তাড়াতাড়ি আসেন কেনে।'

কিন্তু নেংগুর পিছনে আগে তমাল এসে পড়ে আর চিৎকার করে ওঠে, 'ডোণ্ট গো উইথ হিম, উই আর দি কংগ্রেস, আমরাই আসল কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস।' তমাল যাতে কিছুতেই দলটার মুখোমুখি হতে না পারে, সেইজন্য নেংগু দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে নিজের শরীরটা দিয়ে তমালকে আড়াল করতে থাকে, ফলে ঐ দশ-বারজনের দলটা জমাট বেঁধে যায়, ঝাণ্ডা হাতে বাচ্চাটা গিয়ে পড়ে নেংগুর কোমরের কাছে। নেংগু ঘাড় ঘুরিয়ে তমালকে হঠাৎ খিঁচিয়ে ওঠে, 'সরি যান এইঠে', আর তমাল শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে পেছন থেকে চিৎকার করে ওঠে 'ইউ স্টপ', তারপরই কেশে ফেলে। সেই সময়েই বাহেবাবু পৌঁছে যান। তাঁকে দেখেই সেই দলটার ভেতর থেকে একজন বলে ওঠে, 'আদাব বাবু, হামরালা ত আপনাকে খুঁজিবার ধইচছি, আর এ্যালায় নেংগু আসি কহিসে উমরায় আপনার মানষি। আর এই বাবুটা আসি কহিছে, ইমরায় কংগ্রেস। আর এই ট্রাকটা ত দেখিছু লালঝাণ্ডা।'

'ও কিছু না। আজ ওদেরও মিছিল আছে। তোমরা এসো। নেংগু ওদের নিয়ে এসো'—বলেই বাহেবাবু পেছন ফিরে বটতলার দিকে দ্রুত ফিরতে শুরু করেন। এখনো তিনি আগের মতই তাড়াতাড়ি হাঁটেন কিন্তু মুখে বা ভুরুতে কোনো ভাঁজ নেই, বরং যেন একটু দুলে-দুলেই হাঁটেন।

নেংগু দলটাকে নিয়ে রওনা হতে-হতে, 'ক্যানং, হামার কথাটা বিশ্বাস না যাও? এ্যালায় দেখেন হামার ঘর হছে আসল কংগ্রেসের ঘর, বাহেবাবুর দল, আর ইমরায় কংগ্রেসটার ভিতর তারা-হাতুড়ির ঘর', বলে, তমালের দিকে স্পষ্ট আঙুল দেখিয়ে দেয়। সমস্ত দলটাকে ঠেকাবার জন্য তমাল লাফিয়ে নেংগুর সামনে এসে দাঁড়ায় আর নেংগুর ওপর ফেটে পড়ে 'ইউ স্টপ, ইউ লায়ার, ইউ চিটস, ডোণ্ট গো উইথ দেম, আপনারা এর সঙ্গে যাবেন না, এরা কংগ্রেস না—'

তমাল এমনভাবে পথ আটকে দাঁড়ায় যে দলটাকে নিয়ে থেমে যাওয়া ছাড়া নেংগুর কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু নেংগু থামে না। সে হঠাৎ খুব জোরে লম্বা নিশ্বাস টানতে শুরু করে, সেই টানে তার মাথা পেছনে হেলে যায়, কাঁধ উঁচু হয়ে যায়, গলার রগগুলো মোটা হয়ে ফুলে ওঠে, চোখ গোল হয়ে যায় আর তাতে দেখতে-দেখতে লালরঙের ছিটে লাগে, তার বুকটা ফুলে ওঠে। সেইভাবে সে দৃঢ় পা ফেলে এগিয়ে যায়। তমাল যখন বোঝে সে পেছিয়ে না-গেলে নেংগু তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে, তখন সে বাধ্য হয়েই দু-পা পিছু হঠে, 'আপনারা জানেন

না, এরা আপনাদের মিথ্যা কথা বলে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দে আর নট ইন্দিরা গান্ধীজ মেন', তমাল চিৎকার করে নেংগুর সামনে আঙুল নেড়ে বলে যায় আর এক-পা করে পেছন দিকে হাঁটে আর নেংগু সেইভাবে ঘাড় হেলিয়ে, কাঁধ উঁচিয়ে, বুক চিতিয়ে, এক-পা এক পা করে এগয়, যেন তমালকে নেংগু ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আর তমাল চিৎকার করে যায়, 'প্লিজ ডোণ্ট গো উইথ দেম, দে আর নট কংগ্রেস, দে ড্রাউণ্ড দি ওল্ড কংগ্রেস, এখন ইন্দিরা গান্ধীকে ডোবাচ্ছে', আর নেংগুর পেছনে সমস্ত দলটা দলা পাকিয়ে হাঁটে, সেই বাচ্চা ছেলেটার হাতের কাঠিটা আবার সোজা। কানু মাস্টারদের ট্রাকের ভেতর দুটো বাচ্চা ছেলে ব্যাপারটা দেখতে যেই দাঁড়ায়, কানু মাস্টার তাদের ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়।

বটতলি থেকে আসিন্দির দৌড়ে এসে তমালের কানে-কানে কথা বলে তমালকে হাত ধরে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে, আর নেংগু এমনভাবে চলতেই থাকে যেন তার সামনে কখনোই তমাল ছিল না। তমাল আসিন্দিরের ওপর ফেটে পড়ে, 'বাট হু ইজ হি?'

আসিন্দির বলে, 'অ্যাঁ?'

'ঐ লোকটা কে?'

'আরে ঐটা ত নেংগু', আসিন্দির হেসে ফেলে, 'ঐটা ত পাগলা, হামার ছোট শালা। আসিল তো হামার নথত আর এ্যালায় হুছে বাহেবাবুর ঘর। ফিরিবার তানে হবে তারা-হাতুড়ির ঘর।'

তমাল আপন মনে বলে ওঠে, 'রাসকেল', তারপর আসিন্দিরকে জিজ্ঞাসা করে, 'কিন্তু তোমার লোকজন কই, আমি কি শেষে ফাঁকা গাড়ি নিয়ে শহরে ফিরব?' তমাল ভুলে যায়, আসিন্দিরকে সে আপনি বলত। আসিন্দির আঙুল তুলে দেখায়, পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো ট্রাকের একটাতে কিছু লোক বসে আছে।

পাশাপাশি দাঁড়ানো দুটো ট্রাকের ভেতর যেটাতে কিছু লোক বসে আছে, সেটার কাছে নেংগু দলটাকে নিয়ে দাঁড়ায়। ঝাণ্ডাধরা ছোট ছেলেটিকে দুহাতে ট্রাকের ওপর তুলে দিতে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে তমাল চিৎকার করে ওঠে, 'ইউ স্টপ।' আর বাহেবাবু পাশে এসে বলেন, 'নেংগু দাঁড়াও, ঐটা আমাদের গাড়ি। ছেলেটিকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নেংগু বলে, 'দুইখানা গাড়ি পাশাপাশি খাড়া করি রাখিছেন, ক্যানং করি বুঝিম কোনটা কার?'

'দাঁড়াও, তাহলে গাড়িটা সরিয়ে নিক,' বাহেবাবু ড্রাইভারকে বলেন,

গাড়িটা ব্রিজের দিকে সরিয়ে নিতে।

'সরালে কী হবে? এক ঝাণ্ডা, এক ফেস্টুন, এক গান্ধী, কেনং করি মানষি বুঝিবে কুনটা আসল, কুনটা নকল? আলগ (আলাদা) যখন হইসেন, আলগ একখান চিহ্ন লাগান কেনে'—নেংগু বলে ওঠে।

নানা রকম শব্দ করে-করে ট্রাকটা যখন ব্রিজের দিকে সরে-সরে যায়, মুখটা ঘোরায়, তখন বাহেবাবু, যে-দলটা এল তাদের কাছে গিয়ে, জিজ্ঞাসা করেন, 'জমিরুদ্দি, তোমরা ত এলে, তোমাদের হালুয়ার ঘর?'

'মোর আধিয়ারের ঘরক ত মিছিল ধরি আসিবার কইচছি, উমরায় আসিবার ধরিছে, আর ধরেন কেনে পদ্মনাথের হালুয়ারা ত আসিবে।'

'পদ্মনাথের জোয়াইটা ত ঐ পাথে গিসে', বাহেবাবু।

'আঃ বাবু, জোয়াইগেলেই কি আর শ্বশুর যাবা ধরে? পদ্মনাথ আপনারঠেই থাকিবে। তবে পদ্মনাথের জোয়াইটার বুদ্ধি আছে খুব।'

'কী রকম?'

'ঐ আসিন্দির-জোয়াইটা ত সব বুদ্ধি দিয়া-দিয়া পদ্মনাথের তামান্ জমি নিজ চাষত আনি ফেলাসে। কুনো জমিত আর কায়ও আধিয়ার নাই। এ্যালায় ত পদ্মনাথরঠে নগদকাম নগদদাম, মজুরি হিশাবে খাটনি, কুনু ভাগাও নাই, ধারও নাই। এ্যালায় ত উমরায় ভাগাভাগি করি শ্বশুর আসিছে আপনারঠে, আর জোয়াইটা গিসে ঐঠে।'

'ঝবরুর হালুয়ারা আসিবে না?'

'উমরায় ত পার্টি ধরিসে বাবু, আসিবে না।'

কিছু-কিছু সুর একা-একা গাইবার, দুজন-দশজন মিলে সে-সুর গাওয়া যায় না, তেমনি কিছু-কিছু সুর সকলে মিলে গাইবার, একা-একা সে-সুর তুললে নির্জনতা বেড়ে যায়। ধান-ভুখাবার গান যদি কেউ একা-একা গায়, তাহলে সেখানে নিশ্চিত দুর্ভিক্ষ। তেমনি সমবেত উল্লাসের সুরকে একক কান্নার সুরে বদলে নিয়ে যেন কোনো গান হচ্ছে, এমনি একটা রব শোনা যায়। যারা কথাবার্তা আলাপে ব্যস্ত তারা শুনতেই পায় না, যারা শুনতে পায় তারা খেয়াল করে না। সাতখামারের রাস্তা দিয়ে তেমনি সুর তুলে একটা ভিড়ের দল বটতলিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোমরের কাছে একটু ত্যানা বা গামছা ছাড়া আটদশজন সম্পূর্ণ ন্যাংটো কালো কুচকুচে মানুষের সেই দলাটার মানুষগুলোকে আলাদা চেনা যায় না, কারণ তারা লাইনে নেই, কারণ তাদের বুকের ওপর মাথাটা ঝুলে আছে, নেশাতুরের মত। মাঝখানে কারো হাতে একটা ছোট সরু

লাঠির ডগায় একটা ছোট তেরঙা ঝাণ্ডা। লাঙলধরা মুঠো ঐটুকু একটা কাঠিতে কব্জা পায় না, তাই ঝাণ্ডাটা নেতিয়ে। এই ভিড়ের দলাটা, আলগা মুঠো-পাকানো হাত বুক পর্যন্ত তুলে নিজেদের মনেই বলে যায়, 'জিন্দাবাদ মাতরম, জিন্দাবাদ, মাতরম।' এদের একজনের মোটা-মোটা ফাটা পায়ে একটা হাওয়াই স্যাণ্ডেল, ফিতে একটা সেফটিপিন দিয়ে লাগানো। লোকটির পা কিছুতেই স্যাণ্ডেলের ভেতর থাকে না। আঙুলগুলো থাকে আর পায়ের বাকিটা বেঁকে মাটিতে বেরিয়ে যায়। নামকীর্তনের দল যেমন মাঝখানে মঞ্চটিকে রেখে চারপাশ থেকে চাপ বেঁধে ঘিরে দাঁড়ায়, তারপর সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির চণ্ডে হরে রাম, হরে কৃষ্ণ গেয়ে যায় বা ফাগুয়ার সময় যেমন বিহারী শ্রমিকদের কোনো দল মাঝখানের ঢোল-করতাল-অলাকে ঘিরে চারপাশে ভিড় করে নেশাগ্রস্থ গান গেয়ে যায়—এই দলটার ভেতর সেই কেন্দ্রমুখী টানটা ছিল, নেশাটা ছিল না। তবু-পরি প্রায় সবারই জোয়ান বয়স।

তমাল দলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে, 'দাঁড়াও।' দলটা দাঁড়িয়ে পড়ে কিন্তু গুন গুন শ্লোগান তুলে যায়। তমাল বলে, 'আসিন্দির, ওদের ট্রাকে তুলে দাও।'

আসিন্দির দলটা দেখে বলে, 'ইমরা হামার শ্বশুরের হালুয়ার ঘর, মুই না পারিম।'

'হালুয়ার ঘর ত হয়েছে কী? আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।' দলটা যেন তমালের সঙ্গে লেগে যায় আর সেইভাবে গড়িয়ে-গড়িয়ে তমালদের ট্রাকের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

'আপনারা ট্রাকে উঠুন' বলে তমাল দাঁড়ায়। কিন্তু লোকগুলো গুনগুন স্বরে শ্লোগান দিয়েই যায়, যেন তমালের কথাটার মানেই বোঝে নি। মানে বোঝাবার জন্য তমাল ওদের কারো একজোড়া চোখ খোঁজে। কিন্তু সমস্ত চোখের পাতা নোয়ানো। কথাটা বলার জন্য তমাল একটা মুখ পায় না, সবগুলো মুখ বুকের ওপর ঝোলা। দূর থেকে নেংগুর হঠাৎ গলা শোনা যায়, 'আরে রে-রে-রে, হে-বুধারু! আরে বাহেদা, হামরার হালুয়ার ঘরক্ উমরায় তুরুক পার্টি টানি নিগিছে।'

'তোমার হালুয়ার ঘর হয় ত ডেকে নিয়ে এসো।'

নেংগু লাফিয়ে এই ভিড়ের দলাটার কাছে আসে, 'হে-এ বুধারু, এইঠে কী, ঐঠে চল, ঐঠে মোর গাড়ি।'

তমাল যেন খানিকটা বেঁচে যায়, তাকে আর এই ভিড়ের দলাটাকে কিছু

boiRboi.net

বোঝাতে হবে না। ফলে সে নেংগুর ওপর ফেটে পড়তে পারে, 'ইউ স্টপ, দে আর আওয়ার মেন।'

'আরে কী ফটর ফটর করিসেন, ইমরালা হামার হালুয়ার ঘর'—নেংগু খেপে যায়।

'হালুয়ার ঘর মানে কি আপনার প্রজা?'

'প্রজাই ত।'

'হোয়াট? এদের নিজস্ব অপিনিয়ন নেই? ডিমোক্রেটিক রাইট নেই? আপনার হালুয়া হলেই আপনার প্রসেশনে যাবে।'

'আরে ই মানষিডা কেনং কথা কহার ধরে? হামার হালুয়ার ঘর হামার মিছিল তুলিবে না কি আপনার মিছিল তুলিবে?' নেংগু চিৎকার করে ওঠে।

আর তমাল তাকে ধমকে ওঠে, 'ইউ শাট আপ।'

নেংগু পাল্টা ধমকে ওঠে, 'চুপ যা গাবুর আড়ি, ডেকুয়া আড়ি' (পোয়াতি বিধবা, ছেনাল বিধবা)। চারপাশে হাসির রোল ওঠে আর তমাল আচমকা থেমে যায়। সে বোঝে নেংগু তাকে গাল দিল, কিন্তু মানে বুঝতে পারে না। পেছন থেকে বাহেবাবু সস্নেহে ডাকেন, 'নেংগু-হে, এত্তি আয়।' মোটা লম্বা দাঁত বের করে হাসতে-হাসতে নেংগু রাস্তায় উঠে আসে। হাসির ফলে সারা মুখে তার কুঞ্চন, 'ঝগড়া করিস কেন পাগলা। তোর ঘরের হালুয়া আর যাবে কোথায়? তোর দাদাক্ আসিবার দে।'

'আসুক দাদা,' নেংগু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'কিন্তুক্ ইটা আপনার ঠিক হয় নাই। ইটা ক্যানং করিসেন? উমরারও কংগ্রেসি ঝাণ্ডা, আপনারও কংগ্রেসি ঝাণ্ডা, উমরারও ইন্দিরা গান্ধী, আপনারও ইন্দিরা গান্ধী, উমরাও যা ধরি-ধরি চেঁচাছে, হামরালাও ঐ ধরি-ধরি চেঁচাছি। ই হবা না হয়।'

বাহেবাবু পরম স্নেহে বলেন, 'করিবার চাহিস কী?'

'একোটা আলগ্ চিন্হ্ নাগাবার নাগিবে।'

'ত নাগা-না কেনে, এ্যালায় ত তুই-ই লিডার নেংগু, তুই আলগ্ একখান চিন্হ্ তুলি দে।'

'আচ্ছা আচ্ছা,খুঁজিবার ধইরছু।'

নেংগু লাফিয়ে আর-একদিকে চলে যায়।

ট্রাকের কাছের সেই ভিড়ের দলাটা দাঁড়িয়ে আছে। তমাল সরে গেছে। সেই ভিড়ের দলাটা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, পিঠ ঝুঁকিয়ে মাথা নুইয়ে, আপনমনে গুন গুন করেই যাচ্ছে। তাদের মাঝখানে ধরে থাকা সেই ঝাণ্ডাটা কোথায়

boiRboi.net

তলিয়ে গেছে। এখন শুধু দেখা যায় কুচকুচে কাল বিস্তারিত পিঠের ঝুলুনি, পেশিগুলোর চমকে-চমকে ওঠা।

আর মিছিলের পর মিছিল আসে। মিছিল। দুজনের, পাঁচজনের, দশ জনের, বিশ জনের। যত-জনেরই হোক, যত ছোটই হোক, এতটা রাস্তা পেরিয়ে একটা মিছিল এসে পৌছলে বটতলির সবার ভেতরই সাড়া পড়ে যায়। ফলে সারাটা বটতলিতে যেন মেলা-মেলা ভাব এসে যায়। পরনের জামা আর ধুতিই ত উৎসবের অর্ধেক। অধিকাংশই পান খেয়ে এসেছে। জামাকাপড়ে যাতে না লাগে, সেজন্য গলা বাড়িয়ে পিক ফেলছে। বিড়ি চলছে, সিগারেটও দিব্বি চলছে। বেঞ্চিতে, চায়ের দোকানে, মুদির দোকানে, বাঁশের মাচায়, বটতলায় সিমেন্টের চাঙারে লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। রাস্তার পাশে, মাঠে, লোকজন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে। শহর থেকে আসা বড় নেতাদের ভেতর বাহেবাবু দাঁড়িয়ে, পুবে, পাঙ্গার ব্রিজের কাছে। আর, গোপাল কুণ্ডু দাঁড়িয়ে পশ্চিমে তার গাড়ির পাশে। এঁরা বেশি ছোটাছুটি করছেন না। কিন্তু তাঁদের মুখচোখও উত্তেজনায় জলজল করে। অনামিকা আর মধ্যমার মাঝখানে, গোড়ায়, সিগারেট লাগিয়ে তমাল কল্কে টানার মত লম্বা টান দেয়, আর শ্লোগান শুনলেই সেদিকে ছুটে যায়, আর যদি দেখে অন্যদলের মিছিল, তাহলেই একটা ইংরেজি বলে চলে আসে। কার গাড়িতে কত লোক হল, সে-নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা ত আছেই, কোন দলের গাড়ি আলগা ভরানো হচ্ছে, সে-সব দিকেও সবার নজর আছে, তিনটি গাড়িই প্রায় সমান-সমান ভরেছে, কিন্তু এখন সেই দলগত প্রতিযোগিতার চাইতে সামগ্রিক উৎসবটাই বড়। যে-দলেরই হোক, মিছিল আসে, যে-দলেরই হোক, মানুষ আসে। ঘর ছেড়ে মানুষের মিছিল করে বেরিয়ে আসার ভেতর যেন যুদ্ধজয়ের অনুষঙ্গ আছে। আর, এই মিছিলসাজা মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে, এখন প্রকৃতি। মাঠগুলোর আর গ্রামগুলোর আর গাছগাছালির আর ছোটখাটো নদীনালার আর ছোট-ছোট চিবি-টিলার ভেতর থেকে মানুষজন উঠে আসে, নেবে আসে। কার্তিকের পাকা ধানখেতের চোখ-ধাঁধানো হলদে আলোর ভেতরের আল বেয়ে টলেটলে—মাথার অনেক ওপরে আকাশে, একটা কঞ্চির মাথায়, ছোট্ট একটা ঝাণ্ডা বাতাসে দুলে যায়, দুলে যায়—ধুলোভরা কার্তিকের আহাঁটু ধুলো তুলে, মিছিল হেঁটে আসে, ক্রমেই ডাঙা জমির কোন সেই মাথা থেকে কয়েকটি মোটে মানুষ, উড়ন্ত খড়কুটো শুকনো পাতায় যেমন বাতাস, বাতাসের গতি, ঝাণ্ডার ছোট-ছোট টুকরোয় মিছিল, রাস্তাহীন-ধানহীন ব্রহ্মতলের রোদের কম্পমান আভায় প্রথমে দেখা যায় ঝাণ্ডা, যেন

ভোরের পাখি, তারপর দেখা যায় সেই ঝাণ্ডার নীচে মিছিলের মানুষেরা, যেন বিকেলের পাখিরা, সেই বরমতল বেয়ে মিছিলটা নামে, নেমে আসে, আকার নেয়, তাদের আওয়াজ কানে এসে বাজে, তারপর অত বড় আকাশ আর মাঠ-টাকে পেছনে ফেলে মিছিলটা এসে যায় অবধারিত, আকাশমাঠময় প্রকৃতি অবান্তর হয়ে যায়, গুটিকয় মানুষ সমস্ত পরিপ্রেক্ষিত মানবিক করে তোলে।

এই সমগ্রতার মধ্যেও গ্রামের শ্রেণীভাগ কাজ করে। যারা জমির মালিক ছোট-বড় যা-ই হোক, আধিয়ার রেখে চাষ করে বা বলদ বিছন দিয়ে নিজের এতটা আধিয়ারি করে যে বছরের খাওয়া হয়েও বাড়তি থাকে, তারা মিছিলের ভেতর আসে না, মিছিলের পাশে-পাশে আসে, সাইকেল ঠেলে বা পায়ে হেঁটে। যারা শুধুই আধিয়ারি করে, বলদবিছন সবই জোতদারের, নিজেদের হাল আর গতর, সারা বছরের একবেলা-আধবেলা খাওয়া জুটে যায়, কার্তিকের এই কটা দিন হয়ত উপবাস, কারো-কারো নিজের গরু-হালও আছে, তারা মিছিল সাজিয়ে আসে, যেমনভাবে নেতার ঘর বা গিরি (মালিক জোতদার) সাজিয়ে দেয়, তেমনিভাবে মিছিলটাকে নিয়ে আসে। আর যারা দিনহালুয়া (খেত-মজুর), কাজ থাকলে কাজ পায় আর পয়সা পায়, সারা বছর এখন এবেলা তখন ওবেলা খাওয়া জোটে, থাকার ভেতর আছে শুধু নিজেদের গতর, মিছিল সাজিয়ে দিলেও তারা মিছিলটাকে রাখতে পারে না, দলা পাকিয়ে ফেলে, লাইনে হাঁটতে গেলে এ ওর পায়ে ঠোকর খায়, এ ওর ঘাড়ের ওপর পড়ে, শ্লোগান তুলে গেলে সবার সঙ্গে গলা মেলাতে পারে না, তারা একটা পিণ্ডের মত এসে মিছিলে মিশে যায়।

কিন্তু এই সব ভাগ-উপভাগ নিয়ে গ্রামের ছোট-ছোট মিছিলগুলো মিশে যখন শহরের বড় মিছিল হয়, তখন এই ভাগ-উপভাগ চেনা যায় না। তখন সেই বড় মিছিলে শ্লোগানগুলোই মিছিলটাকে আকার দেয়। শ্লোগানগুলোই মিছিলে চেহারা পায়। এই সব গ্রামের রাস্তা বেয়ে আসা এইসব হালুয়া হালুয়া, নিহাল হালুয়া, ঘরুয়া হালুয়া, নাঘরুয়া হালুয়া, হালুয়া আধিয়ার, নিহাল আধিয়ার, জমিয়া আধিয়ার, নাজমিয়া আধিয়ার, নিজচাষ জোতদার, ছোট-মাঝারি-বড় জোতদার নিজেদের ভাগ-উপভাগের বাইরে কোনো সমগ্রতাকে চেহারা দিতে যায় মিছিলে। না-কি সেটা আসলে সমতার মোড়কমাত্র? সেখানেও, সেই বড় মিছিলেও এই ভাগ-উপভাগ থেকে যায় কি, মিছিলের অন্তর্গত?

ফলে, চলতে-চলতে মিছিল কি আবার টুকরো-টুকরো হয়ে যায়? এক এই

মিছিলের বহু শির জেগে ওঠে, ফোঁসে, পরস্পরকে ছোবলায় ? অথবা মিছিলটা ক্রমেই নিজের চারপাশে ঘুরপাক খায়, ঘুরপাক খেতে-খেতে নিজের চারপাশে নিজেকে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে তুলে কুণ্ডলী পাকায়, তারপর সেই কুণ্ডলীর ভেতরে কোথাও পথ পেতে, বেরিয়ে আসতে, মিছিলের মাথা নিজেরই কুণ্ডলীতে মাথা ঠোকে ? কিন্তু তখন মিছিলের এই মানুষেরা কোথায় ?

সাতখামারের রাস্তা দিয়ে এসে, মোড়ে, বিশু সাইকেল থেকে নামে। সাইকেলটাকে চায়ের দোকানের ভেতর ঢুকিয়ে বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকায়। কমবয়েসি একজন, প্যান্টের ওপর ফুলশার্ট ঝোলানো, হাতা গোটানো, বিশুর কাছে গিয়ে বলে, 'আমরা স্টার্ট দিয়ে দি। ট্রাকগুলোর আগে স্টার্ট দেয়াই ভাল।' বিশু এমনভাবে সবদিকে দেখে, ঘাড় উঁচু করে,যেন কিছু খুঁজছে, সে ছেলেটির কথাই শুনতেই পায় না। শেষ পর্যন্ত পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে গলা আরো বাড়িয়ে ঐখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিশু ট্রাকগুলোর ভেতর দেখবার চেষ্টা করে। সেই ছেলেটিও বিশুর পাশে দাঁড়িয়ে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে গলা বাড়িয়ে খোঁজে, বিশু কী খুঁজছে না-জেনেই, ছেলেটিও খোঁজে। বিশু আপনমনে বলে, 'আরে, নাউয়াপাড়ার মিছিলটা গেল কোথায় ?'

এমন সময় কানু মাস্টারদের ট্রাকের ওপর থেকে একটি বাচ্চা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে এক হাত তুলে তীক্ষ্ণ গলায় 'হে-এ, বিশুদা-আ' চিৎকার করে উঠলে বিশু চমকে তাকায়, তারপর চেঁচিয়ে ওঠে, 'তোদের হুপাকে গিয়ে ট্রাকের ওপর উঠতে কে বলেছে। চলি আয় এত্তি।'

বিশুর পাশে দাঁড়ানো ছেলেটি দৌড়ে কানু মাস্টারের ট্রাকের কাছে চলে যায়। ততক্ষণে ট্রাকের ওপর থেকে টুকটুক লাফিয়ে কয়েকজন নেমে এসেছে। গোপাল কুণ্ডু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। যারা নামল তাদের দিয়ে সেই ছেলেটি একটা লাইন বানাচ্ছে দেখে গোপাল কুণ্ডু বলে 'আরে বাবা, নামিবার কী আছে, শহরত যাইয়াও ত আপনার পার্টি টার মিছিলে চলি যাবার পারতেন।'

সেই ছেলেটি গোপাল কুণ্ডুর দিকে খুব গরম চোখে তাকিয়ে লাইনটা নিয়ে বিশুর দিকে রওনা দেয়। গোপাল কুণ্ডু বলে, 'মাস্টার চলো, আমরা চলে যাই, তাহলে গাড়িটা অন্য কোথাও পাঠানো যাবে।'

'হ্যাঁ, চলেন।' ট্রাকের ওপরে কানু মাস্টারের সাইকেল। গোপাল কুণ্ডু গিয়ে ড্রাইভারের পাশে ওঠে। কানু মাস্টার দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করে, আর সেই শ্লোগানের শব্দের ভেতর ট্রাকটা স্টার্ট নেয়, গিয়ারের শব্দ তুলে রাস্তায়

boiRboi.net

ওঠে, একবার পেছিয়ে একবার এগিয়ে মুখটা জলপাইগুড়ি শহরের দিকে ঘোরায়. ক্লিনার ছোকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ট্রাকের পাশে ছুটতে-ছুটতে ট্রাকের দরজায় চড় মেরে-মেরে রাস্তা পরিষ্কার করে, ট্রাকটা ধীরে-ধীরে বটতলা পর্যন্ত আসে, গতি একটু বাড়াতেই ক্লিনার ছেলেটি দরজা ধরে দৌড়ে টুক করে পাদানিতে উঠে পড়ে, ক্রমোচ্চ শব্দে, গতিতে আর ক্রমনিম্ন শ্লোগানে ট্রাকটা পাঙ্গার ব্রিজের ওপর উঠতে থাকে, ওঠে। পাঙ্গার ব্রিজ থেকে নেমে গেলে খানিকটা কালো ধোঁয়া ব্রিজের ওপর লেগে থাকে।

সেই ছেলেটি বিশুর কাছে এসে বলে, 'নিশ্চয়ই আমাদের আরো লোকজন ট্রাকের ভেতর ছিল, তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।' পাঙ্গার ব্রিজটার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে বিশু সেই আশঙ্কাটি যাচাই করে। কানু মাস্টারদের ট্রাকটা শ্লোগান তুলে চলে গেলে বটতলিতে হঠাৎ নির্জনতা নামে। কোথা থেকে কেউ একজন একা গলায় চিৎকার করে ওঠে—'ই-ন্-কি-লা-ব।' কেউ সাড়া দেয় না।

সাতখামারের রাস্তা দিয়ে এসে মোড়ে দাঁড়িয়ে পদ্মনাথ রায় দুদিকে তাকায়। বেঁটেখাটো ফরশা রঙের মানুষ, আধময়লা শাদা শার্ট আর ধুতি পরনে, পায়ে বেগনি রঙের ক্যানভাসের জুতো, মোটা সোল। তেলেজলে কাঁচাপাকা চুল চকচক করছে। নাকের ওপর দুই ভুরুর মাঝখানে দুটো গভীর রেখা। হাতদুটো পেছনে দিয়ে হাঁটে বা দাঁড়ায়। পদ্মনাথ আসায় নৈঃশব্দ্যটা যেন আরো বেড়ে যায়। চায়ের বা মুদির দোকানে বাইরে যারা বসেছিল তারা উঠে দাঁড়ায়। বিশু একবার তাকিয়ে একটু সরে যায়। বাহেবাবু রাস্তার উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসেন, পদ্মনাথই আগে নমস্কার করে। বাহেবাবুর সঙ্গে পাঙ্গার ব্রিজের দিকে হাঁটতে-হাঁটতে পদ্মনাথ বলে, 'তাহলে আপনারা মিছিল ধরি আসেন, আমি বাসে করি চলি যাই?'

'না, না, আপনি আর আমি ট্রাকের সামনে বসে যাব. আপনি সঙ্গে না থাকলে হয় নাকি?'

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলিছেন। তা আমার লোকগিলা সব মিছিল ধরি আসিছে ত? ঝাণ্ডাথান নিয়া আসিছে ত?' পদ্মনাথ রাজবংশী ভাষায় বাহেবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চায় না, ফলে তার ভাষাটায় রাজবংশী উচ্চারণের সঙ্গে চলতি বাংলা মিশে যায়।

বাহেবাবু বলেন, 'দেখি। দাঁড়ান নেংগুকে ডাকি।'

পদ্মনাথ বোঝে একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে,

boiRboi.net

'কেনে উমরায় আপনার সঙ্গে দেখা করে নাই ?'

ততক্ষণে নেংগু এসে দাঁড়ায়, পদ্মনাথকে জিজ্ঞাসা করে, 'হে-এ, দাদা, তোমরা বুধারুক্ পাঠাইসেন ?'

'হ্যাঁ, পাঠাইছি, উমরা কোটে গেইল ?'

'উমরায় ত ঐ ট্রাকের নগত খাড়াইয়া আছে।'

'উটা কার ট্রাক ?'

'ক'গ্রেসের তুরুক পার্টির।'

'তুরুক পার্টি মানে বাহেবাবুর কংগ্রেস না হয় ?'

বাহেবাবু মাথা নেড়ে বলেন, 'না।'

সঙ্গে-সঙ্গে পদ্মনাথ হাতদুটো পেছন থেকে পাশে এনে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ঘাড়টা সোজা হয়ে যায়। তাতে সন্দেহ হয়, আসলে তার স্বভাবের প্রবণতা দ্রুত চলাফেরা করার, ধীরতাটা আরোপিত। এই তল্লাটের সবচেয়ে বড় জোতদারদের একজন অথচ সবচেয়ে সৎ জোতদার হিশেবে তার নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গতি রেখেই পদ্মনাথ একটু ধীর, স্থির ও গম্ভীর। জমি-আইন পাশ হওয়ার পর সে এক-চিলতে জমি বেনামি করে নি বা লুকোয় নি। যদিও তাদের চার ভাই আর তাদের ছেলে-মেয়ে-জোয়াইদের ভেতর জমি আগেই ভাগ করা ছিল, তবু সবচেয়ে বেশি পরিমাণ জমি তারই ভেস্ট হয়েছে, বাহাদুর অঞ্চলে। সেইজন্য সমস্ত দলের ভেতরই তার একটা নৈতিক প্রতিষ্ঠা আছে। সেই নৈতিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মানকে সে সযত্নে রক্ষা করে। রক্ষা করার একটি সহজ উপায় হচ্ছে, সব কিছুতে থাকা, আবার একটু দূরে-দূরে থাকা। পদ্মনাথ নেংগুর দিকে ঘাড় তুলে তাকিয়ে বলে, 'উমরাক্ ডাকি আন্।'

নেংগু প্রায় দৌড়ে তমালদের ট্রাকের কাছে চলে যায়। পাটকাঠির মাথায় মরা পাখির মত ঝাণ্ডাটিকে ঘিরে পিঠবেঁকা মাথা-নোয়ানো ভিড়ের পিণ্ডটাকে গিয়ে বলে, 'দাদা ডাকাছে।' আর সেই ভিড়ের পিণ্ডটা নোয়ানোমাথা ঠিক ততটুকু তোলে যাতে দেখা যায় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পদ্মনাথ আঙুল তুলে বাহেবাবুর ট্রাকের দিকে নির্দেশ দিচ্ছে। সঙ্গে-সঙ্গে ভিড়টা নড়ে ওঠে, গড়িয়ে-গড়িয়ে রাস্তায় ওঠে। নোয়ানো ঝোলা হাতগুলো আলগা মুঠো করা, একটা প্রবল মুষ্টিতে পাটকাঠির ঝাণ্ডা শ্লথ ধরা, যেন তারা ঘুমের ভেতর দিয়ে হাঁটে। গড়িয়ে যাওয়ার মত এ-ওর গায়ে গা, পায়ে পা লাগিয়ে ভিড়ের পিণ্ডটা পদ্মনাথকে ছাড়িয়ে বাহেবাবুর ট্রাকের দিকে চলে যায়। শুধু তাদের পেশিবহুল পিঠগুলো নোয়ানো, কালো কুচকুচে, আর গতিমুখহীন রোমশ পেশল পাগুলি,

দেখা যায়, যেন কষ্টিপাথরের কোনো প্রাচীন দেবতা বহুপায়ে হেঁটে যায়, আপাতত বাহেবাবুর ট্রাকের দিকে।

পদ্মনাথের ভঙ্গি আবার শিথিল হয়। ঘাড়টা নরম হয়ে নেমে আসে, হাতদুটো পেছনে চলে যায়। বাহেবাবুর ট্রাকের দিকে হাঁটে। বেঁটেখাটো পাতলা শরীর বলে পদ্মনাথের ধীর পায়ে হাঁটার ভেতর ভঙ্গিটাই প্রবল হয়, ব্যক্তিত্ব তত ফোটে না। নেংগুকে বলে, 'এরা মুখ্যসুখ্য মানুষ, বুঝাবার নাগে, না হয় ত কী করি বুঝিবে, কোথায় যাবার হবে আর কোথায় যাবার হবে না।' তারপর বাহেবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমরাই বুঝি না পার্টি-ফার্টির কাথা। ঐ-সব নেংগু ভাল বুঝে।' ছোটভাইয়ের দিকে তাকালে নেংগু একগাল হাসে। দুহাত তুলে বলে, 'এ্যালায় একখান পার্টি ধরি আসিছেন, একখান ঝাণ্ডা, একখান ইন্দিরা গান্ধী আর ট্রাক দুইখান। ত হামার মানষি ত ঐঠে যাবা ধরিবেই। একোটা আলগ্ চিহ্ন দিবার নাগে।'

বাহেবাবু বলেন, 'তোমাকে ত বললাম একটা চিহ্ন লাগাতে।'

পদ্মনাথ বলে, 'হয়, হয়, একখান চিহ্ন ত দিবার নাগেই। দেখো নেংগু, চিহ্ন দেখো, ভাল একটা চিহ্ন দেখো।'

'হয় হয় মুই এ্যালায় একটা চিহ্ন লাগাছু', বলেই নেংগু লাফিয়ে বটতলার দিকে চলে যায়, একবার বাঁয়ে একবার ডাইনে ঘাড় দ্রুত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে চিহ্ন খুঁজতে-খুঁজতে। তার দিকে তাকিয়ে পদ্মনাথ বলে, 'পাগ্লা।'

নেংগুকে অত তাড়াতাড়ি হেঁটে বটতলার দিকে আসতে দেখে পাশের মাঠ বা মাচান থেকে কেউ একজন বলে ওঠে, 'হেই নেংগু, একখান শ্লোগান ধরেন কেনে।'

তার দিকে না-তাকিয়ে ডান হাত মাথার ওপর সরল তুলে আঙুলগুলো ঝাঁকিয়ে নেংগু বলে, 'এ্যালায় আগত একটা আলগ্ চিহ্ন দাও কেনে, পাছত্ শ্লোগান শোনাবু'—নেংগুর কাপড় তখন হাঁটুর ওপর বাঁহাতের মুঠোয়।

'করিবু কী, চিহ্ন দিয়া?'

'ঐ তুরুক তারা-হাতুরির কংগ্রেসঠে হামার গাড়িটা আলগ্ করিবার নাগে হে। নয়ত সব গোলমাল হয়া যাছে।'

'বাহেবাবুটাক দেখি বুঝিবার পাছে না কুনটা সরকারি কংগ্রেস?'

নেংগু দাঁড়িয়ে পড়ে যেদিক থেকে কথাটা আসে সেই দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে, 'তা, বাহেদাদাক কি বাঁশের আগাত তুলি দিয়া সাইনবোর্ড টাঙাম?' নেংগু আবার হাঁটতে শুরু করে।

পেছন থেকে চিৎকার করে কেউ বলে, 'বাঁশত্ হবা না হয় রে, ভাঙি যাবে। শূল লাগিবে, শূল—।'

নেংগু দাঁড়িয়ে পড়ে, হঠাৎ। সে দেখে, সাতথামারের রাস্তাটার পাশে গাছতলায় গরুর দড়িটা ধরে শোয়ানো লাঙলের ওপর চ্যারকেটু বসে আর গরুটা ঘাস খেতে-খেতে পাশের শুকনো নালীর ভেতর। নেংগু এই সম্পূর্ণ বিষয়টা দেখে নিয়ে দুই হাত ওপরে তুলে 'পাছি পাছি' বলে চিৎকার করে উঠে, ঘুরে যায়, আবার 'পাছি পাছি' বলে চিৎকার করে উঠে ঘুরে আসে। তারপর কাপড়টা বাঁ হাতে তুলে ধরে দৌড়ে চ্যারকেটুর হাত থেকে গরুর দড়িটা টেনে নিয়ে দুই হাত মাথার ওপর তুলে, একহাতে দড়ি, স্লোগান দিয়ে ওঠে, 'যেইঠে গাই, সেইঠে যাই।'

তার হাত থেকে দড়ি কেড়ে নিয়ে নেংগু রাস্তায় চেঁচাতে শুরু করলেও চ্যারকেটু তার লাঙলের ওপর বসেই থাকে, শুধু কুঁজো থেকে সোজা হয়ে যায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে নেংগু দড়ি ধরে গরুটাকে টানতে শুরু করলে চ্যারকেটু তার কাছে ছুটে যায়, 'হে-এ ছোটখুড়া, কী করিসেন, হে-এ ছোটখুড়া—।' দড়ির আচমকা টানে গরুটার গলায় নালীর কিনারে ঘষা লেগে যায় আর কিনারার ওপরে গলাটা উঠে আসে। নেংগু বাঁ হাত দিয়ে চ্যারকেটুকে ঠেলে দিয়ে বকে, 'চল কেনে, তোর গরু আর তুই হামার ট্রাকত্ উঠি চিহ্ন দিবি, সরকারি কংগ্রেসের চিহ্ন আলগ্ চিহ্ন, যা গরুটাক্ ঠেল কেনে—।'

চ্যারকেটু দুই হাতে নেংগুর দড়িধরা হাত চেপে ধরে, 'হে-এ ছোটখুড়া, হামাক ছাড়ি দেও কেনে, হে-এ-ছোটখুড়া, হামাক গৌরীহাটত্ যাবা নাগে, হে-এ ছোটখুড়া, হামাক গরুটা বেচা নাগে, হে-এ ছোটখুড়া, হামাক ছাড়ি দেও কেনে।'

'আরে, আরে, এই বোকা মানষিটার কাথা শোন্! হামরালার ট্রাক ত গৌরীহাট দিয়া যাবে, নাকি উড়ি যাবে? তক্ আর তোর গরুক্ নামি দিয়। এ্যালায় গরুটা ঠেল্।'

ইতিমধ্যে নেংগুর টানে গরুটার গলা নালীর কিনারে এতটা এগে যায় যে গরুটা ওপরে ওঠার জন্যে তাড়াতাড়ি নালীর পাড়ে পা দেয়, কিন্তু মাটি খসে যায়, পা হড়কে যায়, তখন আর-একটা পা দিয়ে আর-একটা গর্ত খুঁড়তে গিয়ে নেংগুর টানে গরুটা নালীর ভেতর পড়েই যায়। তারপর ছটফটিয়ে চার পায়ে মাটি ছিটিয়ে গরুটা উঠবার চেষ্টা করে। গরুর ছটফটানির শব্দে তাকিয়ে, 'আরে, আরে করিছেন কী, গরুটাক মারি ফেলাবেন নাকি', বলে চ্যারকেটু নালীর ভেতর

boiRboi.net

লাফিয়ে পড়ে, পেছন থেকে টেনে 'দড়ি ঢিলা দেন, দড়ি ঢিলা দেন', বলতে-বলতে গরুটাকে পায়ের ওপর দাঁড় করায়, গরুটা ফোঁস-ফোঁস করে ডাইনে বাঁয়ে নিশ্বাস ফেলে। চ্যারকেটু তার গা-টা ঝেড়ে দেয়। পেছনে, পায়ে গায়ে, ছোপছোপ মাটি লেগে গেছে। গরুটাকে পেছনে দু-চারবার আদরের চাঁটি দিয়ে, একটু ঠেললে নালী ধরে গরুটা এগয়। রাস্তায় ওঠার মত একটা ঢালু জায়গা পেলে গরুটাকে সেখানে দাঁড় করায়। তারপর গরুটার বিপরীত পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, যাতে ঐ ঢালু ধরে ওঠা ছাড়া গরুটার আর-উপায় থাকে না। পেটপিঠ হাতিয়ে আদর করে গরুটাকে পেছন থেকে একটু ঠেললে গরুটা ঐ ঢালুর ওপর সামনের বাঁ পা-টা দেয়। আর-একটু ঠেলতেই সামনের ডান পা-টা যেই এগিয়ে দিয়েছে, চ্যারকেটু নিজের শরীর দিয়ে গরুটাকে নালীর পাড়ের সঙ্গে চেপে ধরে, যাতে গড়িয়ে পড়ে না-যায়। চ্যারকেটুর শরীরের চাপ পেয়ে গরুটা যেন এই রকম ঢালু বেয়ে ওঠার শারীরিক অভ্যাসটা ফিরে পায়। তার সামনের ডান পা-টা একটু নরম জায়গায় পড়েছিল। সেটার ওপর চাপ দিয়ে, একদিকে চ্যারকেটু আর-একদিকে মাটির পাড়ের চাপ গলে সে পেছনের বাঁ পা-টা এগিয়ে আনতেই সামনের ডান পা-র তলা থেকে মাটি খসে যেতে থাকে, কিন্তু খসে যাওয়ার আগেই পেছনের ডান পা-টা তুলে সামনে ফেলে ও সামনের ডান পা-টাকে তুলে রাস্তার ওপর ফেলার মুহূর্তটিতেই চ্যারকেটু পেছন থেকে ধাক্কাটা দেয়, যাতে সে হুড়মুড় করে ওপরে উঠে যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়েই লেজ দিয়ে গা ঝাড়ে। এই নালীর ঢালু বেয়ে রাস্তার ওপরে গরুটাকে তুলে দেয়া ও গরুটার উঠে আসার ভেতর চ্যারকেটু ও গরুটার যৌথ অভিজ্ঞতা আর অভ্যাসের সুসঙ্গতি নালীর ওপরে চ্যারকেটুর উঠে আসা ও গরুটার পেছনে আবার আদরের চড় মারা পর্যন্ত সক্রিয় থাকে।

দড়িটা ধরে দুই হাত মাথার ওপর নিয়ে নেংগু চিৎকার করে ওঠে, 'যেইঠে গাই, সেইঠে যাই। গাই-বাছুরে ভোট দিন। এ্যালায় হামার গাড়ির চিহ্ন পাকা। যেইলা গাই-বাছুরের ঘর, সেইলা গাইয়ের ট্রাকে উঠো।'

নেংগু দড়ি ধরে গরুটাকে ট্রাকের দিকে টেনে নিয়ে যায় আর চ্যারকেটু ছুটে গিয়ে তার লাঙলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে এসে বলে, 'হে-এ ছোটখুড়া, তুমি দড়িটা ছাড় কেনে, মুই নিয়া যাছ, হে-এ ছোটখুড়া, মোক ছাড়ি দাও।'

নেংগু তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলে চ্যারকেটু গিয়ে গরুর গলার কাছের দড়িটা একহাতে ধরে, আর একটা হাত গরুর ঘাড়ে ফেলে রাখে, যাতে নেংগু জোরে টান দিলে, তার হাতে লাগে, গরুর গলায় না-লাগে। নেংগু

রাস্তার দুপাশে বিজয়ীর মত তাকাতে-তাকাতে গরুটাকে নিয়ে চলে। দুপাশ থেকে হাততালি ওঠে। সারা মুখে কুঞ্চিত মোটা সরু রেখার হাসি ফুটিয়ে নেংগু যেন অভিনন্দন নেয়। কেউ-একজন আওয়াজ দেয়, 'নেংগু, তুই বাছুর হয়া যা কেনে।'

নেংগু ঘাড় ঘুরিয়ে জবাব দেয়, 'তোর বহুসক, (বউকে) পাঠা, উমরার বলদ হম।'

আচমকা দড়ির টান, গলা ঘষে যাওয়া, পড়ে যাওয়া—এই আক্রমণের পর আবার চ্যারকেটুর অভ্যস্ত ছোঁয়া, তারপর এত চেঁচামেচি, গোলমাল, দুপাশে সারি-সারি মানুষ—গরুটাকে শরীর দিয়েই বুঝে ফেলতে হয়, সে-ই এ-সমস্ত কিছুর কেন্দ্র। তার শরীরটা যেন লম্বা হয়ে যায়, শিরদাঁড়া টান-টান হয়, শিংটা উঁচিয়ে সে দুলে-দুলে এমন হাঁটে যেন সে জানে তাকে কী করতে হবে। আর, চ্যারকেটু ভয় পায়, এই বুঝি গরুটা খেপি উঠিল্। সে গরুটার গলায় ঘাড়ে হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে গলাটা নরম করে আনে। আর যেদিকে চ্যারকেটু গরুটা সেইদিকেই ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে গলাটা দোলায়, নিজেই গলাটা ওঠানামা করিয়ে চলতে-চলতেই চ্যারকেটুর হাতে বা গায়ে ঘষে নিতে থাকে। চ্যারকেটু যেন গরুটাকে আশ্বস্ত করার জন্যেই গরুটার গা ঘেঁষে চলে। 'একে নেংগুখুড়া খেপি গিসে, তার উপর যদি গরুখান্ খেপি যায়, আর দেখিবার নাগিবে না।' ওরা ট্রাকের কাছে পৌছে যায়।

'আরে নেংগু, তুমি এখন এই গরুটাকে ট্রাকের ওপর তুলবে নাকি,' বাহেবাবু বলেন।

'আরে বাহেদাদা, এ একেবারে পাকা চিহ্ন। হামার ভোটের চিহ্ন গাইবাছুর আর ট্রাকের চিহ্ন গাইবাছুর'—নেংগু জবাব দেয়।

'আরে ছাড়ি দেন বাহেবাবু, চ্যাংড়া-প্যাংড়ার কাম'—বলে পদ্মনাথ বাহে-বাবুকে নিয়ে ট্রাক ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে যায়, যাতে তাকে এই গরু-তোলা ব্যাপারটা দেখতে না হয়।

নেংগু সেই হালুয়ার দলটাকে বলে, 'হে-এ বুধারু, এই গরুটাক তুলি দে।'

সেই দলটা সঙ্গে-সঙ্গে ট্রাক থেকে যেন গড়িয়ে-গড়িয়ে নামে। নেংগু গরুটার দড়ি নিয়ে লাফিয়ে ট্রাকের ওপর ওঠে যায়। অত ভিড়ে চ্যারকেটু গরু থেকে পেছিয়ে পড়ে। তার ওপর, তার কাঁধে লাঙল। সেই ভিড়ের পিণ্ডের মত দলটা মাটিতে নেমে গরুটার গায়ে হাত দেয়া মাত্র যেন বদলে যায়। এখন আর তারা পিণ্ড থাকে না। গরুটাকে ওপরে তোলার কাজে প্রত্যেকটা মানুষ

boiRboi.net

আলাদা হয়ে যায়, অথচ একসঙ্গে একটা কাজ করায় আবার একটা দল থাকে। পাঁচ-ছয়জন গরুটার পেছনের পাদুটো ধরে টেনে তোলে, চার-পাঁচজন সামনের পা-দুটো টেনে তোলে। তোলা মাত্র এই এতগুলো মানুষের পিঠের, কাঁধের, হাতের, পায়ের পেশিগুলো ফুলে ওঠে পাথরের টুকরোর মত, দেখায় যেন লোহার মত শক্ত! এতক্ষণের নোয়ানো মাথা শুধু সোজাই হয় না, ঘাড়ের ওপর পেছনে হেলে পড়ে। সমস্ত মুখমণ্ডলে রক্তসঞ্চার হয়, যেন ফেটে যাবে। চোয়ালগুলো শক্ত হয়ে ওঠে। চোখগুলো বড় হয়ে ওঠে। 'হে-এ-এ-এ-ই-য়ো' —একটা সমবেত ধ্বনিতে এই এতগুলো শরীরের সমবেত শক্তির একত্র প্রয়োগে গরুটাকে মাটি থেকে ওপরে তুলে ফেলা হয়। তারপর থ্যাবড়ানো চ্যাবড়ানো অতগুলো পা একসঙ্গে শূন্যে গরুটাকে তুলে ট্রাকের দিকে এগয়। সেই সমবেত পদক্ষেপ এত বেশি আর এত শক্তির সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত ওজন সত্ত্বেও গরুটাকে তুচ্ছ মনে হয়। নেংগু ওপর থেকে চিৎকার করে, 'হে-ই বুধারু, পাছত্ ঠেলো।' গরুটার ওজন নিজের দুই হাতের ওপর নিয়ে বুধারু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'চুপ যাও ছোটবাবু, বাঁশ আনিবার কহেন, ছোট বাঁশ একোটাক।' লাঙলটা নামিয়ে রেখে চ্যারকেটু পেছন দিক থেকে দৌড়ে যায় বটতলায়। ওরা সমস্ত ওজনটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাহেবাবু দ্রুত পায়ে এসে চিৎকার করে ওঠেন, 'এই নেংগু, করছটা কী, গাড়ি ভর্তি লোক, লোকগুলোও মরবে, গরুটাকেও মারবে।'

পদ্মনাথ বলে ওঠে, 'ছাড়ি দেন, ছাড়ি দেন, চ্যাংড়াপ্যাংড়ার কাম।'

চ্যারকেটু ততক্ষণে একটা ছোট বাঁশ নিয়ে আসে। বুধারুর দলের দুইজন সেই বাঁশটা গরুর পেটের তলায় দিয়ে দুদিক থেকে দুজন কাঁধে তোলে, তাদের ন্যাংটো শরীরে কোমরের পেশিগুলো পাথরের মূর্তির ছাঁচ নেয়। আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই বাঁশের ওপর দিয়ে পেছনের দলটা গরুটাকে গড়িয়ে দেয়। সামনের দলটা গরুটার লম্বা গলা ট্রাকের ওপর তুলে দেয়। ট্রাকের পাটাতনের ওপর গরুটা গলাটা আরো লম্বা করে দেয়। সামনের দল আরো ঠেলে দিলে গরুটার সামনের পাদুটোও লম্বা হতে থাকে। পেছনের দল খুব জোরে ঠেলা মেরে গরুটাকে ট্রাকের আরো ভেতর ঠেলে দেয়। তারপর গরুটার পেছন দিকটা পেছনের ডালার সমান্তরাল করে চওড়াচওড়ি গরুটাকে সেঁদিয়ে দেয়। আর গরুর ওজনটা তাদের পেশির ওপর থেকে সরে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে বুধারুর দলটা তালগোল পাকিয়ে হয়ে যায় ভিড়ের পিণ্ড।

গরুর দড়ি হাতে নিয়ে, দুই হাতে তুলে, নেংগু যেই 'যেইঠে গাই, সেইঠে যাই'

বলে চিৎকার করে উঠেছে, সঙ্গে-সঙ্গে গরুটা চার পা ছড়িয়ে দাপাদাপি শুরু করে দেয়। ট্রাকশুদ্ধ লোক দাঁড়িয়ে পেছনে গিয়ে জড়ো হয়। মেয়েরা চিৎকার করে ওঠে, 'হেই মাগে।' নেংগু এই অবস্থাটার জন্য তৈরি ছিল না। এক হাতে দড়ি ধরে, দুই হাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে থেকে গরুটাকে দেখে। দাপাদাপি করতে-করতে, পা পিছলিয়ে-পিছলিয়ে গরুটা কোনো রকমে সামনের পায়ের হাঁটুর ওপর ভর পায়। তার ওপর জোর দিয়ে, কাত থেকে সোজা হয়ে বসে, তারপর পেছনের হাঁটুদুটোকে ভাঁজ করে নিজের শরীরের তলায় আনে, তারপর সামনের পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে খানিকটা উঠে, পেছনের পা-দুটোকে সোজা করে উঠে দাঁড়ায়, দু-পাশে তাকায়, একবার কানদুটো নাড়ায়, লেজটা উঁচু করে তোলে, তারপর হড়হড় করে নাদতে শুরু করে দেয়। এটা নেংগুর হিশেবের মধ্যে ছিল না। সে 'হে হে হে হে' করে উঠে লাফাতে থাকে আর গরুটা থলথলে পাতলা নাদতে-নাদতে জায়গাটা পাতলা গোবরে ভর্তি করে দিতে থাকে।

ট্রাকের লোকজন 'হেই হেই' করে উঠলে, নেংগু সেই গোবরভরা ট্রাকে গরুটার পাশে, গরুর দড়িটা একহাতে ধরে, ট্রাকশুদ্ধ লোকের দিকে পেছন ফিরে 'হে-হে-হে-হে' করে হাসতে থাকে আর তার সারা মুখের হাসির কুঞ্চনের রেখাগুলো কাঁপতে থাকে।

বাহেবাবু প্রায় ছুটে এসে পড়েন, 'তুমি কি সবটাই ইয়ার্কি পেয়েছ? এখন রওনা হওয়ার সময় ট্রাকের ওপর গরু তুলে হাগিয়ে কেলেংকারি করছে!'

হে-হে হাসতে-হাসতে নেংগু বলে, 'এই দেখেন কেনে বাহেদা, মুই সাফ করি কিছু। হে চ্যারকেটু একখান বালতিত্ জল ধরি আন্ কেনে।'

ভিড়ের অনেকটা পেছন থেকে চ্যারকেটু চেঁচিয়ে বলে, 'মুই কুঠে পাম?'

'তা, তুই এত্তি আয়, দড়িটা ধর কেনে, মুই দেখিছু।'

চ্যারকেটু মাটি থেকে লাঙলটা তুলে কাঁধে নিয়ে, ভিড় ঠেলে গিয়ে ট্রাকের ওপর ওঠে। আগে লাঙলটা ট্রাকের ওপর দেয়, তারপর নিজে ওঠে, ওঠার সময় কোমরে গোঁজা কাঁচিদাওটা বাঁচিয়ে নিতে হয়, উঠে লাঙলটা আবার কাঁধে তুলে নেংগুর হাত থেকে দড়িটা নেয় আর জল-বালতি আনার জন্য নেংগু লাফিয়ে নামে।

নেংগু নেমে যাওয়ার পর ট্রাকের লোকজন গোবরটা বাঁচিয়ে বসে। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে থাকে। গরুটা এতক্ষণ উদ্‌বেগে গলাটা বাড়িয়েছিল। এখন চ্যারকেটুর গায়ের গন্ধ পায়। চ্যারকেটুর গন্ধ পেয়ে গলাটা ছোট করে চ্যারকেটুর

boiRboi.net

বাঁশি আর মাদল ঢোলকের আওয়াজ শুনে বিশু চিৎকার করে ওঠে, 'এই বীরেন, তাড়াতাড়ি মিছিল সাজাও, মিছিল সাজাও।'

শোনা মাত্র সেই ছেলেটি 'মিছিল সাজাও, মিছিল সাজাও' বলে ছুটে যায়। বীরেন বিশুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে দিতে শুরু করে। বিশু ধমকে ওঠে, 'বিড়ি রাখ্, মিছিলটা ধর্ কেনে, শুকরাপাড়ার মিছিলটা আসিবার আগত্ মিছিলটা নিয়া রওনা দিম।' বিশুর ধমক খেয়ে বীরেন বত্তে যায়। বাহেবাবুকে বেঞ্চি আর চা দেয়ার দোষ এই ধমকে মাফ হয়ে যায়। বিড়িটা কানে গুঁজে বীরেন চিৎকার করে ওঠে 'মিছিল ধর, মিছিল ধর।'

শুকরাপাড়ার সাঁওতাল-মদেশিয়া দলটা এখানে এসে পৌঁছুবার আগে বিশু পাঙ্গার ব্রিজটা পার হয়ে যেতে চায়। ঐ দলটার মুখোমুখি সে হতে চায় না। সাত বছর আগে, প্রথম যুক্তফ্রন্টের সময়, মৌজা ম্যাপ দেখে, শিট মিলিয়ে মিলিয়ে, প্রত্যেকটা শিটের দাগ নম্বর মিলিয়ে শুকরাপাড়ার খাশজমিটা বের হয়। সাঁওতাল-মদেশিয়া কৃষকদের নিয়ে বিশু সেই জমি দখল করে। বাহাদুর আর জলপাইগুড়ি জিলার সবচেয়ে শক্তিশালী জোতদারদের একজন বাহেবাবু। তার সঙ্গে লড়াই শুরু হয়। তারপর সেই যুক্তফ্রন্টের আমলে সেই লড়াইয়ে শুকরাপাড়ার কৃষক গ্রেপ্তার হয়। সব কিছুর পর কৃষকরা জমির পাট্টা আদায় করেছিল। বছর তিন আগে সেই শুকরাপাড়ার সেই খাসজমির সেই কৃষক সেই বাহেবাবুর কাছে যায় বিছন আর খাওয়ার ধানের জন্য। তিন বছর ধরে বাহেবাবুকে জমির ভাগা দিয়ে যাচ্ছে। তিন বছর আগে ওরা যেদিন বাহেবাবুর কাছে গেল, বিশু না করে নি, না করতে পারে নি। ওদের পেটে দিনের পর দিন ভাত ছিল না, ঘরে একফোঁটা বিছন ছিল না, গাই-বলদ আগেই বেচা হয়ে গিয়েছিল, কোনো লোন নাই, কোনো রিলিফ নাই। দখল-করা খাশজমি আবার আধিতে ফিরে গেল। লড়াইয়ের শুকরাপাড়া এখন বাহেবাবুর ঘরের আধিয়ার। ওরা বাহেবাবুর মিছিলে আসছে। বিশু ওদের খাশজমি বাঁচাতে পারে নি, খাওয়ার ধান জোগাড় করে দিতে পারে নি, লোন আর বিছন আদায় করে দিতে পারে নি। এখন অন্তত বিশু নিজের লজ্জাটা ঢাকতে পারে। তিন বছরের ভেতর ও শুকরাপাড়ায় যায় নি। আজও ওরা আসার আগেই চলে যেতে চায়। শুকরাপাড়া ছিল বিশুর সবচেয়ে গৌরব। এখন সবচেয়ে লজ্জা। এই দশজনের সামনে লজ্জা পেতে কারই-বা সাধ হয়? তাই ওরা পৌঁছুবার আগে বিশু পাঙ্গার ব্রিজটা পেরিয়ে যেতে চায়।

চায়, কিন্তু পারে না। কোনোরকমে মিছিলটা সাজিয়ে পাঙ্গার ব্রিজের

boiRboi.net

মাঝখানে যখন, বিশু ডান দিকে তাকিয়ে দেখে, নীচে, কার্তিক মাসের পাঙ্গা নদীর শুখা খাতের দুই বাঁকে শুকরাপাড়ার মিছিলটা আসছে। সাইকেলটা নিয়ে বিশু তার মিছিলটার পেছনে ছিল। সে একটু দাঁড়িয়ে পড়ে। পাঙ্গা নদীর শুকনো খাত, চিকচিক বালি, একেবারে পশ্চিমপাড়ে ছায়ার মত এক চিলতে জল তিরতির, দুদিকে উঁচু পাড়, পাড়ের ওপর পাকা ধান—এই সব দেখে ওরা নদীর চরে নাচতে শুরু করে দিয়েছে কোমরে হাতের বন্ধনী দিয়ে। ঠেসে হাড়িয়া খেয়েছে নিশ্চয়ই, যতটা পেরেছে। মাদল, ঢোলক আর বাঁশি দলের মুখোমুখি বাজিয়ে-বাজিয়ে পেছু হঠে হাঁটছে। বিশু একটু না-হেসে পারে না। ঢোলক বাজাচ্ছে সিমন। বিশু খুব ঢোল বাজাত, আর-কিছু পারত না বলে। তিন বছর ওদের কাউকে দেখে নি। তবু যেন বিশু এই সাঁকোর ওপর থেকে খাতের বাঁকে ওদের চিনতে পারে। সবটাই লাল রঙে টানা বলে ঠাহর হয় না, কোনটা মাথার ফেটি বা গলার গামছা বা বুকের আঁচল। সাইকেল ঠেলে বিশু এগয় আর একটু-একটু হাসে আর তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে।

হঠাৎ বিশু আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। সেই নাচের লাইনের পেছনে একটা খুব লম্বা বাঁশের মাথায় পতপতায় লালঝাণ্ডা। নাচের মানুষের এত ওপরে সে ঝাণ্ডা, আর বাঁশটা দেখা যায় না বলে, মনে হয় যেন সেটা পাখি, মিছিলের ওপর দিয়ে উড়ে-উড়ে ভেসে আসছে, মনেই হয় না মিছিলের মানুষের কোনো যোগ আছে ঐ ঝাণ্ডার সঙ্গে। বিশুর দেয়া ঝাণ্ডা। সেই ঝাণ্ডা উঠিয়ে ওরা বাহেবাবুর মিছিলে আসছে। বাহেবাবু কিছু বললে, বিশু জানে, কী জবাব দেবে, সহরাই-ই জবাব দেবে, সে-ই তো মুখিয়া, 'হামলোক তোমরামনকে আধিয়ার, তোমরামনকো মিছিল জলুসমে আইলাখ হো, লেকিন, আপনা ঝাণ্ডাকো জিম্মাবারি নাহি ছোড়ে হো।' তারপর, বাহেবাবুর ধমক খেয়ে ঝাণ্ডাটা ভাঁজ করে মেয়েরা জামার ভেতরে রেখে দেবে। বিশু সাইকেলটা ঠেলে তাড়াতাড়ি হাঁটা শুরু করে। হাঁটতে-হাঁটতে বারবার দেখে, পাঙ্গা নদীর চরা দিয়ে এক লাইন লাল ঢেউ—স্রোতের মত। চরার আকাশে লালঝাণ্ডা—পাখির মত।

ওদের আসতে দেখে বিশুর প্রথমে ভাল লেগেছিল। নাচতে দেখে মজা পেয়েছিল। ঝাণ্ডা দেখে হেসে ফেলেছিল। ব্রিজের শেষে পৌঁছে তাকাল—ব্রিজের ঢালু বেয়ে নেমে গেলে আর ওদের দেখা যাবে না—মনটা খারাপ করে আর তারপরই রাগ হয়ে যায়। সবাই ট্রাকে-ট্রাকে মিছিল নিয়ে গেল, প্রেসিডেন্টের সামনে জিলা কমিটি হবে না এ্যাডহক কমিটি হবে তার বিচার,

boiboi.net

কোর্টে আইন অমান্য। আর সে নিয়ে যাচ্ছে হাঁটিয়ে-হাঁটিয়ে অধবা-বিধবা-ছাওয়া-ছোটদের একখান মিছিল। এই হাঁটিয়েই যদি বিশু নিয়ে যেত শুকরা-পাড়ার মিছিল, তাহলে পঞ্চাশজনের হাঁটা-মিছিল ট্রাক-ট্রাক মিছিলকে হারিয়ে দিত। কেন? না, এটা ধাহাদুরের শুকরাপাড়ার মিছিল, এদের পিঠের তীর-ধনুক আর হাতের বল্লম মিছিলের শোভা নয়—দখলের হাতিয়ার। এদের ঢোলক-মাদল-বাঁশি মিছিলের গানা-নাচার জন্য নয়—লড়াইয়ের হাঁক দেওয়ার জন্য। এটা শুকরাপাড়ার মিছিল। এটা বিশু অধিকারীর মিছিল।

এখন, এটা কার মিছিল? না, বাহেবাবুর আধিয়ারদের মিছিল। বিশুর রাগ হয়ে যায়। শুকরাপাড়া তাকে ছোট করে দিয়েছে, এই কতকগুলো অধবা-বিধবা-ছাওয়া-ছোটর লিডার বানিয়েছে। তার সামনে তার নিজের মিছিলের শ্লোগান শুনে বিশুর রাগ আরো বেড়ে যায়। সে হাঁকড়ে ওঠে, 'বী-রে-ন।' মিছিলের পাশ থেকে বীরেন পেছন ফিরে তাকালে, বিশু ঘাড় হেলিয়ে ডাকে। বীরেন ছুটে এলে, সাইকেলটা ঠেলে বীরেনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে 'মিছিলটাকে স-মিলের কাছে বসা, আমি আসছি', বলেই বিশু পেছন ফেরে। কানে মাদল, ঢোলক আর বাঁশির আওয়াজে কোমরে যাতে নাচের তাল না লাগে, বিশু সম্পূর্ণ ভিন্ন লয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে ব্রিজটা ফিরে পেরতে থাকে—ব্রিজের অপর মাথায় মিছিলটাকে দেখবার জন্য বাহেবাবুকে সামনে নিয়ে দাঁড়ানো ভিড়টার দিকে। নদীর খাতে একবারও বিশু তাকায় না। শুকরাপাড়ার মিছিলটার হাত থেকে তার ঝাণ্ডাটা শুধু কেড়ে নিয়ে আসবে বিশু।

যেন ব্রিজটুকু পেরিয়ে এলেই ওদের মুখোমুখি হয়ে যাবে বিশু, প্রথমে হিশেবটা এমনিই ছিল। কিন্তু ব্রিজের এ-মাথায় চাপা ভিড়। মিছিল তখনও নদীখাতে। বিশু কি তাহলে এখানে এই ভিড়ের পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, নাকি সোজা এগিয়ে বটতলিতে যাবে, তারপর মিছিলটা উঠে এলে তার ঝাণ্ডাটা কেড়ে নিয়ে চলে যাবে? ভিড়টার কাছাকাছি আসতে বিশু শুনল, 'বিশুবাবুর দলটা আসি গেইছে।'

'এ্যালায় আর বিশুবাবুর দল না-হয়, বাহেবাবুর দল'—নেংগুর গলা।

'বাদ দাও ত'—বাহেবাবুর গলা। আর সঙ্গে-সঙ্গে বিশু তার নিজের গলার চিৎকার শোনে, 'নেংগু, পথ ছাড়ি দে।'

ঢোলক-মাদল-বাঁশির আওয়াজ ছাপানো সেই হুংকারে, বিশু দেখে—ব্রিজের মাথার পুরো ভিড়টা মুহূর্তে মাথা ঘুরিয়ে তাকে দেখে, আর ফাঁক হয়ে যায়। সেই ফাঁক দিয়ে বিশু প্রথম ধাপটায় পা ফেলে, নদীর খাতে নেমে-যাওয়া ছোট-

BanglaBook.net

বড়, সরু-মোটা, মাথাভাঙা মাটির ধাপগুলোর প্রথম ধাপে। মুহূর্তে সমস্ত রক্তোচ্ছ্বাসের উত্তাপে বিশু বুঝে ফেলে, সে একটা ঘটনা শুরু করে দিতে পেরেছে, এখন ঘটনা ঘটনার মত এগবে। ধাপগুলো বিশু রয়েসয়ে পার হয় না, গড়িয়ে গেলে ত নদীর ভেতরই পড়বে। ফলে, বিশু যেন কোনো বেতাল বেহিশেবি ভাড়ায় টাল-মাটাল বেগে নদীর বুকে চলে যায়।

মিছিলটাও সে-সময় সবে দাঁড়িয়েছে, লাইন ভেঙে খাত বেয়ে এখন উঠবে। সিমন আর ঢোল বাজাচ্ছে না, থেমে গেছে। কোমর-জুড়ে হাতের শেকল সবে খুলতে শুরু করেছে। ওরা দেখে সামনে, বিশু। হাতের শেকল যারা খোলে নি তারা আর খুলতে পারে না, গোপন নিশ্বাস নেবার মত ঠোঁটটা ফাঁক করে থাকে। শুখা বাঁশিটা নামিয়েছিল, ধীরে-ধীরে বাঁশিটাকে বুকের কাছে তুলে হাত জড়ো করে। স্বপ্নে কথাবলার মত চাপা স্বরে একটি মেয়ে শুদ্ধ মিছিলে ফিসফিস আউড়ে ওঠে, 'কা-ম-রি-ড্'। তারপর তার শ্বাস পতনের আচমকা শব্দ হয়। মাথার ওপর রোদ প্রখর, বিশুর সারা মুখ ঘামে ভেজা, গায়ের কুচকুচে কাল রং ঘামে ভিজে চকচক, সারাটা মুখ থমথম। এদের সবার মাথার ওপর দিয়ে বিশু তাকিয়ে, পেছনে ঢালু উঁচু পাড়ের পটভূমি, ব্রিজের মাথায় সদলবল বাহেবাবু—পথ আটকে দাঁড়ানো বিশুকে অনুপ্রাণিত মনে হয়। বিশু বুঝতে পারে, বিস্ময়কর সেই মুহূর্ত কটি কেটে যাচ্ছে যখন ঘটনার বেগে ঘটনা ঘটে যায়, আর এই মুহূর্ত কটি কেটে গেলেই ওপর থেকে বাহেবাবুর দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, বিশুকে মারতেও পারে, মারা শুরু করলে—মেরে ফেলে রেখে চলে যেতে পারে। অথচ বিশু কিছু বলতে পারছে না, বলার মত কিছু মনে আসছে না। আর কানের ওপরের রক্তবাহী শিরায় বিশু দবদব মুহূর্ত গোনে।

বিশু তার মূল সিদ্ধান্তে ফিরে যায়। ঝাণ্ডাটা সবচেয়ে পেছনে। বিশু খুব ধীর পায়ে সেই দিকে হাঁটে। সমস্ত দলটা বিশুর দিকে তাকিয়ে থাকে, সামনে যারা পড়ে তারা সরে যায়। নাচের লাইনটার সামনে গেলে 'হে-ই, মা-ই গে' বলে একটা মেয়ে ভয়ে ছিটকে যায়। বিশু গিয়ে ঝাণ্ডার বাঁশটা এক হাতে ধরে। ঝাণ্ডাঅলা ছেড়ে দেয়। ভারে, বাঁশটা নড়ে উঠতেই, বিশু আর-একটা হাত লাগায়। তার পর ওপারে গিয়ে ওঠার জন্য সেখান থেকেই নদীখাতটা পেরনো শুরু করে। দু-পা যেতেই ঝাণ্ডার বাঁশটা ঠিক রাখার জন্যে বিশুকে কাঁধ লাগাতে হয়। সেই বিরাট লম্বা বাঁশের মাথায় পাখির মত ঝাণ্ডাটা বয়ে-বয়ে বিশুকে একা-একা নদীখাতটা পেরনো শুরু করতে হয়। বালির ভেতর

boiRboi.net

তাড়াতাড়ি হাঁটা যায় না। তবু পায়ে-পায়ে এদের দলটা থেকে বিশু একটু-একটু করে দূরে সরে যায়। এদের দলের সবাই বিশুর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সহরাই-এরই মুখে প্রথম কথা আসে, 'হে-ই কামরিড্, হামলোগকো ঝাণ্ডা কাঁহা লেগোক্ লে হো ?'

বিশু দাঁড়ায়, কাঁধ আর হাতে সেই বিরাট লম্বা বাঁশের ভার সামলে দাঁড়ায়, তারপর আস্তে-আস্তে ঘোরে, বিশু আর দলটার মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা বিশুর অনুচ্চস্বরে ভরে যায়, যেন গভীর রাতের বাতাসে শুকনো পাতার সরসর, 'ই-তো লড়নেওয়ালা ঝাণ্ডা, দালালিকো ঝাণ্ডা নাহি থে। তেহেরমনকো (তোদের) মালিক খাড়া হ্যায়, উসকো ঝাণ্ডা হ্যায়, উ ঝাণ্ডা আভি পাকড়ো।' বিশু ঝাণ্ডার বাঁশ থেকে হাত সরাতে পারে না, চিবুকটা তুলে ব্রিজের মাথায় সদলবল বাহেবাবুকে দেখিয়ে দেয়। মালিক। এই পাঙ্গা নদী, এই শুকনো নদীখাত, রোদে পাকাধানের এই প্রাচীন গন্ধ, শরীরে কার্তিকের রোদের তাপ, মাথায় হাড়িয়ার উষ্ণতা, আর সেই বাহেবাবু, সেই বাহেবাবুর দলবল, সেই বিশুকামরিড, সেই লাল ঝাণ্ডা, সেই উদ্যত আক্রমণ, সেই প্রতিরোধ। দখল। সমস্ত দলটার ভেতর যূথস্মৃতি জেগে ওঠে, সহরাই-এর কণ্ঠ নদীখাতে প্রতিধ্বনিত হয়, সহরাই-এর কণ্ঠে সেই প্রাচীন দৈবগ্রস্ত পুরোহিতের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়, 'হামলোগকো ঝাণ্ডা হাম নাহি ছোড়বো।' ততক্ষণে বিশু সেই ভারী বাঁশ নিয়ে আবার ঘুরে গেছে। এবার সহরাই স্বাভাবিক স্বরে কথা বলে, 'হে-এ বিশুকামরিড, জেরা ঠার যা হে, হামনিমন যায়গা।'

মুহূর্তে ঢোলক-মাদল-বাঁশিতে, হাতে হাত ধরা সাজানো মিছিলটা খিলখিল হাসিতে ভেঙে যায়। এ ওকে ধাক্কা মেরে বিশুর দিকে ছুটতে শুরু করে। একটি মেয়ে চিৎকার করে ওঠে, ঝাণ্ডা 'নাহি ছোড়েক, কামরিডকো পাকড়কে ধরেক।' এতক্ষণের বিলম্বিত সুর-তালের গান ভেঙে হঠাৎ এমন একটা কোলাহল ওঠে, যেন ওরা নিঃসঙ্গ জ্যোৎস্না মাড়িয়ে রাতভর নাচ থেকে শেষরাতে ঘরে ফিরছে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েই ছিল। সে হঠাৎ বুঝে ফেলে 'হে-ই গে' বলে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে গিয়ে বারবার পড়ে যায়, আর তার সঙ্গিনীরা দূর থেকে ঘন লালরঙের শাড়িতে তাকে উঠতে, ছুটতে, পড়তে দেখে খিলখিল হেসে ওঠে।

boiRboi.net

৭

গৌরীহাটে চ্যারকেটু ও তার গরুকে নামানো হয় না।

হাটের কাছাকাছি এলে নেংগু দুই হাত তুলে লাফিয়ে-লাফিয়ে শ্লোগান দিতে থাকে। চ্যারকেটু সেই শ্লোগানের ফাঁকে কয়েকবার ডাকে, 'ছোট খুড়া, হে-এ ছোট খুড়া'। কিন্তু ডাক ফুরবার আগেই সে-ডাক শ্লোগানে চাপা পড়ে যায়, চ্যারকেটু নিজেই শুনতে পায় না। তার ভেতর হুস করে গৌরীহাট পেরিয়ে যায়।

চ্যারকেটুও চুপ করে যায়—তার মাথাতে ত বেরবার সময়ই ছিল যে কার্তিক মাসে শহরের অনেক বাবুর ঘর তরকারির বাগান তৈরি শুরু করে, তেমন কাজ পেলে গরু নিয়ে হাল দিয়ে দেবে। হালটাও ত সে সেই কারণেই সঙ্গে নিয়েছিল। কিন্তু সেজন্যে ত তাকে শহরের বাইরের কলোনি-টলোনির ভেতর দিয়ে-দিয়ে শহরে ঢুকতে হবে—তাকে দেখে যাতে কেউ ডেকে নিতে পারে।

শহর যেখানে প্রায় শুরু তেমন একটা জায়গাতে এসে তাই চ্যারকেটু বলে, 'ছোটখুড়া, মোক এইঠে নামি দাও, মুই হাঁটি-হাঁটি চলি যাম।'

নেংগু তখন একজনের কাঁধে হাত দিয়ে টাল সামলে দাঁড়িয়ে আছে, শহরের ভেতর ট্রাক ঢুকলে আবার নতুন শ্লোগান তুলবে। চ্যারকেটুর কথা শুনে সে চ্যারকেটুর দিকে, গরুটার দিকে আর পেছনে অপসৃয়মাণ রাস্তার দৈর্ঘ্যের দিকে তাকায়। নেংগু আর চ্যারকেটু যেন একই সঙ্গে বোঝে—এ-রকম একটা জায়গায় এই গরুটাকে ট্রাক থেকে নামানো কত অসম্ভব। নেংগু কিছু বলার আগেই চ্যারকেটু বুঝে যায়, তার কিছু করার নেই—তাকে এখন শহর পর্যন্ত যেতেই হবে, যেখানে নামাবে সেখান থেকেই আবার হাঁটিতে-হাঁটিতে গৌরীহাটে ফিরতে হবে। যে-আশায় সে লাঙলটা কাঁধে নিয়েছিল সেই বাবুর ঘরের তরকারি বাগানে হাল লাগিয়ে পয়সা কামানোর আর-কোনো সম্ভাবনাই নেই। সন্ধ্যেবেলায় হাটে গেলেও আর গরু বিক্রি হবে না।

কিন্তু নেংগুও ত একটা দায়িত্ব বোধ করে। তাই চ্যারকেটু আর গরুটার মাথার ওপর দিয়ে সামনের রাস্তাটা দেখে আর ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনের রাস্তাটা

boiRboi.net

দেখে। পাশের লোকটির কাঁধ থেকে সে হাতটা সরিয়ে নিয়েছে। এখন সেই লোকটিই তার বাঁ বাহু ধরে তাকে সামলাচ্ছে। নেংগু হঠাৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতে চিৎকার করে চ্যারকেটুকে বলে, 'চ—ল্, চ—ল্, তোর গরু দিয়া মিছিল স্টাট করাম।'

এমন ঘোষণায় মনে হয় মিছিলের ওপর নেংগুর একটা মালিকানা আছে। চ্যারকেটুর কথার জবাব নেংগুকে দিতেই হবে এমন নয়। চ্যারকেটু ও তার গরুকে ট্রাকে তুলেছে বলে, তাদের নামানোর দায়িত্বও তার—এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু সে দায়িত্ব বোধ করে ফেলেছে মিছিলটা নিয়ে। শহরে যে-মিছিল সাজানো হবে তাতেও চ্যারকেটুকে কাজে লাগানোর কথাটা মাথায় এসেছে বলেই সে কথাটা বলে ফেলতে পারে।

চ্যারকেটু তাকিয়ে দেখে জলপাইগুড়ি শহরটা কত তাড়াতাড়ি তার সামনে আসছে। ট্রাক যে-গতিতে জলপাইগুড়ি শহরের ভেতর ঢুকেছে, সেই গতিতে ত আর চ্যারকেটু শহর থেকে বেরতে পারবে না, তাই তার কাছে এই গতির অন্য মানে ধরা পড়ছে—সে কী বেগে গৌরীহাট থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। রোদ থাকতে-থাকতে যেন সে গৌরীহাটে আসতে পারে। অন্ধকারে ত আর কেউ গরু কিনবে না। টনটনা রোদে, দাঁত দেখে, গা দেখে, পেট দেখে, বাঁট টিপেও খদ্দেররা গরু কিনতে চায় না, তার ওপর এখন ত হাটবারের বাইরেও যে-কোনো দিন রাস্তায় গরু বের করা হচ্ছে বেচার জন্যে। ধানকাটা পর্যন্ত খুব গরু বিক্রি হবে। এখন খদ্দেরের বাজার—তাই আগেভাগে হাটে পৌছুতে হবে। এই গরুটা বিক্রি হতে অবিশ্যি খুব বেশি ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। দাম নাও পেতে পারে—পৌনে দুইশতেও নেমে যেতে পারে। এত ভাল গরু পৌনে দুই শতে যে-কেউ কিনবে। এখন পৌনে দুই শতে সেধে গরু বেচে আবার মাস দুই পর পাঁচ-ছশ টাকা নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে হবে একটা গরু কেনার জন্যে। তবু গরু পাওয়া যাবে না। গিরি এ-বছর টাকা দেবে না। কিছুতেই দেবে না। এই গরু বিক্রি করে আবার চাষের গরু কেনা হবে কেমন করে তা চ্যারকেটু জানে না, তার পক্ষে জানা সম্ভবও নয়। জানতে হয় ত কাকা খেতখেতু জানুক। চ্যারকেটু জানে যে খেতখেতুও জানে না। সে না জানে, না জানুক। সামনের চাষ মানে ত মাসদুই পর। দুই-দুইটি মাস ত প্রায় এক জন্মের মত লম্বা, এখন। এখন ত দিন আটদশ পরের ধানকাটার কথাই মনে আসছে না—তার ওপর আবার মাস দুই পরের চাষ। যদি চ্যারকেটুকে এই মিছিল থেকে ফিরতে না হত, যদি চ্যারকেটু দিন আটদশ

boiRboi.net

পরে এই মিছিল থেকে ফিরতে পারত তা হলে দেখত দুপাশের ধানখেতে ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে।

মাসকলাইবাড়ির শ্মশান পেরিয়ে যায়। লোকজন তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। নেংগু ডান হাতে তার ধুতিটাকে এত উঁচু করে ধরে যে তার কুঁচকি বেরিয়ে যায়। আর বাঁ হাত মাথার ওপর তুলে বিরাট হাঁ করে শ্লোগান দেওয়া শুরু করে। রাস্তার দক্ষিণদিকের মাঠে আর-একটা মিছিল জড়ো হচ্ছে—ঝাণ্ডা দেখে চেনা যায় যুক্তফ্রন্টের মিছিল। সেখান থেকে শ্লোগান ওঠে। ডানপাশে হনুমান মন্দির। রাস্তায় রিক্সা, সাইকেল, গাড়ি। ট্রাকের গতি কমে আসে। এতক্ষণ ট্রাকটা একই গতিতে আসছিল, এখন শহরের ভেতর গতির সমতা রাখা যাচ্ছে না। একটু ফাঁক পেলেই ট্রাকটা জোরে ছুটে সামনে কোনো বাধা পেয়ে আচমকা ব্রেক কষছে আর ট্রাকের ওপরের লোকজন এ ওর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। নেংগু কিছুক্ষণ পাশের লোকটির কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত উবু হয়ে বসে পড়েছে। কিন্তু নেংগু উবু হয়েও বসে থাকতে পারছে না—ট্রাকের ধাক্কায় তাকে মেঝের ওপর বসে পড়তেই হয় প্রায়। কিন্তু নেংগু তার অত ধবধবে কাপড়ে ট্রাকের ঐ নোংরা মেঝেতে বসে কী করে, বিশেষত একটু আগেই সে এই মেঝে থেকে গোবর পরিষ্কার করেছে। দুপাশে ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে শ্লোগান দিতে-দিতে ট্রাকের লোকজন আসছিল। তখন সেই নৈঃশব্দ্যের পরিবেশে এই ট্রাক আর মিছিলের শ্লোগানের আওয়াজটাই প্রধান ছিল। এখন শহরের ভেতর অজস্র শব্দ—রিক্সার, গাড়ির, মানুষের। যেন, মিছিলের আওয়াজটাই সবচেয়ে কম। তাই ট্রাকের ভেতর শ্লোগান দিলেও সে-আওয়াজ শহরের রাস্তার অন্য আওয়াজের সঙ্গে মিশে যায়। শহরের ভেতরে রাস্তা ক্রমেই বেশি সরু, দু-পাশে দোকানের সারি।

ডাইনে মিলন সঙ্ঘের মাঠ, গোলপোস্ট—সেখানে কংগ্রেসের বেশ বড় একটা মিছিল তৈরি হচ্ছে, কয়েকটা ট্রাক মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এই রাস্তা থেকে আর-একটা রাস্তা ডান দিকে ফুটবল মাঠের দিকে চলে গেছে। ঠিক সেখানেই এ-ট্রাকটা দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রাকের ওপরের লোকজন ভাবে, তাদের নামতে হবে। কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে পড়ে। নেংগুও উঠে দাঁড়ায়। মাঠের ভেতর থেকে কিছু লোক ছুটতে-ছুটতে আসে—হাত নাড়িয়ে-নাড়িয়ে ট্রাকের লোকজনকে নামতে বলে। ড্রাইভারের পাশ থেকে একজন মুখ বাড়িয়ে চেঁচায়, 'এখানে না, এখানে না।' কিন্তু তখনই ট্রাকটা ধাক্কায়-ধাক্কায় চলা শুরু করলে

boiRboi.net

যারা দাঁড়িয়েছিল তারা কেউ-কেউ পড়ে যায় সামনের লোকের গায়। নেংগু তখনই তার ধুতিসহ হাতটা মাথার উপরে তুলেছিল। আচমকা ধাক্কায় সে আর সামলাতে পারে না—সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই সেখানকার লোকজন তাকে দুই হাতে ধরতে যায় আর সেই হাতের ধাক্কায় নেংগু আবার উল্টো দিকে এসে বাঁ-দিকে কাত হয়ে পড়ে যায়। নেংগু এবার দাঁড়িয়ে উঠে 'শালার ট্রাক' বলতে চায় কিন্তু কথাটা বলা হলেও সে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে না, 'আরে, বসি যান কেনে, খাড়িবেন না, খাড়িবেন না—।' পাশাপাশি লোকজন নেংগুকে ধরে থাকে। নেংগু তাদের ধমকে বলে ওঠে, 'ছাড়ি দে মোক, ছাড়ি দে।'

ঠিক সেই সময়ই ট্রাকটা আবার গতি পেয়ে যায়। বাঁয়ে বিশ্বাসদের পেট্রল পাম্প। তার ভেতর দিয়ে রাস্তাটা পার হওয়ার সুবিধে থাকায় গাড়ির যে-জটলা পাকিয়ে গিয়েছিল সেটা খুলে যায়। ট্রাকটা বেশ তরতরিয়ে বেগুনটারির মোড়ে এসে থামে। নেংগুকে লোকজন ছেড়ে দিলেও নেংগু আর দাঁড়ায় না।

বেগুনটারির মোড়ে গিয়ে ড্রাইভার বাঁদিকে ঘোরার জন্যে স্টিয়ারিংটা সামান্য ঘোরাতেই তার পাশে বসে বাহেবাবু 'আরে রে রে', করে ওঠেন, 'এদিক দিয়ে না, সোজা চালাও, কদমতলা দিয়ে বাঁয়ে ঘুরবে।' ড্রাইভার ট্রাকটা একটু ঘুরিয়ে ফেলেছিল। তাকে আবার পেছতে হয়—সেখানে এই ট্রাকের পেছনে রিক্সা ও অন্য সব গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। ক্লিনার ছেলেটি দরজায় চড় মেরে মেরে পেছুবার সঙ্কেত দেয়।

কদমতলার মোড়টাই জলপাইগুড়ি শহরের প্রধান জায়গা। সিনেমা হল, দোকানপাট দিয়ে জমজমাট। সেখানেই শহরের লোক বেশ মজার সঙ্গে দেখে, মিছিলে মানুষজনের সঙ্গে একটা গরু ও একটা লাঙল-কাঁধে মানুষও আছে। দৃশ্যটা সবাই যে দেখতে পায় তা নয়, কারণ কদমতলার মোড়ে ট্রাকের লোক-জনও দাঁড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু যারা দেখে তারাও অন্যদের ডেকে-ডেকে দেখায়। ট্রাকটাকেও এখানে একটু দাঁড়াতে হয়।

ইতিমধ্যে উল্টো দিক থেকে মিছিল নিয়ে আর-একটা ট্রাক আসে। ঐ ট্রাকটাতেও তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ছিল—কিন্তু সব তেরঙ্গা ত এক নয়। ঐ ট্রাকটার ড্রাইভারের পাশ থেকে একটি ছেলে হাত বাড়িয়ে চেঁচায়, 'বাহেদা, এটা সেকেণ্ড ট্রিপ।'

ঐ ট্রাকটাই আগে ডাইনে ঘোরে। বাহেবাবু ড্রাইভারকে বলেন ঐ ট্রাকটার পেছনে-পেছনে যেতে। একই দলের দুটো ট্রাক পরপর যাচ্ছে, তাও আবার

boiRboi.net

কদমতলার মোড় থেকে থানার দিকে—শহরের সবচেয়ে ব্যস্ত রাস্তায়—ফলে দুই ট্রাক জুড়ে খুব জোরে-জোরে শ্লোগান উঠতে থাকে। বাহেবাবুদের ট্রাকে অনেকেই তখন দাঁড়িয়েছে—তাই চ্যারকেটু ও তার গরু আড়ালে পড়ে গেছে।

সামনের ট্রাকটার পিছু-পিছু বাহেবাবুদের ট্রাকটা থানার পাশ দিয়ে ছোট রাস্তাটায় ঢোকে। বাহেবাবু নিজের মনেই বলে ওঠেন, 'এ-রাস্তায় ঢোকার দরকার কী ছিল?' বাহেবাবু দেখেন, সামনে শেখরদের ট্রাকটা গণ্ডুদের বাড়ির সামনের মাঠটায় ঢুকে গেল। সেখানে আর-কোনো ট্রাক নেই, লোকজন নেই। এমন অদ্ভুত জায়গায় ট্রাক থেকে লোক নামাবে নাকি? শেখরের মতলবটা কী? কিন্তু শেখররাই ত নব কংগ্রেসের নেতা, বাহেবাবু বাহাদুর থেকে এক ট্রাক লোক এনে দিয়ে নিজের সম্মানটা অন্তত রেখেছেন—এই যা। না হলে, যা সব চলছে, এরা কোনদিন হয়ত বাহেবাবুকেই বের করে দেবে।

সামনের ট্রাকের ড্রাইভারের পাশ থেকে শেখর নেমে আসে, বাহেবাবুও তখন নামছেন। নামতে-নামতেই জিজ্ঞাসা করেন, 'আরে, এই মাঠে নামালে কেন?' বাহেবাবু দরজার বাইরে সিঁড়িটাতে পা দিয়ে নেমে পড়েন।

'বা বা, বাহেদা ত এখনো স্ট্রং। কী-রকম লাফ দিলেন', শেখর বাহবা দেয়।

'আরে, তোমরা না-হয় এখন পাত্তাই দাও না। এক সময় টাউনক্লাবে ব্যাকে খেলতাম, বুঝলে? পার্বতীপুর, নীলফামারি, সোদপুরে শিল্ড খেলতে গেছি—'

হে-হে করে হাসতে-হাসতে শেখর মাটিতে উবু হয়ে বসে পড়ে বাহেবাবুর কাপড় সরিয়ে পায়ের বাটিতে হাত দেয়। বাহেবাবুও পাটা এগিয়ে দেন, 'হ্যাঁ, দেখো, দেখো।'

শেখর আসলে মজার জন্যেই ও-রকম করেছিল কিন্তু বাহেবাবুর পায়ের পেটানো শক্ত গড়ন দেখে আর মজা করতে পারে না। হাসি থামিয়ে বলে, 'আরে বাহেদা, আপনি এখনো খেলতে পারবেন।' তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচায়, 'এই, কেউ এদিক-ওদিক যাবে না, লাইন লাগান, লাইন লাগান।'

বাহেবাবু বলেন, 'এখানে নামলে যে?'

'ইচ্ছে করেই নামলাম,' শেখর একটা সিগারেট বের করে, 'এখানে প্রতুল-দের একটা দল নামার কথা, ওরা ত শহরের নানা জায়গায় এ্যাসেম্‌বল্ করছে, তারপর একসঙ্গে সার্কিট হাউস অভিযান করবে। এখানে নামলাম, এখন হাঁটতে-হাঁটতে টাউন ক্লাবে চলে যাব, আমাদের সবাই ওখানেই আসবে। ব্যস,

প্রতুলরা ভাববে ওদের দলের সবাই এখানে এ্যাসেম্‌বল্‌ করেছে—'শেখর সিগারেটে টান দিয়ে হো-হো করে হাসে। বাহেবাবু অনেকক্ষণ আগেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়েছেন—ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসে এখন ছোকরারাই নেতা, কিন্তু বাহেবাবু এখনো তাঁর মুখের সামনে ছোকরাদের সিগারেট খাওয়া মানিয়ে নিতে পারেন না।

ট্রাক দুটোর ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়েছিল। ট্রাকের লোকজন প্রথমে দাঁড়ায়, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দু হাত মাথার ওপরে তুলে আড়মুড়ি ভাঙে, তারপর ধীরে-ধীরে ট্রাকের কিনারায় এসে ট্রাক থেকে নামার জন্যে তৈরি হয়। বাচ্চাদের ট্রাকের ওপর থেকে ঝুলিয়ে-ঝুলিয়ে নামিয়ে দেয়া হয়, দু-চারটি বাচ্চা তড়াক করে লাফ দেয়, কেউ-কেউ আবার চাকার ওপর পা দিয়ে নেমে যায়। মেয়েদের নামতে অসুবিধে হয়। তারা প্রথমে পা ঝুলিয়ে বসে, তারপর ছোট্ট একটা লাফ দেয়। মাটিতে পড়েই হেসে ফেলে, হাসি ঢাকার জন্যে ঠোঁটে হাত দেয়। এক বুড়ি লাফ দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে।

বাহেবাবুর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে শেখর চেঁচায়, 'এই কেউ দাঁড়িয়ে থাকবেন না, দাঁড়িয়ে থাকবেন না, লাইন লাগান, লাইন লাগান,' চেঁচায় ও সিগারেটে টান দেয়। কিন্তু ততক্ষণে খালের ধারে ও নদীর ধারে লাইন দিয়ে সবাই বসে গেছে।

চ্যারকেটু গরু নিয়ে ট্রাকের ওপরই দাঁড়িয়ে। এখানে মাঠে দুই ট্রাকের লোক এমনভাবে মিশে গেছে যে সে বুঝতেই পারে না কাকে বলবে। সে দেখতে পায়, খালের ধারে নেংগু বসে-বসে পেচ্ছাব করছে। এখানে ট্রাকের ওপর থেকে চ্যারকেটু গলাটা কত চড়িয়ে আর নেংগুকে ডাকতে পারে? কিন্তু সবাই মাঠে নেমে গেছে আর চ্যারকেটু লাঙল কাঁধে গরু নিয়ে ট্রাকের ওপর দাঁড়িয়ে—দৃশ্য হিশেবে ওটা এখন সকলেরই চোখে পড়তে পারে।

বাহেবাবু শেখরকে বলেন, 'এই, দেখো ত শেখর, একে নামানোর ব্যবস্থা করো।'

শেখর দেখে বলে, 'এ কী এনেছেন? বাহে দা? এ কি মিছিল চষবে নাকি? এ্যাঁ?'

'আরে, আর বলো-না, নেংগু বলে এক আধাপাগলার কাণ্ড। বলল, গাই-বাছুর চিহ্নটাই আসল, বলে ওকে ঠেলেঠুলে ট্রাকে তুলল। এখন নামানোর বেলায় তার পাত্তা পাবে না। এই নেং-গু-উ।'

'বলেছে ত ভালই। কিন্তু একে নামানো যায় কী করে? হে-ই বাচ্চু,'

boiRboi.net

শেখর ডাকে। শেখরের ডাকে তার ট্রাকের ড্রাইভার সামনে আসে, 'তোমার ট্রাকে একটা বড় তক্তা দেখলাম না, লম্বা— ?'

বাচ্চু আবার চিৎকার করে ডাকে, 'এ-ই ভাইয়া।'

তার ট্রাকের খালাশি ছেলেটি এসে দাঁড়ায়, বাচ্চু জিজ্ঞাসা করে, 'গাড়িতে কি তক্তাটা আছে ?'

ভাইয়া জবাব দেয়, 'আছে।'

তখন শেখর ভাইয়াকেই বলে, 'ঐ গরুটিকে নামাও ত ভাই, তক্তাটা ফিট করে।'

বাচ্চু আর ভাইয়া চ্যারকেটুর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে, 'আরে, এত একেবারে বামাল সমেত এসে গেছে—হে-এ-এ-এ !'

ট্রাকের লোডিঙের জন্যেই দুটো লম্বা তক্তাতে আড়াআড়ি ছোট-ছোট কাঠ জুড়ে দেয়া হয়েছে। এই ট্রাকের ড্রাম ক্যারি করার একটা বাঁধা কাজ আছে। লোডিঙের সময় ড্রামগুলোকে ঠেলে-ঠেলে এই তক্তা দিয়ে তোলা হয়, আবার আনলোডিঙের সময় এই তক্তা দিয়েই ঠেলে দেয়া হয়।

ভাইয়া তক্তাটা লাগায়। সে যেভাবে তার ট্রাকের পেছন থেকে তক্তাটা ঠেলে সরিয়ে, টেনে এনে এই ট্রাকটার পেছনে লাগায় ও এই তক্তার মাথাটা ট্রাকটার পেছনের খাঁজের সঙ্গে মিলিয়ে দেয় তাতে এই কাজে তার অভ্যস্ততা বোঝা যায়।

কিন্তু চ্যারকেটু ট্রাকের ওপর থেকে সেই তক্তা দেখে বলে ওঠে, 'এইঠে ত নামা না যায়, পিছলি পা ভাঙি যাবে।'

ভাইয়ার যা বয়স, তাতে সে হয়ত এ-রকম কথা জীবনে প্রথম শুনল—গরুর আবার পা ভাঙে ? সে খিলখিল হেসে বলে, 'পা ভাঙিলে প্লাস্টার করি নিবেন, ঐ ত ঐথানে হাসপাতাল !' ভাইয়ার সামনে করলা নদী ও সেই করলা নদীর পাড়ে সত্যি হাসপাতাল আছে। তাই তার কথার আকস্মিকতায় বাহেবাবু, শেখর, ট্রাকের দুই ড্রাইভার—শহরের এই লোকজন হেসে ফেলে।

বাচ্চু ড্রাইভার হঠাৎ হাত তুলে বলে, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান।' সে গিয়ে তক্তাটা উল্টে দেয়। এ-দিকটা অমসৃণ ও মাঝে-মাঝে আড়াআড়ি ছোট-ছোট কাঠ আছে। ঐ অমসৃণ তলের ওপর দিয়ে চ্যারকেটু গরুসহ নেমে আসতে পারবে, তার ওপর আড়াআড়ি কাঠগুলো থাকায় তার পা রাখার কোনো অসুবিধেই হবে না।

গরুটার পেছনে-পেছনে চ্যারকেটুর নামার কথাও নয়, তেমন দরকারও ছিল না। সে ত স্বচ্ছন্দে লাঙলটা মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নিজে লাফ মেরে নেমে

যেতে পারত। বা, ট্রাকটার কিনারায় লাঙলটা রেখে, লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে আবার লাঙলটা নিয়ে নিতে পারত। কিন্তু সে তার কোনোটাই করল না। লাঙলটা কাঁধে তুলল, গরুটাকে 'হেট-হেট' করে সেই তক্তাটার কাছে নিয়ে এল। গরুটা তক্তার ওপর পা দিতে না চেয়ে মুখটি ঘুরিয়ে নিল। ঘোরানো মুখের গলকম্বলে আদর করে হাত বুলিয়ে 'হেট-হেট' করে গরুটার মুখ তক্তাটার নিচে ঘুরিয়ে দিতেই গরুটা তক্তার ওপর পা দেয়। চ্যারকেটু তার পেছনে মৃদু চড় মারে, 'হেট-হেট'। নিজের পেছনের পায়ে একবার কাঁপন তুলে গরুটা তক্তার ওপর এক পা এগিয়ে দিতেই সামনের আর একটি পাও যেন কেউ ঠেলে এগিয়ে দেয় আর গরুটা হড়হড় করে নীচে নেমে আসে, তার পেছন-পেছন চ্যারকেটু লাঙল কাঁধে ঐ তক্তা বেয়েই নামে। গরু ও চ্যারকেটু দুজনে একসঙ্গে হয়ত তক্তার ওপর ছিলই না বা থাকলেও গরুটার মাটি ছোঁয়ার একেবারে শেষ মুহূর্তে। ফলে, চ্যারকেটু প্রায় বিশেষ অতিথির মতই নামে। তার নামা শেষ হলে ভাইয়া হেসে উঠে হাততালি বাজায়।

নামার বেগে গরুটাও খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল, চ্যারকেটুও খানিকটা এগিয়ে যায়।

যেন চ্যারকেটুর নামার ভেতর দিয়ে ট্রাক থেকে লোক নামা শেষ হল। 'লাইন লাগান, লাইন লাগান,' বলতে-বলতে শেখর মাথার ওপর হাত ঘোরায়। আর হাত নামিয়ে সে প্রথমে চ্যারকেটুকে টেনে এনে দাঁড় করায়। চ্যারকেটুর হাতে গরুর গলার গোল দড়ি ধরা ছিল। শেখরের টানে চ্যারকেটু যেমন সরে আসে, চ্যারকেটুর টানে গরুটা তেমনি সরে আসে। দুই হাতে চ্যারকেটু কাঁধ ধরে শেখর চেঁচায়, 'লাইন লাগান, লাইন লাগান।' লোকজন লাইনে দাঁড়াতে শুরু করে। চ্যারকেটু শেখরের হাতদুটো নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না কিন্তু মুখে কাতর স্বরে বলে, 'হে-এ বাবু, মোক ছাড়ি ছান, হে-এ বাবু—'

শেখরের চাইতে চ্যারকেটু মাথায় অনেক খাটো। শেখর চ্যারকেটুর মাথার ওপর দিয়ে লাইনটা দেখতে-দেখতে চেঁচায়, 'লাইন লাগান, লাইন লাগান।' মাঝে-মাঝে বাঁ হাত তুলে বাঁ দিকের লাইনটাকে চেপে যেতে বলে. কখনো ডান হাত তুলে ডান দিকের লাইনটাকে চাপতে বলে।

'হে-এ বাবু ছাড়ি ছান, মোক গৌরীহাট যাবা নাগিবে।'

চ্যারকেটু যে-গ্রামে কথাটা বলছে সেটা হয়ত শেখরের কানে পৌঁছয়ই না। শেখর তখন লাইনটা ঠিক করার ব্যাপারে এত ব্যস্ত যে সে শুনতে পাচ্ছে না—

boiRboi.net

তাও হতে পারে। কিন্তু চ্যারকেটু ত জানে না কত জোরে বললে শেখর শুনতে পাবে। এই মিছিলে যাওয়ার চাইতে তার গৌরীহাটে যাওয়াটা জরুরি—এমন কথা চ্যারকেটু ভাবে কী করে?

শেখর যখন লাইন ঠিক করার জন্যে তাকে ছেড়ে পেছন দিকে দৌড়য় তখন ত চ্যারকেটু লাইন থেকে সরে যেতে পারত। কিন্তু শেখরকে না বলে বা শেখর না বললে সে সরে যাবে কী করে—তা চ্যারকেটু বুঝে নিতে পারে না। পেছন থেকে শেখর আবার সামনে এসে চ্যারকেটুর দুই কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আরো চিৎকার করে বলে, 'লাইন বাঁধেন, লাইন বাঁধেন।'

চ্যারকেটু শেখরের বুকের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে, 'হে বাবু, মোক ছাড়ি দেন কেনে, মোক গৌরীহাট যাবা নাগিবে, মোক এই গরুখান বেচিবার নাগিবে, মোক চাউল কিনিবার নাগিবে, মোর বাড়িত্ পাঁচ-পাঁচখান্ না-খাউয়াইয়া মুখ বাবু, আজি গরুবেচা টাকা দিয়্যা চাউল কিনিলে উমরার খিত্যা মিটিবে। বাবু, মোক ছাড়ি ছান কেনে। মোক গৌরীহাটত যাবা নাগিবে।'

চ্যারকেটুর কথাগুলি শেখরের বুক থেকে কানের দূরত্বটুকু কিছুতেই পেরতে পারে না। শেখর চ্যারকেটুর মাথার ওপর দিয়ে শ্লোগান দেয়, 'বন্দে-এ মাতরম', 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী'। শ্লোগানে-শ্লোগানে মিছিলটা দানা বাঁধতে থাকে।

কিন্তু সেই দানা বাঁধানোর জন্যেই শেখরকে চ্যারকেটুর সামনে দাঁড়িয়ে এক হাতে চ্যারকেটুর কাঁধ ধরে, আর-এক হাত মুঠো পাকিয়ে মাথার ওপর তুলে শ্লোগানের ছন্দটা মিছিলের ওপর চাপিয়ে দিতে হচ্ছিল, 'বন্দে মাতরম্', 'বন্দে মাতরম্,' 'যুগ যুগ জিও, যুগ-যুগ জিও'। শ্লোগানের ছন্দটা বোঝাতে শেখরকে তালে-তালে মুঠো পাকানো হাত মাথার ওপর তুলতে হয় ও তালে-তালে নাচাতে হয়। তার বাঁ হাতটা চ্যারকেটুর কাঁধের ওপরই থাকে।

'হে-এ বাবু মোক ছাড়ি ছান, মোর গৌরীহাট যাবা নাগিবে, মোর গরুখান বেচা নাগিবে, মোর চাউল কিনা নাগিবে, মোক ছাড়ি ছান, মোক গৌরীহাট যাবা নাগিবে—।

চ্যারকেটুকে টেনে শেখর হাঁটিয়ে দেয়, 'চলেন, চলেন, মিছিলে চলেন, হাঁটেন, হাঁটেন।'

চ্যারকেটু চলে, চ্যারকেটুর গরু চলে, চ্যারকেটুর কাঁধ ধরে-ধরে তাকে পুরনো দোলনা ব্রিজের রাস্তায় তুলে দিয়ে শেখর দাঁড়িয়ে পড়ে—চ্যারকেটুসহ মিছিল চলে।

BanglaBook.org

মিছিলের পেছনে-পেছনে বাহেবাবু আর শেখর হাঁটা দেয়।

পেছন থেকে পদ্মনাথ রায় ডাকে, 'বাহে বাবু।' ডাক শুনে বাহেবাবু ও শেখর দাঁড়িয়ে পড়ে। পদ্মনাথ নমস্কারসহ জিজ্ঞাসা করে, 'আপনারা গোঠো হচ্ছেন কোথায় ?'

'এই ত ব্রিজটা পেরলেই টাউনক্লাব। আদেন,' বাহেবাবু বলেন।

'আপনারা যান। আমি একটু জে-এল-আর-ও অফিস ঘুরি আসি। আমার মানষিলা ত সগায় আছে,' পদ্মনাথ বলে।

'আরে আজ বাদ দেন। চলেন, চলেন,' বাহেবাবু বলেন।

'না। এই কাজখান সারি চট করি চলি আসিম,' পদ্মনাথ ঘুরে বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করে। পদ্মনাথের গোটাকয়েক দাঁত না থাকায় সব কথাই খানিকটা তরল হয়ে বেরয়। ছোটখাট মানুষটির মধ্যে একটা ব্যস্ততার ভাব আছে বটে কিন্তু ব্যক্তিত্বে একটা ধীরতা আছে।

পুরনো দোলনা ব্রিজের রাস্তাটা একটু খাড়া। বাহেবাবু সামান্য হাঁফিয়ে পড়েন। শেখরকে বাহেবাবুর সঙ্গে তাল রেখে উঠতে হয়।

শেখর বলে, 'হয়ে গেল দেউনিয়ার কংগ্রেস করা। গোটাকতক লোক খরিয়ে দিয়ে চলে গেল জমি বোমা করতে। এই সব লোকের জন্যেই ত এই দশা।'

'তুমি চেনো একে ?'

'কে ?'

'পদ্মনাথ রায়।'

'সেই সাধু পদ্মনাথ ?

বাহেবাবু হাসেন, 'হ্যাঁ, সাধু পদ্মনাথ। কিন্তু জমিতে হাত দিতে যাও, সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিসকে আইন শিখিয়ে দেবে।'

'এই জোতদার ধরে-ধরে ভোট করে-করেই ত আপনারা সাতষট্টি সালে কাত হয়ে গেলেন। টেরও পান নি—পায়ের তলার মাটি খসে গেছে। আচ্ছা, কংগ্রেস যখন দুভাগ হল, আপনারা এদিকে থাকলেন কেন বলেন ত ?'

'ইন্দিরা গান্ধীর জন্যে। আবার কেন ?'

'আপনারা ইন্দিরা গান্ধীর সাপোর্টার ?'

'নিশ্চয়।'

'আপনারা ত সব পুরনো বাস্তুঘুঘু। আপনারা অতুল্য ঘোষ-প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে গেলেন না কেন ? আপনাদের ত আদি কংগ্রেস।'

'আমি কোনদিকে যাব সেটা ত আমার ব্যাপার শেখর', বাহেবাবু হাঁফানোর

boiRboi.net

জন্যে গতিটা একটু শ্লথ করে বলেন।

'আপনাদের জন্যেই না কংগ্রেসটা ডুববে, আবার ডুববে। লোকে বলে, আগেও সেই বাহেবাবু, সন্তোষ ঘোষ, লালুবাবু। এখনো সেই বাহেবাবু, সন্তোষ ঘোষ, লালুবাবু। তা হলে কংগ্রেসটা আর বদলাল কোথায় ?'

'কেন ? লোকে তোমাদের দেখে না ? তোমরা ত নতুন।'

'গ্রামে ত আপনারা ঘাঁটি আগলে রেখেছেন। এই ত আজ বেতো পায়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাহাদুরে গেছেন, আমাদের কাউকে যেতে দেন নি—পাছে জমিদারি চলে যায়। আপনাদের তাড়াতে না পারলে আর কংগ্রেসের মুক্তি নেই।'

'আমাদের না তাড়িয়ে প্রতুলদের সামলাও। প্রতুলকে ত দেখলাম বাহাদুরে গেছে, মিছিল আনতে। শুনলাম প্রেসিডেন্ট নাকি ওদের পক্ষে গেছেন, তোমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিটি ভেঙে দিয়ে এ্যাডহক করবেন।'

'হলেই হল! আমরা অফিস ছাড়লে ত ?'

'তোমাদের জিলা কমিটি ভেঙে দিলে ?'

'মানব না।'

'বাঃ। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিকে মানবে না ?'

'দাদা, কেউই যা আছে তা হাতছাড়া করতে চায় না। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি যদি দেখেন আমাদের জোর বেশি, তিনি কোন দুঃখে আমাদের শত্রু করতে যাবেন ?'

'প্রতুলরা আজ বড় মিছিল করবে। দেখলাম, মিলন সঙ্ঘের মাঠে তৈরি হচ্ছে।'

'শুধু মিলন সঙ্ঘের মাঠ কেন ? পাণ্ডাপাড়া কালীবাড়ির মাঠ, উত্তরে রায়কত বাড়ির মাঠ। আমিও শুনেছি প্রেসিডেন্ট ওদের দিকে ঝুঁকেছেন একটু। প্রতুলও তা জানে। তাই সারা জেলা থেকে লোক এনে হাজির করছে। কিন্তু ওদের আমরা সার্কিট হাউসের কাছাকাছিও আসতে দেব না।'

'কী করে ?'

'এখন বারটা বাজে। দেড়টার মধ্যে আমাদের সব চলে আসবে। টাউন ক্লাব থেকে দু পা হেঁটে গিয়ে সার্কিট হাউসের রাস্তাটায় বসে থাকব। প্রতুলদের মিছিল গুছিয়ে আনতে-আনতে শেষ বিকেল। তখন ঢুকবে কী করে ?'

'ওরা বাঁধ দিয়ে নেমে যাবে।'

'বাঁধ দিয়ে ত নামতে হবে কোর্টে। সেখানে ত আজ নয় পার্টির আইন

অমান্য, সি-পি-আইয়ের অবস্থান, ওরা ত দেড়টা থেকেই কোর্ট ঘিরে থাকবে।'

'বাঃ। অত বড় মিছিল এনে প্রতুলরা প্রেসিডেন্টের কাছে না গিয়ে ফিরে যাবে? তোমাদের পেছন থেকে এ্যাটাক করবে।'

'পুলিশ তা হতে দেবে না। পুলিশের কাছে রিপোর্ট আছে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে কংগ্রেসের ক্ল্যাশ হবে না কিন্তু প্রতুলদের সঙ্গে আমাদের, মানে, কংগ্রেসের দুই দলের মধ্যে ক্ল্যাশ হবে। তাই পুলিশ ওদের আমাদের দিকে আসতে দেবে না।'

'তোমাকে কে এই খবর দিল?'

'এডিশন্যাল এস-সি।'

'এডিশন্যাল এস-সি ত তিনজন। তোমাকে কে দিল খবরটা?'

'সিনহা।'

'সিনহা তোমাদের দলে। কিন্তু প্রতুলদের দলেও ত কেউ আছে?'

'আছে। ভটচায।'

'তা হলে?'

'সে আজ আলিপুর দুয়ারে।'

'ও। আলিপুর দুয়ারের পুলিশ আজ প্রতুলদের পক্ষে আর এখানকার পুলিশ তোমাদের পক্ষে?'

'তোমাদের-তোমাদের করছেন কেন? আপনিও ত মিছিল এনেছেন? নাকি এখনো কাটার তালে আছেন? আপনারা কাটলে আমরা বাঁচি। আচ্ছা, আপনাদের যদি বলা হয়, দাড়ি রাখতে হবে, চোঙা প্যান্ট পরতে হবে তাহলে কংগ্রেস করা যাবে, তাও আপনারা পরবেন, না?'

বাহেবাবু আঙুল বাড়িয়ে বলেন, 'সে যখন পারার পারব, এখন গিয়ে তোমার মিছিল টাউনক্লাবে ঢোকাও।'

শেখর মিছিলটার মাথার দিকে দৌড়য়। ব্রিজ শেষ হয়ে গেছে—সামনে চারমাথার মোড়। মিছিলটাকে ডাইনে ঘুরিয়ে টাউন ক্লাবে ঢোকাতে হবে।

চ্যারকেটুর গরুটাকে ছুঁয়ে শেখর মিছিলের মুখোমুখি দাঁড়ায়—'এদিকে, এদিকে' বলে বাঁ দিকে হাত দেখায়।

চ্যারকেটুকে ডান দিকে ঘুরতে হয়। পেছনে মিছিল।

boiRboi.net

৮

চারপাশে মিছিলের ভেতর চ্যারকেটু এখন জলপাইগুড়ির কোর্টের সামনে। একপাশে তিস্তার বাঁধ, আর-একদিকে কোর্টের দালান। মাঝখানে সমস্ত রাস্তাটা জুড়ে মিছিল বসে আছে। মিছিলের মাথায়-মাথায় চ্যারকেটু কোর্টে এসে হাজির। কিন্তু চ্যারকেটুকে ত গৌরীহাটে যেতেই হবে। গরুটা বেচতে হবে। চাল কিনতে হবে।

জলপাইগুড়ি কোর্টের পুবে তিস্তার বাঁধ, পশ্চিমে করলার বাঁধ আর দক্ষিণে এই বাঁধ দুটি মিশেছে। এই পুবের রাস্তা জুড়ে কংগ্রেসের একটা মিছিল। পশ্চিমের মাঠটা জুড়ে লালশাদা ঝাণ্ডা—যুক্তফ্রন্টের পার্টিগুলোর মিছিল। লাঙলটা কাঁধে নিয়ে চ্যারকেটু কোর্টের একেবারে দক্ষিণ সীমায়, বাঁধ দুটি মেলার কোণটিতে। মাইকে একটা বক্তৃতা মিছিলটার মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে চ্যারকেটুর দিকে ভেসে আসে। রাস্তার ওপর বসে-থাকা লোকজন মাথা হেলিয়ে মাথার ওপর দিয়ে ভেসে আসা শব্দটা দেখতে চেষ্টা করে। বক্তৃতাটা নিশ্চয়ই দূরে কোথাও, একটু চাপা। এই মিছিল ধরেই যেমন আসে, মনে হয় বক্তৃতাটা এই মিছিলেরই। 'আমরা নির্বাচিত জিলা কমিটি। এই কমিটি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আর মুখ্যমন্ত্রীর সম্মতিতে তৈরি হয়েছে। যারা এই কমিটি মানে না, তারা কংগ্রেসের কেউ নয়, কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

কেউ একজন বলে, 'মনত্ খায় কি, ঘেরাও হবা পারে।'

'কাক ঘেরাও দিবা ধইচছে?'

'এ্যানং বিশাল মিছিল, বুঝা না-যায়।'

'সভাপতি মশাই এসে দেখুন, এই জিলায় কাদের শক্তি বেশি,আমাদের না-কি তথাকথিত বিক্ষুব্ধদের? আমরা জানি না, এই সার্কিট হাউসে সভাপতি আছেন কি না। কেউ-কেউ বলেছেন তাঁকে নাকি তথাকথিত বিক্ষুব্ধরা সরিয়ে নিয়ে গেছে। বা তিনিই নাকি তথাকথিত বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে কোথায় গেছেন আর সেখানেই নাকি অ্যাডহক কমিটি হবে কিনা ঠিক হবে। যদি তিনি

boiRboi.net

ভেতরে থাকেন, তাহলে বেরিয়ে এসে এই মিছিলের সামনে দেখা দিন। যদি তিনি না থাকেন, তাহলে আমরা এখানেই বসে থাকব। কারণ তিনি এখানেই আমাদের দেখা করতে বলেছিলেন।'

'যাক্ ঘেরাও দিসে, উমরায় চলি গেইসে।'

'যাক্ ঘেরাও দিসে উমরায় নাই ত ঘেরাও-ও নাই।'

'আমাদের মিছিল এইখানে আছে ও থাকবে।'

কাঁধে লাঙল, গরুর গলার দড়িটা ধরা, চ্যারকেটু দাঁড়িয়ে মানুষের গিজগিজ মাথাগুলোর ওপর দিয়ে সামনের রাস্তাটা দেখে। এই রাস্তা দিয়ে সে একাই যেতে পারত না, গরু আর লাঙল নিয়ে ত কথাই নাই। 'কিন্তু মোক ত যাবা নাগিবেই।'

চ্যারকেটু কোর্টের পোস্ট-অফিসের পাশ দিয়ে মোক্তার লাইব্রেরি আর বার লাইব্রেরির পাশ দিয়ে বাঁধে উঠতে পারে কি না দেখবার জন্য বাঁয়ে ঘুরে যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মিছিলমিটিঙের জায়গার দিকে যে যায়, তার একমাত্র কারণ চ্যারকেটুর দাঁড়িয়ে থাকবার জায়গা থেকে যুক্তফ্রন্টের মিছিলের জায়গা পর্যন্ত এক-দেড় রশি মত বাঁধানো রাস্তা ফাঁকা ছিল—এটা কোর্টের পেছন দিক। সেখানে গিয়ে দেখে পোস্ট-অফিসের বারান্দা থেকে হুপাকে কোর্টের হাজতের পিছন পর্যন্ত শুধু মানুষের মাথা আর ঝাণ্ডা আর মাইক। পায়ের নখের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলে মনে হয়, হাজতের ঐ দিকের মাঠটাতেও মানুষ আর ঝাণ্ডা। এই গাদাগাদি মানুষের মাঝখানে কাল রঙের গাড়ি একটা, পুলিশের। সেই গাড়ির সামনে, পুলিশ। পোস্ট-অফিসের সামনে ভিড়ের পেছনটা একটু পাতলা। নিজে আগে-আগে, পেছনে গরুটাকে নিয়ে চ্যারকেটু ফাঁকে-ফাঁকে ঢুকে গেছে। বাঁ হাত দিয়ে কাঁধের লাঙলটাকে সামলায়, ডান হাত দিয়ে গরুর গলার দড়িটা ধরা। বাকি দড়ি হাতে পেঁচানো। কিছুটা গিয়ে এগবার আর পথ পায় না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে সে কোনদিক দিয়ে যেতে পারবে দেখতে চেষ্টা করে। পোস্ট-অফিসের বারান্দায় লাইন দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে, রেলিঙের ওপর পা ঝুলিয়ে, রেলিঙের নীচে ছানচা তলায় দাঁড়িয়ে। গরুটা লেজের বাড়ি মারে পিঠে। কয়েকজন লোক একসঙ্গে চ্যারকেটুর দিকে ফেরে।

'আরে, গরু লাঙল নিয়ে এখানে ঢুকে কী করছ, এখানে কি জমি চাষ করবে? বেরোও, বেরোও।'

লোকগুলো চ্যারকেটুর দিকে ফেরায়, ডানদিকে একটু ফাঁক-মত হয়,

boiRboi.net

চ্যারকেটু সেই ফাঁকে ঢুকে যায়। চ্যারকেটু ঢুকে যায়, কিন্তু গরুটা আটকে যায়। 'আরে আরে', বলতে-বলতে লোকজন সরে যেতেই গরুটা সেঁধিয়ে যায়।

'আরে এ শুরু করেছে কী?' বলে একজন ধমকে ওঠে। চ্যারকেটু পাকা জায়গাটা ছেড়ে ততক্ষণে মাঠটাতে পড়ে। মাঠের ভেতরে সব লোক বসে, জায়গায়-জায়গায় ঝাণ্ডা পোঁতা, চ্যারকেটু কোর্টের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়, গরুটাকে টেনে সামনে নিয়ে আসে, নিজের গায়ের সঙ্গে লাগিয়ে গরুটাকে দাঁড় করায়। বন্যার সময় মানুষ যেমন কোনোরকমে একটু ডাঙা জায়গায়, গরু নিয়ে চ্যারকেটু তেমনি, দেয়ালে পিঠ দিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকে। তার সামনে মাঠ জুড়ে লোক, ঝাণ্ডা, কাপড়ে আর ধারার গায়ে কাগজে কী-সব লেখা, মাটিতে পোঁতা।

সামনে একটা রিকসায় মাইক বাঁধা। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না ভেতরে এ-রকম তোড়জোড়। রিক্সার ওপর একজন উঠে দাঁড়ায়, চ্যারকেটু চিনতে পারে, নরেন দাস, কলেজের মাস্টার, বনিজের হাটে-জহুরির হাটে প্রত্যেক ভোটে বক্তৃতা করতে যায়। মাইকটা হাতে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে, 'কী ভাবে আন্দোলন করব, তার চাইতে বড় কথা, কেন আন্দোলন। বাঙলা বন্ধ হবে কি হবে না সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা···'

পুলিশের গাড়ির কাছ থেকে হঠাৎ খুব জোরে শ্লোগান ওঠে, 'ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক,' নরেন দাস একটু থতমত খেয়ে যায়, একটু চুপ করে যায়, তারপরই দম নিয়ে ডান হাতটা আরো জোরে-জোরে নাচিয়ে-নাচিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'এই আন্দোলনে সরকারের দলের লোকদেরও আনতে হবে।'

ওদিক থেকে হাততালি নরেন দাসের কথা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু নরেন তার বক্তৃতা থামায় না, কিছুই শোনা যায় না, শুধু ঠোঁট নাড়ানো, হাত পাকানো মুখের হাঁ দেখা যায়। দূরে, পুলিশের গাড়ির পেছনের সিঁড়িতে প্রবোধ সেন, যুক্তফ্রন্টের পয়লা ভোটে দাঁড়িয়েছিল। 'ধ্বংস হোক', 'জিন্দাবাদ' শ্লোগানের সঙ্গে-সঙ্গে একটা মাইক প্রবোধ সেনের সামনে ধরা হয়। 'এই সরকারের পতন ঘটাতে চাই।' সঙ্গে-সঙ্গে চ্যারকেটুর সামনে নরেন দাসের দল থেকে হাততালি পড়ে, হাততালি চলতে থাকে, শ্লোগান ওঠে 'চলছে চলবে', প্রবোধ সেনের বক্তৃতা চাকা পড়ে যায়।

নরেন দাস যেন দম নেয়ার জন্য একটু থেমে, হাসি-হাসি মুখে হাততালি আর শ্লোগান দেখে, সেই হাততালি আর শ্লোগানে ঢাকা পড়ে যাওয়া প্রবোধ সেনের বক্তৃতা দেখে। তারপর হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করে নিজে আবার বক্তৃতা

শুরু করে। এরপর কোনোদিক থেকেই হাততালি বা শ্লোগান নেই। বসা আর দাঁড়ানো চুপচাপ লোকগুলোর ওপর প্রবোধ সেন আর নরেন দাসের বক্তৃতা চলতে থাকে। দুই মাইকের চোঙ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এসে মাঠটার ভেতর মানুষের মাথার ওপর পরস্পর ধাক্কা খায়। একদিকে কোর্টের দেওয়াল, আর-একদিকে বার ল'ইব্রেরির দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আওয়াজগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে, বসা আর দাঁড়ানো মানুষজনের মাথার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চ্যারকেটু একবার ডাইনে প্রবোধ সেনের দিকে, আর-একবার বাঁয়ে নরেন দাসের দিকে তাকায় আর পিঠটা দেয়ালে শক্ত করে ঠেকায় আর গরুটাকে আঁকড়ে ধরে। 'আইন অমান্য', 'অবস্থান', 'আইন অমান্য', 'অবস্থান', 'সরকারি নীতি নিয়ে সরকারের নিজের ভেতরই বিরোধ,' 'সরকারী নীতি নিয়ে সরকারের ভেতরই প্রতিবাদ', 'যারাই এই সরকারের বিরোধী তাদেরই আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে,' 'যারা আন্দোলন করতে চান তাদের নিয়েই আন্দোলনের ধরন স্থির হবে,' 'তাই আইন অমান্য,' 'তাই গণ-অবস্থান,' 'বাঙলা বন্ধ্', 'বাঙলা বন্ধ নয়।' দুজন প্রায় একই সঙ্গে সিদ্ধান্তে আসে। কার বক্তৃতা আগে থামে বোঝা যায় না। 'জিন্দাবাদ', 'জিন্দাবাদ'।

কমবয়েসি এক বাবু একটা কাগজ আর কলম নিয়ে চ্যারকেটুর সামনে বসে-থাকা ভিড়টার ভেতর দিয়ে-দিয়ে উবু হয়ে আসছিল আর যারা বসেছিল তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে-করে কিছু লিখছিল। বক্তৃতা চলার সময়টা জুড়ে সে পায়ে-পায়ে চ্যারকেটুর কাছ পর্যন্ত এসে গেছে, এখন, চ্যারকেটুর সামনে এসে গরুটার পাশে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, তারপর চ্যারকেটুর দিকে তাকায়। চ্যারকেটুও তাকিয়ে থাকে। বাবু বোঝে, চ্যারকেটু বোঝে নি।

'নাম?' 'চ্যারকেটু রায় বর্মন।'

লিখে, জিজ্ঞাসা করে, 'কোথা থেকে এসেছেন'?

'না, মুই আসো নাই, মুই যাছ।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'গৌরীহাটত।'

'গৌরীহাট? ত এখানে কী?'

'হামাক নিয়া আসিছে ত।'

'কে নিয়ে এসেছেন?'

'নেংগু খুড়া, ছোট খুড়া।'

'কে নেংগু খুড়া?'

boiRboi.net

লোকটি একটু জোরেই বলে, তখন বক্তৃতাও চলছে না, ফলে দু-চারজন তাকায়। আরো দু-চারজন এগিয়ে আসে। নতুন করে বক্তৃতা শুরু না-হওয়ার খানিকটা সময়ও হাতে পাওয়া যায়। একজন নরম গলায় সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি কোনো দলের সঙ্গে এসেছ? আর-কেউ কি তোমার সঙ্গে এসেছে?'

'না বাবু, মুই আসিছু আর মোর এই গরুটা আসিছে আর কায়ও, আসে নাই।'

'তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

চ্যারকেটু ভয় পায় যে আবার তাকে এরা এখান থেকে পুরনো জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। যেটুকু এগিয়েছে, সেটুকুও হারাবে। 'এই শুনিছু বাবু, বক্তৃতা শুনিছু।'

'বক্তৃতা শুনছ?' লোকটি এমনভাবে প্রশ্ন করে যেন বক্তৃতা কেউ কখনো শোনে না।

'হ্যাঁ। শুনেছু। ভালো লাগাছে।'

'তুমি কি অবস্থান করছ?'

'না বাবু, করো না।'

'আরে বাবা, জিজ্ঞাসা করো না কোন পার্টি করে, আইন অমান্য করেছ কি না। নাহলে ওদের দিকে পাঠিয়ে দাও। নইলে এই নিয়ে একটা গোলমাল বাধবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গরু আছে, লাঙল আছে, ঐ নিয়ে পুলিশের গাড়িতে উঠে আইন অমান্য করুক।'

'তুমি কি আইন অমান্য করছ?'

'না বাবু, করো না।'

'তুমি কোন পার্টি কর?'

'না বাবু, করো না।'

'তুমি কি ওদিকে যাবে?'

'যাম বাবু।'

দু-একজন সরে যায়, ফলে আবার বাঁ কাঁধে লাঙল সামলে, ডান হাত দিয়ে গরুটাকে গলার কাছের দড়ি ধরে টানতে-টানতে চ্যারকেটু খানিকটা এগিয়ে যেতে পারে। দেয়াল ঘেঁষে-ঘেঁষেই চ্যারকেটু এগয়। যতই মাথা নিচু করে, কোমর বেঁকিয়ে, নিজেকে লুকিয়ে, চ্যারকেটু এগবার চেষ্টা করুক, তার

boiRboi.net

কাঁধের লাঙলের ফলা আর গরুটা ত আর লুকনো যায় না।

সেই পুলিশের গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে যায়। গাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখে চ্যারকেটুর মনে হয়, যেন ওদিকে একটা বেরবার জায়গা পাওয়া যেতে পারে। আর লাঙলের ফলা আর গরু নিয়ে চ্যারকেটুকে বসতে বা দাঁড়াতে দেয়ার বদলে এগিয়ে যেতে দেয়াটাই নিরাপদ বিবেচনা করে সবাই চ্যারকেটুকে এগিয়েই দেয়। মাইকে একটা গান শুরু হয়। পুলিশের আর-একটা গাড়ি পিছু হঠে এসে আগের গাড়িটার জায়গায় দাঁড়ায়।

চ্যারকেটু দেখে বাঁধের পাশের বটগাছের ছায়াটা তার তলার মিষ্টির দোকান-টার চাল ছাড়িয়ে এদিকে আসছে। সর্বনাশ। এখনো যদি রওনা দেয়, তাহলে গৌরীহাটে সময়মত পৌছতে পারে। কিন্তু চ্যারকেটু বেরয় কী করে। এই ত সামনে বাঁধ দেখা যাচ্ছে। এই মানুষজনের ভেতর দিয়ে একটা ফাঁক পেলে চ্যারকেটু মুহূর্তের ভেতর বাঁধে গিয়ে উঠতে পারে। আর, তারপর গৌরীহাট। সামান্য এইটুকু জায়গা মিছিলের মানুষে এত ঠাসা যে চ্যারকেটু পা-পা এগবার পথটাও পায় না।

কোর্টের বাড়িটার দেওয়াল লাল, ইটগুলো বাইরে থেকে দেখা যায়, ছাতে আবার গোল-গোল ঘটের মত রেলিঙ দেয়া, দুই কোনায় আর মাঝখানে দুটো করে থাম ছাতের মাথা ছাড়িয়ে অনেকখানি আকাশে উঠেছে, চারকোনা থামগুলোর মাথাটা কোণ হয়ে উঠে গেছে। এইগুলো গেট, কোর্টের বারান্দায় ঢোকার গেট। দক্ষিণ দিকের পশ্চিমের গেটটা থেকে এতক্ষণে চ্যারকেটু মাঝখানের গেট পর্যন্ত এসেছে। সামনে এক পুলিশ লাঠি হাতে গেটের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। ঠিক তার পেছনেই চ্যারকেটু দেয়ালে পিঠ দিয়ে, দাঁড়িয়ে। পুলিশটা কি আসলে গেটটা পাহারা দিচ্ছে? কারণ চ্যারকেটু দেখে সেই মাঝখানের গেট থেকে শান-বাঁধানো রাস্তা ফাঁকা, সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, তার ওপারে আবার লোক, এই রাস্তাটি দিয়ে দু-একজন লোক যাচ্ছে, রাস্তাটার দুপাশে লাঠি হাতে পুলিশ। তাহলে, 'এইঠে বাহির হবার আস্তা (রাস্তা) একখান আছে, এ্যানং পুলিশের পাহারা দেয়া পাকা আস্তা। না-হয় ত পুলিশের গাড়িটা কেনং করি গেইল।' কিন্তু সে-রাস্তা যদি পুলিশের পাহারায়, তাহলে চ্যারকেটু কী করে পাবে।

চ্যারকেটু পুলিশটার পাশ দিয়ে দেয়াল ঘেঁসে ঐ রাস্তাটার ভেতর যেতে গেলে, পুলিশটা না-তাকিয়ে বলে ওঠে, 'পরে, পরে, আস্তে, আস্তে।' তারপরই সরে গিয়ে হাঁক দেয়, 'যান।' চ্যারকেটুর বাঁ কাঁধে লাঙল থাকায় পুলিশটাকে

একটু বেশি সরতে হয়, 'আরে, এটা কী,' কিন্তু তারপরই গরুটার গায়ের ধাক্কায় প্রায় পড়ে যেতে-যেতে পুলিশটা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আরে গরু নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ? এই ?' ততক্ষণে চ্যারকেটু ও তার গরু মাঝখানের সেই শানবাঁধানো ফাঁকা রাস্তাটায়। চ্যারকেটু সামনের দিকে মুখ রেখে ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলে 'অত্তি।'

এতে পুলিশটা নিশ্চয়ই কোনো মানে বোঝে। সে আবার দেয়ালে হেলান দিয়ে পেছনের লোকদের বলতে শুরু করে 'আস্তে', 'আস্তে।'

রাস্তাটা একটু দূরেই পুলিসের গাড়িটার পেছনে গিয়ে শেষ হয়েছে, খুব বেশি হলে বিশ-পঁচিশ হাত হবে। কিন্তু পুলিশের গাড়ির পেছনে আর পাশে খুব চাপা ভিড়। এক-একটা জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কেউ কিছু করছে। হাটের মাজন-মলম বিক্রির জায়গার মত, সবারই পেছনটা দেখা যাচ্ছে। চ্যারকেটু সেখানে গিয়ে ঠেকে পড়ে।

আসলে এখানকার গোলভিড়টা এত জমাট আর সবারই পেছন চ্যারকেটুর দিকে ঘোরানো, চ্যারকেটু কোনো ফাঁকই পায় না। চ্যরকেটু একটু এদিক-ওদিক তাকায়, গরুটা তার পাশে চলে আসে। চ্যারকেটু সামনে দু-চার পা এগয়। তখন চ্যারকেটু বোঝে, সে আসলে একটা লাইনে দাঁড়িয়ে, লাইনটা একটু-একটু এগচ্ছে, সুতরাং সে-ও এগবে। চ্যারকেটু খুশি হয়, কিন্তক লাইনটা একটু-একটু করি আগাইয়া ঐ পুলিশের গাড়ির ভিতর সিন্ধাছে (ঢুকছে)? তাহলে চ্যারকেটু কী করবে। পুলিশের গাড়িতে গরু আর তাকে ভরবে কী করে। 'তয় কি হামাক ছাড়ি দিবে ? তয়, বাহির হম কেনং করি ? যদি হামাক আবার পুরানা জায়গাত্ ফিরি যাবার কহে ? জেলখানাত্ কি হামাক আর গরুটাকে খোয়া দিবে ?'

'নাম ?'

চ্যারকেটু দেখে এখন সে-ই সামনে। তার সামনে একটা চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কাগজে মাথা নিচু দারোগাবাবু লিখছেন।

'নাম ?'

'চ্যারকেটু রায় বর্মন।'

'পিতার নাম ?'

'হে, ই, ধরো কেনে, ধ্যারকেটু রায় বর্মন।'

'বাপের নাম আবার ধরাধরির কী আছে ?' লিখতে-লিখতে দারোগাবাবু বলেন।

'না হয় ত খেতখেতু রায় বর্মনও লিখিবার পারেন, খুড়া হয়।'

BanglaBook.net

'আচ্ছা, আচ্ছা। বয়স ?'

'হে-ই হবা পারে এক কুড়ি পাঁচ দশ, যেইলা পকিস্তান হয় সেইলা।'

'ঠিকানা, সাকিন ?'

'গ্রামসভা দ্বারিকামারি, অঞ্চল বাহাদুর।'

'কোন পার্টি।'

'কুনো পার্টি না হয় বাবু।'

'আরে, ঝাণ্ডা কার ?'

'কারো ঝাণ্ডা না হয় বাবু।'

'আরে তোমার লিডারটা কে ?'

'কায়ও না বাবু।'

দারোগাবাবু এতক্ষনে চোখ তোলেন। দেখেন লাঙল কাঁধে, পেছনে গরু, চ্যারকেটু টেবিলের সামনে। 'আরে এ-আবার কী শুরু হল, তুমি কি তোমার গরু নিয়ে জেলে যাবে নাকি ?'

'গরুটা নিয়া যাবার দিলে মুই জেলত্ যাম বাবু।'

'তুমি কি গরু নিয়ে আইন অমান্য করছ নাকি ?'

'আইন গরু নিয়া ভাঙা যায় বাবু ? তয় ভাঙিয়।'

'এখন আর কী ভাঙবে, তুমি এখানে এসেছ কেন, এই দেখো, পরেশবাবুকে ডাকো, দেখে দিন কোন পার্টির লোক !'

'পরেশবাবু,' 'পরেশবাবু,' শুনে একজন এগিয়ে আসেন।

'কী ব্যাপার ?'

দারোগা হেসে বলেন, 'এবার কি হালবলদ সব সহ জেলে আনছেন নাকি, দেখেন এ কোন পার্টির ?'

পরেশবাবু তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কার সঙ্গে এসেছ ?'

'কায়ও না বাবু, মুই আসিছু আর মোর এই গরুটা আসিছে বাবু।'

'তুমি এলে কোথা থেকে ?'

'ঐঠে বাবু', চ্যারকেটু আঙুল তুলে নরেন দাসদের জায়গা দেখিয়ে দেয়, 'বাবুরা কহিল ঐঠে যাও।'

পরেশবাবুর চোখমুখ গম্ভীর হয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করেন, 'যাবেন কোথায় ? আইন অমান্য করবেন ? জেলে যাবেন ?'

'কুন্ আইন ভাঙিম বাবু ? গরু নিয়া জেলে যাওয়ার কুনো আইন নাই ?'

'না, সে ত হয় না।'

boiRboi.net

'ত সেই আইনটাই ভাঙি বাবু।'

একটু চুপ করে থেকে পরেশ বাবু বলে, 'না, আমাদের কোনো পার্টির না। মনে হয়, ওদিক থেকে গোলমাল করার জন্য পাঠিয়েছে। আপনারা মাঝখানটা কর্ডন করেন নি কেন ভাল করে?'

পরেশবাবু সরে যান। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করেন, 'তা একে নিয়ে করব কী, এ ত নাম লিখিয়েছে।'

'সে আপনার যা ইচ্ছা করুন, আমাদের কোনো পার্টির কেউ না।'

'আপনাদের কেউ না ত?'

'না, আমাদের কেউ না।'

'তাহলে ছেড়ে দেব?'

'সে আপনার যা ইচ্ছে, করুন।'

দারোগা চ্যারকেটুর নামটার দিকে একটু তাকিয়ে থাকেন।

'বাবু', চ্যারকেটু ডাকে, 'দারোগাবাবু।'

'উঁ?'

'নামটা কি লিখা হয়া গেইল?'

'হুঁ।'

'ত লিখিছেন যখন, তখন থাকুক।'

'থাকুক মানে, তুমি কি জেলে যাবে নাকি?'

'ত লিখিছেন যখন, আপনি হাকিম, তখন যাই না কেনে।'

'তা হবে কী করে, তুমি ত কোনো দলের সঙ্গে আসো নি?'

'অয়, অয়, দলের সঙ্গে না-আসিলে আইনটা ভাঙা যাবে না বাবু?'

'ত এই গরু নিয়ে তুমি কোথায় যাবে?'

'জেলে না নিবেন ত গৌরীহাটত যাম।'

খুব আস্তে-আস্তে চ্যারকেটুর নামটার ওপর দিয়ে দারোগাবাবু একটা লাইন টেনে দেন।

'যাও, চলে যাও, এ-রকম করে ঢুকবে না।'

'সিধা চলি যাম বাবু?'

'হ্যাঁ, সিধা।'

'বাহিরত?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। নেকস্ট।'

'বাবু, কেনং করি যাম?'

BoiRboi.net

'এই কে আছ ? একে বাইরে যাবার পথ করে দাও। নেকসট।'

দারোগাবাবুর পেছন থেকে এক পুলিশ ডাকে, 'এসো।'

ভিড় ঠেলে বাইরে বেরতে-বেরতে চ্যারকেটু দেখে, পরেশবাবু। তার একেবারে কাছে গিয়ে খুব গোপনে বলে, 'মোর কুনো ভাঙার আইন নাই বাবু।' পুলিশটা ডাকে, 'এই এদিকে।'

সেই দোকানটার সামনে পৌছে চ্যারকেটু আগে আকাশে তাকায়। যে-আকাশটা ভেতরে ঐ গিজগিজ লোকজনের মাথার ওপর নিশ্চয় ছিল, সেই আকাশটার দিকে তাকিয়ে চ্যারকেটুকে বুঝে নিতে হয় শেষ পর্যন্ত সে বাইরে আসতে পেরেছে। গরুটাকে ঠেলে বাঁধের ওপর তুলে চ্যারকেটু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটে। এখনো দৌড়তে-দৌড়তে গেলে হাটটা ধরতে পারে। গরুহাটিটা সন্ধ্যার পরও থাকে। নদীর দিকে গলা বাড়িয়ে গন্ধটা খুব চাপা স্বরে 'হাম্বা' ডাকলে, চ্যারকেটু গরুর গলার দড়িটা ছেড়ে দেয়, পেঁচানো দড়িটা খুলে হাতে নেয়, মাঝেমাঝে গরুটার পেছনে ধাক্কা দেয়, সামনে-পেছনে মাথাটা নাড়িয়ে গরুটা দুলে-দুলে চলে। বাঁধটা ফাঁকা বলে ওর শিংদুটো খুব লম্বা দেখায়। চ্যারকেটু ডানদিকে তাকায়, জামবাগানের মাঠ পেরিয়ে ওপারে, নেংগু খুড়াদের মিছিল রাস্তার ওপর বসে, সার্কিট হাউসের সামনের পুরো রাস্তাটা ভর্তি করে মিছিলটার লেজ গিয়ে শেষ হয়েছে, সেই তেমাথার মোড়ে। লাঙল কাঁধে চ্যারকেটুর আর শিং-উঁচানো গরুর ছায়াটা বাঁধের ওপর থেকে জামবাগানের সমস্ত মাঠটা পেরিয়ে ওপারের মিছিলটা টপকে গেছে। সামনেই বাঁধ শেষ, কাছারির ব্রিজ। গরুটার পেছনে ঠেলা দিয়ে চ্যারকেটু ছোট-ছোট পায়ে দৌড়তে শুরু করে।

খুব জোরে আকাশ ভরা শ্লোগান শুনেও চ্যারকেটু দাঁড়ায় না। শ্লোগান ক্রমেই জোরে হওয়ায় সে একবার জামবাগানের ঐ পাড়ের মিছিলটার দিকে তাকায়। সেই মিছিলের ঘাড়ও যেন এদিকে ঘোরানো। গরুটার পাশে-পাশে ছোট-ছোট পায়ে ছুটতে-ছুটতে চ্যারকেটু বাঁ দিকে করলার অপর পারে তাকায়। আর বহু ঝাণ্ডার মাথায় তার চোখ আটকে যায়। কাছারির ব্রিজের ঢালু বেয়ে একটা মিছিল উঠে আসছে। গরুটার পেছনে আর-একটা ধাক্কা দিতেই গরুটাও দুলে-দুলে ছোটে, চ্যারকেটু পাশে-পাশে ছোটে, এখনো কাছাকাছির ব্রিজটা ফাঁকা, কোনোরকমে যদি ছুটে ব্রিজের ভেতর ঢুকে পড়া যায়! চ্যারকেটু ছুটতে-ছুটতে দড়িটা পেঁচিয়ে ছোট করে আনে, তারপর গরুর গলার দড়িটা শুধু ধরে থাকে। আর গরুটার গায়ে গা-লাগিয়ে ছুটতে-ছুটতে চ্যারকেটু দেখে তার

চোখের সামনে নদীর ওপার থেকে মিছিলটা কাছারির ব্রিজের ওপর উঠে পড়ল। তবু চ্যারকেটু থামে না, ব্রিজের ভেতর একবার ঢুকে পড়তে পারলেই হয়। ব্রিজের এই মাথাটা নিয়ে ঐ অত বড় 'সাঁটিয়াল' মিছিলের সঙ্গে চ্যারকেটুর যুদ্ধ হচ্ছে যেন, কে আগে দখল নিতে পারে। চ্যারকেটু তাকিয়ে দেখে মিছিলটা ব্রিজের অর্ধেকও পার হয়ে এসেছে। 'জিন্দাবাদ', 'জিন্দাবাদ' 'জিও জিও', 'করতে হবে করতে হবে।' চ্যারকেটু দাঁড়িয়ে পড়ে, গলায় টান পেয়ে গরুটা গলা ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এখন গরুটার গলা করলা নদীর দিকে, অস্ত আকাশে তাকিয়ে গরুটা একটা চাপা দীর্ঘ ক্রমবিলীয়মান ডাক দেয়, একটিই মাত্র ডাক, 'হা-আ-আ-ম্-বা-বা আ।' ডাকটা শুনে মনে হয়, বাতাসটা বাইরে ছাড়বে না, ভেতরে টানছে। চ্যারকেটুর চোখের সামনে নতুন মিছিলটা ব্রিজের ওপর ফুলে-ফুলে ওঠে, শেষ নেই, ফুলে-ফুলে ওঠে, ব্রিজটা ভরে গড়িয়ে-গড়িয়ে আসে। অগ্রসরমাণ মিছিলটার ঝাণ্ডার, বাঁশের, ফেস্টুনের অন্তসূর্যে লম্বিত ছায়াগুলি ছুটো মিছিলের মাঝখানের রাস্তাটুকু দীর্ঘতর ভরিয়ে রাস্তায় বসা পুরনো মিছিলটার লেজ ছোঁয়া। 'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিও জিও,' মিছিলটা ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তায় নামে। ফাঁদে আটকা-পড়া জন্তুর দ্রুততায় চ্যারকেটু দেখে, এগনো মিছিল আর বসা পুরনো মিছিলের মাঝখানে রাস্তাটার অনেকটা এখনো ফাঁকা, যেটা ভরে নতুন মিছিলটা এগচ্ছে। মুহূর্ত দেরি না-করে চ্যারকেটু গরুটাকে ছুই ঠেলায় জামবাগানের দিকে বাঁধের ঢাল বেয়ে, গড়িয়েই দেয় প্রায়, বাঁ হতে লাঙলটা সামলে, ডানহাতে দড়ি ধরে নিজে ছুটে নামে। পেছনে ঝোলানো লাঙলটা বাঁধের ঢালুতে লেগে যায় বলে, বাঁ হাত দিয়ে সেটাকে পেছনে উঁচু করে ঠেলে রাখতে হয়।

জামবাগানের মাঠটা দিয়ে কোনাকুনি ছুটে ঐ ফাঁকা রাস্তাটুকু গলে ওদিকে চলে যেতে হবে। ফাঁকাটুকু ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। জামবাগানের মাঠে নেমেই 'হা-আ-আ-ম্বা' রব তুলে গরুটা ছুটতে শুরু করে—এবার 'হাম্বা' ডাকে বাতাসটা সম্পূর্ণ বাইরে ছেড়েই। গলার দড়িটা ধরে চ্যারকেটু কোনাকুনি গরুটাকে চালায়, সেই ফাঁকটার দিকে। কিন্তু নিজের হাতের টানে টের পায় গরুটা তার নিজস্ব গতিতে এখন ছুটছে। গরুটার যেন খেয়ালই নেই তার গলার দড়ি চ্যারকেটুর হাতে ধরা, এমনি তার গলা তুলে, বুক চিতিয়ে, শিঙ তুলে লাফিয়ে ছোটা।

বছরের ছ-মাসই জলজমা জামবাগানের থানাখন্দেভরা মাঠে চ্যারকেটু এক হাতে লাঙল আরেক হাতে গরুর টাল যেন সামলাতে পারে না। কিন্তু এত

boiRboi.net

কিছু সত্ত্বেও দুই মিছিলের মাঝখানের, এখন খুবই ছোট, ফাঁকা জায়গাটায় প্রায় পৌঁছেই যায়। রাস্তার ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে পারলেই নতুন মিছিলটা পৌঁছুবার আগেই চ্যারকেটু বেরিয়ে যেতে পারবে। চ্যারকেটু আর তার গরু একই সঙ্গে রাস্তার ঢালটায় পা দেয়, গরুটা দু-পা এগিয়ে উঠে যায় আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাইরেনের হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে থমকে দাঁড়িয়ে গলাটা লম্বা করে দিয়েই, গুটিয়ে, মুহূর্তে সমস্ত শরীরটা উল্টো দিকে ঘোরায়।

দুই মিছিলের সামান্য ফাঁক ভরে দাঁড়ায় দুটো গাড়ি, গাড়ি থেকে অস্ত্র হাতে মুহূর্তে লাফিয়ে-পড়া পুলিশরা দুটো মিছিলকে আলাদা করে রাখে।

গরু আর চ্যারকেটু একেবারে ঘুরে মাঠের ভেতর নেমে যায়। 'আঁ আঁ আঁ' শব্দ তুলে গরুটা বিপরীত দিকে পুরনো মিছিলটার দিকে ছোটে। চ্যারকেটুর বাঁ হাতে গরুর গলার দড়িটা ধরা ছিল, গরু ঘুরে যাওয়ায় তার হাতটা মুচড়ে যায়, সে লাফিয়ে উঠে ডান হাত দিয়ে গরুটার গলা জড়িয়ে ধরে। লাঙলটা আর চ্যারকেটুর পা মাটিতে ছেঁচড়ে যায়। চ্যারকেটু তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের গলাটা গরুটার ঘাড়ের ওপর ফেলে, তারপর ডান পা-টা গরুর পিঠের ওপর চড়িয়ে দেয়। পেটে কাঁচিদাওয়ের খোঁচা লাগে। লাঙলটা পড়ে যাচ্ছিল। চ্যারকেটু গরুটার পিঠের ওপর উঠে বসে ডান হাতে লাঙলটা ধরে ফেলে, তারপর লাঙলটা মাথার ওপর তুলে ধরে।

খালি গা, হাতে লাঙল চ্যারকেটুকে নিয়ে শিং উঁচিয়ে, গলা বাড়িয়ে, জোড়া পায়ে ছুটতে-ছুটতে, আঁ আঁ আঁ আওয়াজে চারদিকে ঘেরা সমস্ত মিছিলের আওয়াজ ছাপিয়ে, গরুটা লাফিয়ে স কিট হাউসের সামনে বসে-থাকা মিছিলটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ট্রাক্টরের মত বেগে সমস্ত মিছিলটা চষতে-চষতে তারা আরো সব মিছিলের দিকে ছুটে যায়।

রাতে, আটত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক মিছিলশূন্য জ্যোৎস্নাময় পেরিয়ে চ্যারকেটু জ্যোৎস্নাময় পাকা ধানখেতে ঢুকে পড়ে—কাঁধে হাল, পাশে গরু, কোমরে কাঁচিদাও।

কার্তিকের কুয়াশাঢাকা ধানি জ্যোৎস্নায় মায়া হয়—ধানের দুধ শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে, কোমর থেকে খুলে ধানের গোছায় কাঁচিদাওটা লাগালেই খিদে মিটতে পারে—চ্যারকেটুর তিনদিনের বাসি খিদে। কিন্তু চ্যারকেটু নিজের হাতে ধানের রোয়া গেড়েছে। তাই, কার্তিকের জ্যোৎস্না আর কুয়াশাতে সে

BanglaBook.net

দিনের আলোর মত স্পষ্ট দেখে -- ধানের ভেতর দুধ এখন জমাট হচ্ছে, এখন, কার্তিকের এই হিমে, কুয়াশায়, বাতাসে।

ধান কাটতে এখনো দেরি আছে। এ-আল ও-আল ধরে-ধরে পাকা ধান-খেতের পাকে-পাকে নিজেকে পেঁচাতে-পেঁচাতে ক্লান্ত, নিশ্চিত পায়ে, চ্যারকেটু এখনো দীর্ঘতর ক্ষুধার দিকে চলে যেতে থাকে।

———